# নীল রক্ত নীল বিষ

# নীল রক্ত নীল বিষ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৫
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সাবকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীপঙ্কজকুমার দোলুই
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩।

নাচের ভঙ্গিতে ছিল রাই। কিন্তু তার হাতের মুদ্রা কিছুতেই ঠিকঠাক হচ্ছিল না বলে নিবেদিতা বারবার দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে ভাঁজ করতে হবে তার তর্জনী, মধ্যমা কিংবা অনামিকা। শরীরের বিভঙ্গই বা কীভাবে হবে। রাই হাসছে অপ্রস্তুত ভাবে, নাচের ভঙ্গিমাটি ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে বেশ অপ্রতিভ লাগছে তার মুখাবয়ব। ভারী মিষ্টি মেয়ে রাই, সামান্য শ্যামলা রং, কিন্তু চোখ-নাক-মুখ এতই সুন্দর যেন কুমোরটুলির পালবাবুদের ছাঁচে তুলে আঁকা। বয়স ষোল-সতেরোর মতো, তবু পিঠ ছাপিয়ে ঝোপা চুল। এহেন কিশোরীকে বকতেও কষ্ট হয়। তবু নিবেদিতা তাকে বেশ কড়া ধমক লাগাল, এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। সব সময়ে তোরা হেসে হালকা করে দিস। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই স্টেজে নামতে হবে তা খেয়াল আছে?

বাই গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পাতলা ঠোঁটের দু কোণ দিয়ে হাসির একটা ছটা ছড়িয়ে পড়ছে মুখময়, নিবেদিতাদি তাকে ঠিক যেমনটি করতে বলছে, তেমনই চেষ্টা করছে প্রাণপণে। প্রথমবার মুদ্রা ঠিক হল তো শরীরের বিভঙ্গ ঠিক হল না। বিভঙ্গ ঠিক হয় তো খামতি রয়ে যায় মুদ্রায়। কিংবা তাল কেটে যায় পায়ে। নিবেদিতাও সঠিক ভঙ্গিটি না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। গত একমাস ধরেই সে ভীষণ টেনসনে আছে। এর আগেও সে এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে বেশ কয়েকবার নির্দেশনা দিয়েছে 'চণ্ডালিকা'র। সেখানকার মেয়েদের অবশ্য নাচের তালিম দেওয়া ছিল বলে দু-একবার দেখিয়ে দিলেই তারা উতরে দিত অনুষ্ঠানটি। কিন্তু এখানকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই তো নতুন। নাচের ন-ও জানে না। জানার কথাও নয়। তাই প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা রিহার্স্যাল দিয়েও এখনও মনে হচ্ছে সময় কালে কেউ না কেউ গুলিয়ে ফেলবে তার অংশের নাচটা। বিশেষ করে রাই নেমেছে প্রকৃতির ভূমিকায়। সবচেয়ে কঠিন ভূমিকাটা তাকেই দেওয়া হয়েছে, কারণ সে-ই এই প্রতিষ্ঠানের সবচেযে সুন্দরী মেয়ে। প্রকৃতির ভূমিকায় তাকে মানাবেও ভাল। তা ছাড়া তার মুখের অভিব্যক্তিও ভারী সুন্দর। হাসলে তাকে যেমন মিষ্টি লাগে, গম্ভীর হলেও চমৎকার। এমনকী অভিমান করলেও কী যে সুন্দরী দেখায় তাকে! কিন্তু এখন যে নিবেদিতার ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে নাচের ভঙ্গিমা শেখাতে।

প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় যাকে রেখেছে সেই রিয়াকে নিয়ে অবশ্য তেমন অসুবিধে নেই। রিয়াও প্রায় রাইয়ের সমবয়সী, কিন্তু তার চেহারাটা একটু ভারী, সামান্য লম্বাও রাইয়ের চেয়ে। মুখটাও অপেক্ষাকৃত পাকা পাকা বলে মায়ের ভূমিকায় বেশ মানানসই। সে আবার একটু ছটফটে, কথায় ফুলঝুরি ছোটায় অনবরত। তাই তার উদ্দাম নৃত্যের অংশও খুবই উপভোগ্য, তবু শঙ্কা যায় না নিবেদিতার—শেষমুহূর্তে না ডুবিয়ে দেয় রিয়াও।

বেলা প্রায় দশটা কুড়ি। যে প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে তাদের এই কর্মযজ্ঞের আয়োজন, তার নামটি সাদামাঠা, কিন্তু সপ্রযুক্ত। 'আশ্রয়' নামের এই প্রতিষ্ঠানটির আজ চতুর্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। বিশাল পাঁচিলঘেরা কমপাউণ্ডের ভেতর সবুজ লনে তখন হই হই করে চলছে মঞ্চ বাঁধার কাজ। তদারকি করছে নিবেদিতারই দুই সহকর্মী অরণি আর নির্মাল্য। ফাদার বলেছেন ছাউনির ওপর ত্রিপল দিয়ে মুড়ে দিতে। বৈশাখ মাস, এ বছর নয়-নয় করেও দু-তিনদিন কালবৈশাখী হয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আজও সকাল থেকে পশ্চিম আকাশের কোণে

একটু করে কালো মেঘের তর্জনী। শেষপর্যন্ত বিকেলে যদি ঝড়বৃষ্টি হয়, তাহলে এত পরিশ্রম, এত আয়োজন সবই পণ্ড।

রাইয়ের সঙ্গে তখন গান ধরেছে সুছন্দা। গাইছে 'ক্ষমা করো, প্রভু, ক্ষমা করো মোরে— আমি চণ্ডালের কন্যা।' সুছন্দার গলাটা বেশ মিষ্টি। রাইকে তখন দর্শকের চোখ দিয়ে দেখছে নিবেদিতা। গানটা শেষ হতেই সুছন্দাকে জিজ্ঞাসা করল, কী রে, উতরে যাবে বলে মনে হচ্ছে?

সুছন্দা ওদের আর এক সহকর্মী, ভাল গান জানে বলেই ওর চাকরি হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। হেসে বলল, এখন তো ভালই নাচছে। তুই যা খেটেছিস এ ক'দিন!

নিবেদিতার চোখমুখ একটু উজ্জ্বল দেখায়। আজকের এই অনুষ্ঠানটা তার কাছে প্রায় চ্যালেঞ্জের মতো। কী কারণে যেন ফাদার তার ওপর ঠিক সন্তুষ্ট নন কিছুকাল ধরে। অথচ এই ফাদারই তার কাটাছেঁড়া জীবনের কথা জেনে চার বছর আগে চাকরি দিয়ে এনেছিলেন 'আশ্রয়'-এ।

তাদের পেছনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তাদের আর এক সহকর্মী রূপায়ণ। তার সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণে সর্বদাই দুষ্টু হাসির রেখ্। সে নিবেদিতার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করে তুলেছ, মিস্। আজ বিকেলে শো হলে তোমার যে কী খ্যাতি হবে তা ভাবতে পারছ না!

নিবেদিতা পেছন ফিরে ভ্রূকুটি করল রূপায়ণের দিকে, প্লিজ, ওইসব গাধাটাধা বলবে না। আফটার অল, দে আর ডেসটিটিউটস্। ফাদার জানতে পারলে 'আশ্রয়' থেকে তোমাকে ছুটি করে দেবে, হয়তো আমাকেও।

রূপায়ণ দাঁত মেলিয়ে প্রায় নিঃশব্দে হাসল কিছুক্ষণ। তার কুখ্যাতি এই প্রতিষ্ঠানে একজন বাচাল ফচকে হিসেবে। মাঝে মধ্যে তার সহকর্মীদের সঙ্গে, কখনও বা 'আশ্রয়' এর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমন লঘু ইয়ার্কি করে যা প্রায়শ মাত্রাছাড়া মনে হয় অন্যদের। তবু রূপায়ণ নাকি ফাদারের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর ছেলে। তার চাপল্য প্রায়শ মেনে নিতে হয় সবাইকে।

এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েছিল রিয়া। রাইয়ের নাচ শেষ হতেই সে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল নিবেদিতার দিকে, দিদি, আমাকে সেই নাচটা আর একবার দেখিয়ে দেবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আয়, বলে রিয়াকে যে মুহূর্তে দাঁড় করিয়েছে হলের মাঝখানে, হঠাৎ কোথায় ছিল চৈতালি, ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়ল হলঘরে, নিবেদিতাদি, ফাদার আপনাকে একবার ডাকছেন। কোথায় যেন যেতে হবে। বললেন টপ প্রায়োরিটি।

—যেতে হবে? এখনই! নিবেদিতাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখায়, রিহার্স্যাল ছেড়ে! দেখলি কাণ্ডটা? এখন সবাইকে ধরে ধরে কোথায় একটু ফিনিশিং টাচ দিয়ে দেব, তা নয় তো— বলতে বলতে সুছন্দার দিকে একপলক তাকায়, পরক্ষণেই রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই তা হলে নিজে-নিজেই একবার প্র্যাকটিস করে নে। আমি ফাদারের কথা শুনে এখনই আসছি। সুছন্দা তুই একবার দ্যাখ তো, ওর ভুল হচ্ছে কি না—

ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ মুখে নিবেদিতা চৈতালিকে নিয়ে বেরিয়ে এল হলঘরের বাইরে। কয়েকদিন ধরে এই নৃত্যনাট্যটির রিহার্স্যাল ঘিরে বেশ ঘোরের মধ্যে আছে সে। ফাদার খুব কড়াধাতের মানুষ। তাঁর সব সময়েই চেষ্টা কী করে আরও সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে তাঁর 'আশ্রয়'। সারাক্ষণই তিনি ব্যস্ত থাকেন 'আশ্রয়'-এরই কাজে। 'আশ্রয়' তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন।

আজও তাঁর চেম্বারে ঢুকতেই দেখল, ফাদার ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোন করছেন কাউকে। বোধ হয় বিকেলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কোনও বিশেষ অতিথিকে। তাঁর বিশাল সানমাইকা টপ অর্ধবৃত্তাকার টেবিলের এপাশে বসে আছেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী দুই ডেপুটি ডিরেক্টর—একজন প্রৌঢ় রণধীর তরফদার অন্যজন যুবক চম্পক চট্টরাজ। তা ছাড়াও টেবিলের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে নিবেদিতার আরও দুই সহকর্মী তুলিকা আর বিশাখা। নিবেদিতা ভুরুর ইঙ্গিতে তুলিকাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল, হঠাৎ ফাদার কেন জরুরি তলব করেছেন তাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হল না, ততক্ষণে কথা বলা শেষ করে ফাদার টেলিফোনটি ঝনাত্ শব্দে নামিয়ে রেখে তাকালেন তুলিকার দিকে, শোনো, তুমি চারটের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে হোটেলে। শ্রীরাধা তৈরি থাকবেন বলেছেন। ওঁকে তুলে নিয়ে পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসবে এখানে। শার্প অ্যাট ফাইভ।

বলতে বলতে তাঁর চোখ পড়ল উদ্বিগ্ন চোখে দাঁড়িয়ে থাকা নিবেদিতা আর চৈতালির দিকে। তৎক্ষণাৎ ভুরু উঁচিয়ে বললেন, বাহ্, বেশ বেশ। বেলা সাড়ে দশটা বাজতে চলল, আর তোমরা এখনও আমার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে সার্কাস দেখছ। তোমাকে সেই কতদিন আগে বলেছি, নিউমার্কেট থেকে ফুল আনতে হবে। গো, ইমিডিয়েট। বলে পকেট থেকে ছ' খানা একশো টাকার নোট বার করে ছুড়ে দিলেন টেবিলের অন্যপ্রান্তে, অন্তত ছ'সাতটা বড় বোকে নিয়ে আসবে। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক মান্য অতিথিরা আসবেন, সবাইকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হবে, আর ফ্লাওয়ার ভাসে রাখার জন্য কয়েক ডজন রজনীগন্ধা। এ ছাড়া লুজ গোলাপ নিয়ে আসবে দুশো। ঝাউপাতা দিয়ে সেট করে। ছ'শো টাকায় সব হবে তো, না আরও লাগবে—

পকেট থেকে আর চারখানা একশো টাকার নোট বার করে ছুড়ে দিলেন ফাদার, ট্যাক্সি করে যাবে, ট্যাক্সি করে আসবে। চৈতালিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমাকে সাহায্য করবে। গো, কুইক—

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে ফাদার চোখ ফেরালেন রণধীর তরফদারের দিকে, হ্যাঁ, তরফদার তোমাকে কী যেন বলছিলাম—

নিবেদিতা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে তার আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলবে না। রিহার্স্যালের প্রসঙ্গ তোলা অবান্তর। ফাদার যা বলার তা হুড়হুড় করে বলে পরক্ষণে ডুব দিয়েছেন অন্য সমস্যায়। এরপর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে খামোখা ফাদারের ধমক খাওয়া। এইরকমই স্বভাব ওঁর। সবসময়েই কী এক ধরনের ব্যস্ততায় থাকেন। রূপায়ণের ভাষায়, ফাদারের অপর নাম টাট্টুঘোড়া। সহজ, ধীর স্থির ভাবে কথা বলার মতো বিন্দুমাত্রও ফুরসত নেই। তাঁর শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ। ফাদার অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা, প্রতিষ্ঠাতা-কাম-ডিরেক্টর ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যাল সারাক্ষণ কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। আর আজ তো একটা অতিরিক্ত শশব্যস্ততা থাকবেই। তাঁর নিজের হাতে তিলতিল করে গড়ে তোলা 'আশ্রয়'-এর এবারকার জন্মদিনটি এক আশ্চর্য সৌন্দর্য আর নিবিড় ভাল লাগায় ভরে তুলতে চান আজকের বিকেলে।

কড়কড়ে দশখানা একশো টাকার নোট তার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে চৈতালিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নিবেদিতা। এতক্ষণে মনে পড়ল, সে-ই তো ক'দিন আগে ফাদারকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, 'আপনি ইচ্ছে করলে ফুল কেনার দায়িত্বটা আমাকে দিতে পারেন। ফুল কিনতে আমার খুব ভাল লাগে।' ফাদার সে কথা ঠিক মনে রেখেছেন। আশ্চর্য স্মরণশক্তি ওঁর। অতএব এখন নিবেদিতার নিউ মার্কেটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চার বছর আগে আচমকা জড়িয়ে পড়ার পর নিবেদিতাও এখন মনেপ্রাণে ভালবাসে এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটিকে। তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ খলবল করতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানের একশো 'সবুজ'। 'সবুজ' মানে যারা 'আশ্রয়'-এ আশ্রয় পেয়েছে, যাদের এই পৃথিবীতে হয় কেউ নেই, অথবা থেকেও নেই।

সবুজ মস্ত লন পেরিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিবেদিতা দেখল, হালকা রোদ উঠেছে এতক্ষণে। মেঘের তর্জনী এখন তত উঁচিয়ে নেই, বরং ঝাঁজ-ঝাঁজ রোদের ধমকে কিছুটা ম্রিয়মাণ। বিশাল বাড়িটার সিঁড়ি থেকে গেট পর্যন্ত ছ'ফুট চওড়া পিচ রাস্তা। তারই একদিকে নির্মীয়মাণ মঞ্চটি ক্রমশ ভরে উঠছে দেবদারুপাতার সঙ্গে রঙিন কাপড়ের ডিজাইনে। পাশেই দাঁড়িয়ে নির্মাল্য। একটু দূরে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেটমুখে উদাসীন অরণি। নিবেদিতাকে হন্তদন্ত হয়ে গেটের দিকে যেতে দেখে নির্মাল্য চোখের ইঙ্গিতে জানতে চাইল, কোথায়?

নির্মাল্যর কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে দশ-বারো বছরের কয়েকটি 'সবুজ'। ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাদের চোখমুখ। আজ বিকেলে যে একটা আনকোরা অভিজ্ঞতা হাজির হচ্ছে তাদের সামনে তা জেনে ও বুঝে উল্লাসে টইটই করছে অকারণে। সে দৃশ্যের দিকে একনজর ছোঁ দিয়ে নিবেদিতা চোখ পাতল নির্মাল্যর শরীরে। নকশা-করা মেরুন পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা পাজামায় ভারী সুপুরুষ দেখায় নির্মাল্যকে, তার মৌন প্রশ্নের উত্তরে নিবেদিতাও মুখে কিছু বলল না, শুধু হেসে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল বাইরে কোথাও যাচ্ছে।

কিছুই না বুঝে নির্মাল্য এবার গলা খুলল, সঙ্গে যাব না কি, ম্যাডাম!

নিবেদিতা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল না।

গেটের বাইরে বেরিয়ে নিবেদিতা হাসল নিজের মনে। মাত্র কিছুকাল হল তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য একটু টহল দিচ্ছে নির্মাল্য। হঠাৎ-হঠাৎ এসে তার সঙ্গে গল্প জমানোর চেষ্টা করে। বিশেষ করে সে যখন একলাটি থাকে কখনও। নিবেদিতা তাকে এড়িয়ে যায় সযত্নে। তার বুকের ভেতর জমে আছে একরাশ দীর্ঘশ্বাস, নির্মাল্য তা জানে না বলেই—

গেটের ঠিক মুখেই চমৎকার একটি আর্চ বানানো হয়েছে দেবদারু পাতা দিয়ে। আর্চের ওপর সুন্দর অক্ষরে বড় বড় করে লেখা ঃ আশ্রয়।

তার একটু নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে ; সবুজের অভিযান।

গেটের বাইরে বেরিয়ে নিবেদিতার চোখ এধার-ওধার পাতে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এই নির্জন এলাকাটিতে ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর। তবে আজ বরাত ভাল। সামনেই একটা ট্যাক্সি। বোধ হয় ড্রাইভার সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছিল দেবদারুময় গেটটার দিকে তাকিয়ে। তাকে নিউমার্কেট বলতেই সে তৎক্ষণাৎ মিটার ডাউন করে বলল, উঠুন।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করতেই এতক্ষণে আরও ঝলমল করে উঠল চৈতালির উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখ, আজ বিকেলে দারুণ রইরই কাণ্ড তাই না, নিবেদিতাদি?

নিবেদিতা তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে। ট্যাক্সি ততক্ষণে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হু হু করে চলেছে বেকবাগানের দিকে। রোদ খুব চড়া নয়। ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘে ভিজে পান্‌সে হয়ে আছে বোশেখি রোদ্দুর। নইলে এতক্ষণে পিচরাস্তা থেকে আগুন ঠিকরানোর কথা। চৈতালির কথায় মুখ ফেরাল, তাই তো মনে হচ্ছে।

—ইস, আমি ভাবতেই পারছি না, বোম্বে থেকে শ্রীরাধা এসে পৌঁছেছেন শুধুমাত্র আমাদেরই ফাংশন দেখতে। আর আমিই তাঁর হাতে আজ তুলে দেব পুষ্পস্তবক।

নিবেদিতা কিছু বলল না, শুধু হাসল একটু।

—আমি শ্রীরাধার কত যে ছবি দেখেছি, বলতে বলতে আবারও উচ্ছ্বসিত চৈতালি, আমি ওঁর ভী-যণ ফ্যান।

নিবেদিতা কথা বলল না, তার মনের ভেতর তখন একটা চিলতে ঘূর্ণি তুলছে বিকেলের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। নৃত্যনাট্যের প্রতিটি দৃশ্য আরও একবার করে কালিয়ে নিতে চাইছে চোখ বুজে। কোথাও কারও ত্রুটির কথা মনে পড়লেই উৎকণ্ঠা চারিয়ে যাচ্ছে রক্তে। ফুল কিনে ফিরে এসেই শেষমুহূর্তে আর একবার দেখে নেবে টলোমলো অংশগুলো।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের সামান্য জ্যামজট কাটিয়ে নিউমার্কেটের কাছে পৌঁছাত মিনিট কুড়ি-বাইশ। ভাড়া মিটিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে গেল ফুলের স্টলগুলোর দিকে। রোদ এখনও দিব্যি গা-সওয়া। সামান্য গুমোট হচ্ছে অবশ্য। তবু এমন মেঘ-মেঘ দিনে ফুল কেনার মজাই আলাদা।

আসলে ফুল নিবেদিতার ভারী প্রিয়। একটা বেলির মালা কিংবা একটি গোলাপ পেলেও সে কারণে অকারণে জড়িয়ে রাখে খোঁপায়। 'আশ্রয়'-এর যে-ঘরটায় সে আর বিশাখা থাকে, প্রায় রোজই দেখা যায় তাদের ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিংবা গ্লাডিঅলির স্তবক। কিছু না পেল তো একঝাঁক রঙ্গন।

আজও নিউমার্কেটের ফুলস্টলে পৌঁছে লাল-সাদা-গোলাপি-বেগুনির বর্ণাঢ্য সমাহারের দৃশ্যে কিছুক্ষণ মুগ্ধ। রকমারি গোলাপ, নানারঙের সিজন ফ্লাওয়ার আর রজনীগন্ধার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে একটি বড় করে শ্বাস নিল। আহ্, কী দারুণ। চমৎকার একটি মিষ্টি সুরেলা গন্ধ ছড়িয়ে গেল শিরায় শিরায়। তার মনে সারাক্ষণ যে-দমবন্ধ করা একটা কষ্ট বসবাস করে, তার থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি। আজ কী দারুণ-দারুণ রঙের গোলাপ এনেছে ওরা। ইস; ওটা কী গোলাপ! প্রিন্স নাকি!

চৈতালিও ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাশিকৃত ফুলের সমাহারে। এক-একটা বোকে তুলছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, আর কলকল করে উঠছে, এটা দ্যাখো, নিবেদিতাদি, কী সুন্দর কারুকাজ ভেতরে। দ্যাখো এটাই বেস্ট। এটা শ্রীরাধার জন্য নেব?

গণ্যমান্য অতিথিরা আজ সংখ্যায় কম নয়। কিন্তু চৈতালি তখন থেকেই কেবলই পাগল হচ্ছে শ্রীরাধার নামে। মুম্বইয়ের গ্ল্যামারাস নায়িকারা আজকালকার টিনএজারদের কাছে কোনও পরীর দেশের বাসিন্দা। তারাও কী প্রসাধন করে, কী খায়, কখন ঘুমোয়, কীভাবে তাকায়, হাসে—এ সবই যেন তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। সেরকমই একজন ডাকসাইটে অভিনেত্রী হঠাৎ সিনেমার পর্দা থেকে বেরিয়ে তাঁর যাবতীয় কুহক সহ আসছেন দুঃস্থ অনাথ ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান দেখতে। চৈতালিদের কাছে ব্যাপারটা প্রায় ইন্দ্রজাল।

ফুল বাছাবাছি করে কেনাকাটিতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় নিল দুজনে। তাদের দু'হাত তখন উপচে পড়ছে ফুলের রাজকীয়তায়। নিবেদিতা এর মধ্যেই একটা বেলির মালা জড়িয়ে নিয়েছে খোঁপায়, চৈতালিকেও পরিয়েছে একটা। আরও অনেকগুলো সঙ্গে নিয়েছে বিকেলে নৃত্যনাট্যের কুশীলবদের সাজাবে বলে। কেনাকাটা সেরে নিশ্চিন্ত। এখন দরকার একটা ট্যাক্সির।

এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে নিবেদিতা বলল, তুই ফুলগুলো নিয়ে এখানে একটু দাঁড়া, চৈতালি, আমি ওদিকটায় দেখে আসি ট্যাক্সি পাওয়া যায় কি না।

নিউমার্কেটের উল্টোদিকে একটা প্রাচীন অথচ সৌখিন বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে চৈতালিকে অপেক্ষা করতে বলল নিবেদিতা। তার হাতের বোকে আর ফুলগুলো দেওয়ালের গায়ে স্তূপ করে রেখে বলল, সাবধানে থাকিস। আমি এক্ষুনি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।

চৈতালি হাসিহাসি মুখে দাঁড়াল একপাশে। কিন্তু এই ভিড়-ভিড়াক্কার জায়গায় ট্যাক্সি খুঁজে খুঁজে নিবেদিতা হাল্লা। হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে চলল জওহরলাল নেহরু রোডের দিকে সোজা গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। একটা ট্যাক্সি একটু পরেই এসে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিল এক দম্পতিকে। নিবেদিতা তক্ষুনি ছুটে গিয়ে পাকড়াও করল ট্যাক্সিওলাকে।

চৈতালি এতক্ষণ খেয়াল করেনি, একটা নীল অ্যাম্বাসাডার অনেক আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল কাছেই। গাড়ির বাইরে দুই আরোহী। একজনের মুখ গোল ফুলো-ফুলো, চোখে কালো গগল্স, মুখে সিগারেট, মাথায় নীলরঙের বিদেশি টুপি, গায়ে গোলগলা নীল গেঞ্জি। বয়স তিরিশের এদিক ওদিক। অন্যজনের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, নীল জিনসের ওপর হলুদ টিশার্ট। তার মাথার দিকে সামান্য টাক। নিবেদিতা চলে যেতেই দুজনে চলে এল চৈতালির দু'পাশে। আচমকা তাদের একটা হাত এসে চেপে ধরল তার নাকে, সামান্য একটা মিষ্টি গন্ধ তার চেতনাকে ধুয়ে মুছে দিল মুহূর্তে।

ট্যাক্সি নিয়ে নিবেদিতা ফিরে এসে চৈতালিকে না দেখে প্রথমটায় অবাক। এদিক-ওদিক তাকাল এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে। সহসা ফুটপাথে ছড়িয়ে থাকা বিপর্যস্ত বোকেগুলো, অসম্বৃত ফুলের সম্ভার দেখে ছ্যাঁত করে উঠল তার বুকটা। সে কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচাল, চৈতালি, চৈতালি—

কোনও উত্তর না পেতে নিবেদিতা আরও দিশেহারা। পাগলের মতো তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। একবার এগিয়ে গেল নিউমার্কেটের সেই ফুলঅলাদের দিকে, যদি কোনও কারণে গিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু না, সেখানেও নেই। আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। যে-বোকেগুলো চৈতালির হাতে ছিল, সেগুলো চারপাশে পড়ে আছে, এলোমেলো, বিস্রস্ত— যেন দুষ্টু বালিকার ফেলে যাওয়া একরাশ খেলনা। বাকি নিউমার্কেট যথারীতি ব্যস্তসমস্ত, স্বাভাবিক। বোঝাই যাচ্ছে না একটু আগেই এখানে চৈতালি নামের একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে ছিল কি ছিল না।

নিবেদিতার বুকের ভেতর তখন একটানা ধকধক শব্দ। সে বুঝতে পারছে না তার এখন কী করা উচিত। তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠছে ক্রমশ।

একটু দূরেই আমের ঝুড়ি নিয়ে বসে ছিল এক ছন্ন কিশোর। নিবেদিতা তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আওড়াল, এটা দশ এটা বারো—

তাকে চৈতালির কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে পলকে তাকায়, সবুজ চুড়িদার পরা মেয়েটা? দুটো লোকের সঙ্গে একটি নীল গাড়িতে উঠে—

কী! নিবেদিতার গলায় তার অজান্তে আর্তনাদ। কাছেই একটা নীল অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে ছিল সে দৃশ্যটা স্মরণ করতে পারল তৎক্ষণাৎ। আর কিছু ভাবতে পারল না। ট্যাক্সির ভেতর বোকে আর ফুলগুলো কোনও ক্রমে তুলে ছুটল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে।

নিবেদিতা যখন ফিরে এল 'আশ্রয়'-এ, বেলা মধ্যদুপুর। এত দেরি দেখে সবাই খুব দুশ্চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত। বিপর্যস্ত নিবেদিতা প্রায় টলতে টলতে ঢুকে পড়ল ফাদারের ঘরে। হু হু করে কেঁদে ফেলে জানাল চৈতালির নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সংবাদ।

সমস্ত অফিসঘর, স্কুলবাড়ি, বোর্ডিং হাউস তখন জমজম করছে বিকেলের কর্মসূচি রূপায়ণে। সবাই ব্যস্ততার তুঙ্গে। কিন্তু মাত্র কয়েক টুকরো কথায় হঠাৎই সব হইরই, কলরব,

উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল সুইচ অফ-করা টিভি-র মতো। ফাদার হতবাক হয়ে বললেন, বলছ কি তুমি, নিবেদিতা? তাই কখনও হতে পারে? তুমি সঙ্গে ছিলে!

নিবেদিতা তখন কেঁদেই চলেছে, কিছুতেই সে বুঝিয়ে উঠতে পারছে না চৈতালি কখন কীভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল ব্যস্ত নিউমার্কেটের সামনে থেকে।

ফাদার তখন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন নিবেদিতার দিকে, ইট'স অ্যাবসার্ড। আজ এরকম একটা অনুষ্ঠান, কলকাতার সেরা সেরা মানুষেরা আসবেন ফাংশন দেখতে, আর তুমি কিনা বলছ চৈতালিকে দেখতে পাওনি; তুমি এতটা ইররেসপনসিব্‌ল তা তো মনে হয় না। কী ব্যাপার, ঠিক করে খুলে বলো তো? ব্যাপারটা প্রি-অ্যারেঞ্জড্‌ নয় তো? ছিঃ—

নিবেদিতা হু হু করে কাঁদছিল। হঠাৎ ফাদারের শেষ কথায় স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। চৈতালির নিখোঁজের ঘটনায় ফাদার সন্দেহ করছেন তাকেই!

কান্না থামিয়ে নিবেদিতা জলভরা চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে ফাদারের দিকে। তার মুখে একটি কথাও ফোটে না। প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেল সহসা। হঠাৎ কে যেন তার হাত ধরে বলল, বাইরে আয় তো। কী হয়েছে ঠিক করে বল। থানায় জানাতে হবে তো ঘটনাটা।

নিবেদিতার শরীর শক্ত হয়ে গেছে হঠাৎ। যেন বিদ্যুৎ-মেশানো ছেঁড়া তারে হাত লেগে গেছে কোনওভাবে। তাকিয়ে দেখল, গার্গী। গার্গীকে দেখে তার সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কথা। গার্গীকে সে-ই তো কাল দুবার ফোন করেছিল এখানে আসতে। গার্গী যখন এখানে কাজ করত, সে-ই ছিল নিবেদিতার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাকে দেখে আবার হু হু করে কেঁদে ফেলল নিবেদিতা, বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না। চৈতালিকে নিশ্চয়ই কেউ—

## ॥ ২ ॥

নিউমার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে একটি কিশোরী হঠাৎ উধাও হয়ে গেল এ-খবরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল 'আশ্রয়'-এ। নিবেদিতা খুবই দায়িত্বশীল, তার সব কাজেই বিচক্ষণতা। প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের ওপর তার টাপেটুপে ভালবাসা। ক্লাস নেওয়ার সময় সে খুব মন দিয়ে পড়ায়। তার সঙ্গে বেরিয়ে চৈতালি আচমকা হারিয়ে যাবে তা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না কেউই।

নিবেদিতা তার ঘরে গিয়ে ভেঙে পড়ল ভীষণভাবে। গার্গী অনেককাল পরে এসেছে এই প্রতিষ্ঠানটিতে—নিবেদিতা অনেকবার ফোনাফোনি করার ফলেই, বলেছিল, ফাদার চাইছেন যারা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিল বা আছে, তাদের সবাইকে যেন হাজির করানো যায়।

গার্গী অবশ্য যুক্ত ছিল তিন-চার বছর আগে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন এলোমেলো ঘুরছিল নানান বিষয় নিয়ে ফিচারের সন্ধানে, তখনই চোখে পড়েছিল বিজ্ঞাপনটা। ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যাল নামের একজন সমাজমনস্ক ব্যক্তি তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির জন্য উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে দরখাস্ত চেয়েছেন। দুঃস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আলটপকা একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিতেই

প্রথমে ইন্টারভিউ, অতঃপর চাকরি। চাকরিতে মাইনে সামান্য, কিন্তু উদ্দেশ্য অসামান্য। গার্গী দুম করে যোগদানও করেছিল প্রতিষ্ঠানটিতে। তখনও অবশ্য এর নাম 'আশ্রয়' হয়নি। গার্গীদের কাজ ছিল—কখনও কলকাতায়, কখনও কাছাকাছি জেলায় গিয়ে কোনও হতদরিদ্র এলাকার আর্থ-সামাজিক রূপরেখা তৈরি ও তথ্য সংগ্রহ করা। সেই সঙ্গে এলাকার দুঃস্থ বা অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা এই প্রতিষ্ঠানে। অবশ্যই তাদের অভিভাবক বা নিকট আত্মীয়দের অনুমতি সাপেক্ষে।

এখানে কাজ করতে করতেই গার্গীর মনে হয়েছিল ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যাল এক আশ্চর্য ও অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। মস্ত এক ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে পাড়ি দিয়েছিলেন বিলেতে সোসিওলজিতে ডক্টরেট করতে। বছর কয়েক পরে ফিরে এসে কিছুদিন জড়িয়ে পড়েছিলেন নানারকম সমাজকল্যাণমূলক কাজে। অর্থচিন্তা নেই যখন, মানুষের সেবার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন এমন ভাবাভাবির ফুরসতে হঠাৎ গড়ে ফেললেন এই সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁদের এহেন বিশাল বাড়িটিও এতকাল পড়েছিল প্রায় অনাথ, দুঃস্থ অবস্থায়। সেই বাড়িটিকেই পুরোপুরি নতুন করে তুলে এই প্রতিষ্ঠান।

কাজটা ভালই লেগেছিল গার্গীর। ফাদার বলতেন, তোমরা মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু হঠাৎই তার জীবনে এক জটিল সমস্যা আবর্তিত হওয়ায় এখানকার চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তারপর 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর বিপুল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তার জীবন এখন অন্য খাতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, এতদিনেও এখানকার সঙ্গে তার সম্পর্ক যে একেবারে ছিন্ন হয়নি, তা জানতে পারল নিবেদিতার ফোন পেয়ে। আজ বিকেলে অনুষ্ঠান। তবু নিবেদিতা বলেছিল, তুই সকালেই চলে আয়। তুই পাশে থাকলে আমার একটু সাহস হয়।

আজ শনিবার, তার অফিসে হাজারো কাজ থাকা সত্ত্বেও 'আশ্রয়'-এর টানে-টানেই চলে এসেছিল সাড়ে বারোটা নাগাদ। এসে দেখল, আশ্রয় লণ্ডভণ্ড। চৈতালি নামের মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার কারণে অনুষ্ঠানটাই পণ্ড হওয়ার মুখে।

কিন্তু এত নামীদামি মানুষজনের সমাহার, সবাই এসে পৌঁছবে আর একটু পরেই, অনুষ্ঠান তো আর বন্ধ করে দেওয়া যায় না। ফাদার কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে, কিছুক্ষণ একে-ওকে বকাঝকা করে অবশেষে বলেছেন, ঠিক আছে, নিখোঁজ মেয়ে খুঁজে বার করা যাদের কাজ তারা করুক। লেট আস ডু আওয়ার জব।

আচম্বিত এলো হাওয়ায় থমকে গিয়েছিল সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই। ফাদারের হুকুম পেতে আবার চলতে শুরু করল ঠিকই, কিন্তু সে চলা যেন চলা নয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা।

প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ডঃ বটব্যাল নিজেকে ফাদার হিসেবে পরিচিত করতে পছন্দ করেন। তাঁর পোশাক-আসাকও অনেকটা গির্জার ফাদারের মতো—গোড়ালি পর্যন্ত সাদা ঢোলা জোব্বা, কোমরে সবুজ রিবন বাঁধা। তাঁর প্রধান সহকারী দুই ডেপুটি ডিরেক্টর এখানে পরিচিত আঙ্কেল নামে। আছে একশো সবুজ। এই সবুজের দেখভাল করার জন্য যে-একগুচ্ছ তরুণ-তরুণীকে চারবছর আগে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ ছেড়ে চলে গেছে আরও বড় সুযোগ পেয়ে, কেউ গেছে বেতনে পোষায়নি বলে। মাইনাস-প্লাস করে আপাতত আছে ন'জন। কাগজে-কলমে এদের বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু ফাদার এদের পরিচিত করতে চান ব্রাদার বা সিস্টার নামে। বলতে গেলে এই তত্ত্বাবধায়করাই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। তাদের মধ্যে পাঁচ তরুণী—নিবেদিতা, বিশাখা, তিয়াসা, তুলিকা আর সুছন্দা। চার তরুণ—

রূপায়ণ, অরণি, নির্মাল্য ও সমুদ্রনীল। সবারই বয়স পঁচিশের এপাশে ওপাশে। ফাদারের মতে এই বয়সটাই হল জীবনের সংগঠিত হওয়া ও সংগঠিত করার সময়, যখন দু'চোখে লেগে থাকে কিছু একটা গড়ে তোলার স্বপ্ন।

হয়তো সে কারণেই ক'জন তরুণ তরুণী ফাদারের এই স্বপ্নটা একটু একটু করে গড়ে তুলছিল গত চার বছর।

গার্গীর মনে পড়ে সে যখন এখানে ছিল নিজেদের ব্রাদার বা সিস্টার না বলে বিদঘুটে সব নামকরণ করেছিল নিজেদের। অরণি বেশি ভাবত বলে তার নাম ভাবালু। নাচের মাস্টারনি বলে নিবেদিতা নাচুনি। বেশি রাগ বলে বিশাখার নাম রাগিণী। রূপায়ণ দুষ্টু বলে সে ফিচেল, সমুদ্রনীল ভাল গিটার বাজায় বলে বেটোফেন, তুলিকা ফাদারের আত্মীয়া বলে বাঘের মাসি। আর গার্গীর নামকরণ হয়েছিল 'অদ্ভুত'—তার রীতিবহির্ভূত কাজকর্মের ফলেই। বাকিরা অবশ্য গার্গী চলে যাওয়ার পর এসেছে। তাদের কার কী নামকরণ কে জানে!

কিন্তু ফাদারের সেই ছিঃ শব্দটা তখন কাঁকড়াবিছের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে নিবেদিতাকে। গার্গী অনেক করে সেধেছিল দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে। কিন্তু নিবেদিতা বিছানায় মুখ গুঁজে, ফুঁপিয়ে বলেছে সে-মেয়েটা 'আশ্রয়'-এ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি দাঁতে কুটোটি কাটব না। তোরা একটু বল্‌না ফাদারকে। পুলিশের বড় বড় অফিসারের সঙ্গে তো ওঁর খুব চেনাজানা। তারা পারে না চৈতালিকে খুঁজে বার করে আনতে।

নির্মাল্য, অরণি, সমুদ্রনীল, সুছন্দারা দল বেঁধে গিয়েছিল ফাদারের ঘরে, ফাদার, আপনি যদি একটু ফোনটোন করেন। নিশ্চয়ই পুলিশ কোনও ভাবে—

ফাদার তখন ফোন করছিলেন মেয়রকে। মেয়রই আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি। ফোন নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে বললেন, তোমরা কি মনে করো, আমি চুপ করে বসে আছি? কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে যত আই.জি, ডি.আই.জি আমার চেনাপরিচিত, সবাইকে জানানো হয়ে গেছে ঘটনাটা। মিসিং স্কোয়াড এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। দে হ্যাভ গিভ্‌ন্‌ মি ওয়ার্ডস্‌—

নির্মাল্য বলল, আমরা একবার জায়গাটা ঘুরেঘেরে দেখে আসব?

—এখন তোমরা যাবে চৈতালিকে খুঁজতে? ফাদার পলকে চোখ কপালে তুলে ফেললেন, চৈতালি কি তোমাদের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এখনও? আশেপাশে যদি কোথাও গিয়ে থাকত, ফিরে এসে নিবেদিতাকে না দেখতে পেলে এতক্ষণে বাসে চড়ে এখানেই ফিরে আসত নিশ্চিত। আসলে ব্যাপারটা জলবৎ পরিষ্কার। ওরকম উঠতি বয়সের মেয়ে! তাদের মাথায় কখন কী ব্যামো চাপে তা ঈশ্বরও জানেন না। হয় নিজে পালিয়েছে, না হয়—

না হয়, বলে ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে থেমে গেলেন ফাদার যার একটাই অর্থ এর ভেতর নিবেদিতার কোনও ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে। কথাটা একবার স্পষ্ট করে ফাদার বলেছেন বলে এবার থেমে গেলেন আচমকা।

ফাদারের কথার ওপর আর কথা চলে না এই প্রতিষ্ঠানে। নির্মাল্য, সমুদ্রনীল, সুছন্দা সবাই তাকাতাকি করল নিজেদের মধ্যে। ফাদার অবশ্য একটু থেমে আবার বলে উঠলেন, নিবেদিতা তো এসে বলল, পাওয়া গেল না। ব্যস, তার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু আমার অবস্থা কী হবে তা কেউ ভেবে দেখেছে একবার? চৈতালি অরফ্যান, তার কেউ কোথাও নেই, এতদিন তার কেউ খোঁজ নিতে আসেনি, হয়তো এখনও আসবে না। কিন্তু গভর্নিংবডির মিটিঙে কী

সাফাই গাইব আমি? পাবলিককেই বা কী কৈফিয়ত দেব? গত চারবছর এত সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে এ কী বিপদের মুখে আমাকে ঠেলে দিল নিবেদিতা!

নির্মাল্যরা শুকনো মুখে বাইরে বেরুতেই শুনল তুলিকার গলা, তোরা যাই বলিস. নিবেদিতাকে কিন্তু আমার মোটেই সুবিধের মনে হয় না। এক বছর তো দেখছি ওকে।

কথাটা গার্গীকে উদ্দেশ করে বলা। গার্গী খুবই আশ্চর্য হয়ে বলল, কী বলছিস তুই!

—অবশ্যই। আমার তো ভারী মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। তরফদার আঙ্কেল তো তাই বললেন।

—তরফদার-আঙ্কেলও তাই বললেন। গার্গী বহুকাল এখানকার ব্যাপার-স্যাপারের খোঁজ রাখে না। সে যখন চার বছর আগে এখানে ছিল, তখনকার সঙ্গে চার বছর পরের প্রতিষ্ঠান অনেকখানি বদলে গেছে, তবু নিবেদিতাকে সে যত দূর চিনত, তাতে তুলিকার কথা আশ্চর্যই করল তাকে।

নির্মাল্য ফাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে থমকাল হঠাৎ। তুলিকার মুখে এমন বিশ্রী একটা কথা শুনে চমকে উঠে বলল, তুলিকা, তুমি জান না ওখানে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে। শুধু শুধু একটি নিরীহ মেয়ের নামে এমন একটি সন্দেহ রটিয়ে দিতে চাইছ কেন?

তুলিকা ভুরুতে আরও সন্দেহ মাখিয়ে বলল, তুমি তো নিবেদিতার হয়ে সাফাই গাইবেই, ও কেন চৈতালিকে নিয়ে একা গিয়েছিল অত ফুল আনতে! আমাদের আর একজন কাউকে নিয়ে গেলেই পারত। তাহলে আর সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকত না।

নির্মাল্যর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। তুলিকা যে ফাদারের কোনও আত্মীয় কন্যা তা বাকি সবাইকার জানা আছে বলেই থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশটা। গার্গী বুঝে ফেলল এই বিপ্রতীপ সংলাপ আরও কিছুক্ষণ চলতে দিলেই একদম চালে-ডালে হয়ে যাবে অনুষ্ঠানটা। কিন্তু সে এখন বাইরের লোক। এদের কথাবার্তার মধ্যে তার টিকোলো নাক না গলানোই হয়তো ভাল। তবু এরকম ঝোড়ো সংকটের সময় বাইরের কাউকেই তো শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হয় পরিস্থিতি। আর সে তো একেবারে উড়ো খই তাও তো নয়। অতএব কণ্ঠস্বরে বেশ কম্যাণ্ড নিয়ে বলে ফেলল, এখনই তদন্ত কমিশনটা না বসিয়ে, ফাদার যেমন বলেছেন সেই আইনরক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয় না? এদিকে ঘড়িতে কত বাজে সে খেয়াল আছে! এখনই যদি প্রস্তুত না হও সবাই, ঠিক সময়ে আরম্ভই করা যাবে না প্রোগ্রামটা। অতিথিদের যা তালিকা দেখলাম—

তার কণ্ঠস্বরে যে সামান্য এক টুকরো ধমক মেশানো ছিল তাতে সম্বিতে ফিরল সবাই। বোধহয় মাস আষ্টেক এখানে কাজ করেছিল গার্গী। তাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সবার মধ্যে। গার্গী যখন এখানে ছিল, তাদের কাজকর্মের নেতৃত্ব দিতে সে-ই এগিয়ে আসত বারবার। আজও সে অনুভব করল, বাকি সবাই যখন নেতিয়ে পড়েছে, তাকেই কথার টনিক দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে হবে সবাইকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফাদারও তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ করলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের ঝিমুনি। সারাক্ষণ টিমওয়ার্ক শব্দটায় তিনি বারবার আণ্ডারলাইন করেন, হঠাৎ তাঁর টিমটা দাঁড়িয়ে পড়েছে এহেন আচমকা দুর্ঘটনায়। গার্গীকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, তুমি ব্যাপারটা দ্যাখো তো। আমি বোধহয় একটু বেশিই বকাঝকা করে ফেলেছি। এদিকে কে অ্যানাউন্সমেন্ট করবে তা ঠিক করতেই ভুলে গেছি। তুমি তো বেশ ভাল বলোটলো। দ্যাখো তো অ্যানাউন্সমেন্টের ভারটা তুমিই নিতে পারো কি না।

গার্গী একটু অবাক হল ফাদার তাঁকে এখনও ঠিকঠাক ভুলে যাননি দেখে। এখানে থাকতে দু-একবার বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি হয়েছিল তার। যেমন চমৎকার তার কণ্ঠস্বর, তেমনই তার বাচনভঙ্গি। কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে এর আগে করেনি। সে কি পারবে এত সেরাসেরা মানুষের উপস্থিতিতে সঠিক ভাবে ভূমিকাটা পালন করতে!

তখনই মনে পড়ে গেল সে তো আর এখানকার তত্ত্বাবধায়কদের একজন নয়, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মতো দায়িত্বশীল পদে আসীন। কত-কত মিটিং তাকে পরিচালনা করতে হচ্ছে দুঁদে বুরোক্র্যাটদের মতো। পারবে নাই বা কেন!

পাঁচটার মধ্যেই সেজেগুজে রানি হয়ে ওঠা মঞ্চ ভরে উঠল অনেক অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে। কলকাতার মেয়র এসেছেন, এসেছেন পুলিশের জনা দুই বড় কর্তা, দুই নামী ফুটবলার, একজন বিখ্যাত সাংবাদিক, দু-তিনজন গায়ক-গায়িকা। একটু পরেই পুলিশি প্রহরায় এসে পৌঁছবেন মুম্বইয়ের নামী অভিনেত্রী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে রাখা হয়েছে একটি ফাইভস্টার হোটেলে। হোটেলটির নাম গোপন রাখা হয়েছে, না হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে।

গার্গী মঞ্চের গ্রিনরুমে দাঁড়িয়ে পরপর ছকে নিচ্ছিল তার অনুষ্ঠানের আইটেমগুলো। গত এক মাস লাগাতার পরিশ্রম করে সবাই মিলে তালিম দিয়েছে ছেলেমেয়েদের। নাচ-গান-আবৃত্তি শেষ হলে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। যারা এর কুশীলব তাদের সাজগোজ করাচ্ছে তিয়াসা, সুছন্দা আর অরণি। মঞ্চে আলো পড়ে মুখগুলো ঝলমল করে ওঠার কথা আজ, কিন্তু কই, তা তো উঠছে না, এক চৈতালির অভাবে সবাই স্তব্ধ, হতাশ, ম্রিয়মাণ।

গার্গী সবাইকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। নৃত্যনাট্যের সব কুশীলবকে এক জায়গায় করে বলল, আজকের অনুষ্ঠানটা তোমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। তোমরা যে কারও চেয়ে কম নও তা প্রমাণ করতে হবে আজ। ফাদার যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাতে চৈতালি অবশ্যই ফিরে আসবে।

'সবুজ' ছেলেমেয়েদের অনেকেই অবশ্য গার্গীকে চেনে না। তবু গার্গীর পরিচয়, তার অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি দেখে তাকে সমীহ করছে বেশ। কিন্তু নিবেদিতা এতই ভেঙে পড়েছে যে, তাকে আনাই যাচ্ছিল না গ্রিনরুমে। গার্গী তার ঘরে গিয়ে বহু বুঝিয়ে-টুঝিয়ে নিয়ে এসেছে নীচে। বলেছে, তোর এতদিনকার সুনাম, এই অনুষ্ঠানের পেছনে কত খাটাখাটুনি সব ফাদারের একটা কথায় নষ্ট হয়ে যাবে!

ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে পনেরো। শ্রীরাধা তখনও এসে পৌঁছননি বলে চঞ্চল হয়ে উঠছেন ফাদারও, ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। গ্রিনরুমের একদিকে সমুদ্রনীল গুনগুন করে গান করছে দেখে ফাদার বললেন, তুমি আর একবার ফোন করো তো হোটেলে, কী হল ওঁদের। পাঁচটার মধ্যেই তো এসে যাওয়ার কথা।

সমুদ্রনীল আজকের নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত পরিচালক, একজন গায়কও বটে। এতক্ষণ মনে মনে ছকে নিচ্ছিল পরপর দৃশ্যগুলির আবহ। হঠাৎ ফাদারের এমন বিদঘুটে আদেশে একটু এলোমেলো হয়ে বলল, আমি এখন টেলিফোন করতে যাব!

মঞ্চ থেকে অফিস বিল্ডিং খানিকটা দূরেই। তার পক্ষে এখন টেলিফোন করতে যাওয়া খুবই ঝামেলার। কিন্তু কিছু বলতেও পারল না ফাদারের সামনে। ফাদার তো বোঝেন না, শিল্প সৃষ্টি তখনই সম্ভব যদি শিল্পীকে নিজের ভেতর নিমগ্ন থাকতে দেওয়া যায়। এখন টেলিফোন করতে যাওয়া মানে তার মনের যে-সব তারে সুর বেঁধে রেখেছে এ ক'দিন ধরে, সেগুলো ছিন্ন করে আনা।

কিন্তু উপায় তো নেই, যেতেই হবে।

ক্ষুণ্ণ মনে যে মুহূর্তে সমুদ্রনীল গ্রিনরুম থেকে বেরুতে যাচ্ছে, হঠাৎই কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে গুঞ্জন ও দ্রুত পুলিশি তৎপরতা। একটু পরেই 'এসেছে এসেছে' রব উঠতেই গার্গীরা সবাই চমকে তাকাল গেটের দিকে। একটা দামি সাদা কনটেসা ঢুকছে তুলিকাদের তুঁতরঙা মারুতির পেছনে, চারপাশে পুলিশি প্রহরা। কয়েকটি 'সবুজ' গেটের দুপাশে দাঁড়িয়েছিল গোলাপ হাতে, তারা একযোগে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানাল শ্রীরাধাকে। পুলিশ ইনস্পেক্টর অরিজিৎ বসু বহুক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছিলেন গেটের আশে পাশে। তাঁদের দুই বড় কর্তা মঞ্চে আসীন, ওদিকে মুম্বইয়ের নামী অভিনেত্রী আসছেন, দুয়ে মিলিয়ে পুলিশ ইনস্পেক্টরের আজ খুব চাপ। তার ওপর এখানে এসেই আজ শুনেছেন, 'আশ্রয়', এরই একটি কিশোরী নিখোঁজ হয়ে গেছে নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে। কিন্তু তা নিয়ে আপাতত তাঁর ভাবার সময় নেই। আগে ভি. আই. পি না সামলালে চাকরিটি নট।

শ্রীরাধার আগমনে 'আশ্রয়'-এর সবুজেরা তো বটেই, মান্যগণ্য অতিথিরা পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন হঠাৎ। গার্গী খুবই নিরাসক্ত থাকার চেষ্টা করল, তবু সিনেমার পর্দার নায়িকাকে হঠাৎ চর্মচক্ষে দেখার একটা গাঢ় উত্তেজনা বোধহয় নিজের অজান্তেই চারিয়ে যায় ভেতরে। বিশেষ করে যে-নায়িকার খ্যাতি ভারত জোড়া। যার ছবি প্রায়শ কলকাতার নানান ভিড়াক্রান্ত মোড়ের হোর্ডিঙে অনবরত বিদ্ধ করে চোখ। যাদের নামে নানাবিধ গুঞ্জন প্রতিনিয়ত ভেসে বেড়ায় সারা দেশের ফিল্মোৎসাহী মানুষদের মনে।

দুধসাদা কনটেসাটা এসে দাঁড়াল একেবারে মঞ্চের ধার ঘেঁষে। ফাদার দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির ঠিক পাশেই। শ্রীরাধাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সঙ্গে করে উঠে এলেন মঞ্চের ওপর তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত মঞ্চ আরও আলোয় ভরে উঠল। গার্গীরও মনে হল, পর্দার নায়িকার চেয়ে বাস্তবের নায়িকার সৌন্দর্য, বিভা যেন আরও অনেক বেশি। হয়তো চড়া প্রসাধন করার ফলেই এমন।

প্রাথমিক সম্মোহন কাটিয়ে গার্গী তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার হাতের কাগজটি নিয়ে যাতে পর পর সাজিয়ে নিয়েছে আজকের অনুষ্ঠানসূচি। সেইভাবেই আজকের দিনটি সম্পর্কে ছোট্ট একটা ভূমিকা করে মেয়রের নাম ঘোষণা করল সভাপতি হিসেবে। তারপর অভিনেত্রী শ্রীরাধাকে প্রধান অতিথি।

এক-একটি নাম ঘোষণা করছে, আর 'আশ্রয়'-এর সবুজেরা পুষ্পস্তবক দিয়ে ভূষিত করছে তাঁদের। শ্রীরাধার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিল অতসী নামের একটি কিশোরী। তার মুখ তখন ঝলমল করছে এক আশ্চর্য শিহরনে। গার্গী সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছে অপলক, সে সময় গ্রিনরুমে ফোঁপানির শব্দ শুনে একবার চোখ ঘোরাল। নিবেদিতা কাঁদছে ওভাবে। বোধহয় তার মনে পড়ে যাচ্ছে আজ সকালেই চৈতালির মুখ এর চেয়েও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল শ্রীরাধার হাতে সে-ই পুষ্পস্তবক তুলে দেবে ভেবে। গার্গীও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একসময় সেও এই প্রতিষ্ঠানের সুখ দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল। এখন এদের সঙ্গে তার দূরত্ব অনেকখানি। বহুকাল পর নিবেদিতার টেলিফোন পেয়ে এখানে না এলে হয়তো জানাই হত না চৈতালির নিখোঁজ সংবাদ। কিন্তু জেনে যখন ফেলেছে, দুঃসংবাদের ছোট্ট পোকাটা তার মাথার ভেতরে কুরে কুরে সেঁধুচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু সে ভাবনা আপাতত নয়। মঞ্চে তখন একটার পর একটা অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে গার্গীর ঘোষণা অনুযায়ী। কিছু বক্তৃতা ইত্যাদি হওয়ার পর 'চণ্ডালিকা'। মঞ্চের পর্দা কিছুক্ষণ

ঢাকা থাকার পর যখন আবার উঠল, নিবেদিতার একমাস ধরে রিহার্স্যালের ঢেউ মুহুর্মুহু হাততালিতে ভরিয়ে দিতে লাগল দর্শকদের।

কখনও গ্রিনরুমে, কখনও মঞ্চে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা যন্ত্রের মতো নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে কুশীলবদের। একদিকে রাই আর রিয়ার অভিনয়, অন্যদিকে প্রহ্লাদ নামের কিশোরটির আনন্দের ভূমিকায় গান 'জল দাও আমায় জল দাও..', কিংবা 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা...' ভারী স্পর্শ করল সবাইকে। দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে গার্গী এও অনুভব করতে পারছিল, চৈতালি নিখোঁজের যে-শোক 'আশ্রয়'-এর সবাইকে মুহ্যমান করে রেখেছে, তার ছায়া কুশীলবদের নাচে-গানে সূক্ষ্মভাবে ছুঁয়ে আছে বলেই চণ্ডালিকার মূল সুর আরও মূর্ত হয়ে উঠছিল ওদের অভিনয়ে। তা ছাড়া কুশীলবরা সবাই হয় দীন নয় তো অনাথ। তাদের ভেতরকার কষ্টটাও যেন এই নৃত্যনাট্যের প্রতীকী উপস্থাপন।

সমুদ্রনীল আর সুছন্দা তো ভালই গায়, সেই সঙ্গে তিয়াসা-বিশাখারাও দিব্যি উতরে দিল আজ। মেয়র তো বারবার বলতে লাগলেন, সত্যি, ভাবা যায় না, এইসব ছেলেমেয়েদের কী চমৎকারভাবে শেখানো হয়েছে।

ফাদার তখন মাথা পেতে শুধু প্রশংসা কুড়োতে ব্যস্ত, অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় বললেন, এত সব কর্মকাণ্ডে আমার কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। আমাদের তত্ত্বাধায়ক আর সবুজদের কৃতিত্বই বেশি করে বলতে হবে।

শ্রীরাধা বিশেষ করে খুশি হয়েছেন 'চণ্ডালিকা' দেখে। অভিনয়ের সময় তাঁর পাশে বসে ফাদার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গল্পটা। তাতেই আরও মুগ্ধ শ্রীরাধা।

অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা। অতিথিদের বিদায় জানাতে আরও মিনিট চল্লিশ। গার্গী এতকাল পরে 'আশ্রয়'-এর এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে খুবই রোমাঞ্চিত। তিন-চার বছর আগে তার জীবনে একটা প্রবল এলো ঝড় না উঠলে সেও হয়তো এই সবুজ ছেলেমেয়েগুলোকে হাত ধরে আলোর নিশানার দিকে হেঁটে যেত এখনও।

রাতে সবাইকে বিদায় জানানোর আগে ডঃ বটব্যাল এতক্ষণের হাসি-আঁটা মুখ থেকে হাসিটা খুলে ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন পুলিশ কমিশনার ফোন করেছিলেন বিকেলে। কাল থেকেই জোরদার ইনভেস্টিগেশন শুরু হচ্ছে চৈতালিকে খুঁজে বার করতে। তাঁর ধারণা ওকে পাওয়া যাবেই। কিন্তু চৈতালি সম্পর্কে যাবতীয় হালহদিশ নিতে একটা স্পেশ্যাল টিম কাল আসছে 'আশ্রয়'-এ। কাল বিকেল চারটেয়। সবাই উপস্থিত থাকবে যার-যার ঘরে। নিবেদিতা, নির্মাল্য---তোমরাও থাকবে।

## ॥ ৩ ॥

কাল সারাটা দিন মেঘ-মেঘ ছিল, হাওয়াও স্যাঁতসেঁতে, আজ কিন্তু সকাল থেকেই চামড়া-ভাজা রোদ। সায়নের ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে করতে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল গার্গী। সায়নের পেটে সামান্য চর্বি জমে যাচ্ছে বলে টোস্টে মাখনের পরিবর্তে মার্জারিন। ডাইনিং টেবিলে প্লেটে টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা সাজাতে সাজাতে গার্গী বলল,

জানো এতকাল পরে আমার পুরনো কর্মস্থলে গেলাম—সেই যে সোসিওইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি, গিয়ে মনেই হচ্ছিল না ওখানকার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

বেসিনের সামনে ঝুঁকে, ওপরে সাঁটা অর্ধবৃত্তাকার আয়নাটায় মুখ গলিয়ে শেভ করছিল সায়ন। ছোট্ট উত্তর ছুড়ে বলল, তাই?

—ফাদার পর্যন্ত এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন আমি এখনও ওখানেই কাজ করি।

—হুঁ, তা বেশ তো।

—এত হইচই করে কখনও জন্মদিন পালন করা হয়নি ওদের প্রতিষ্ঠানের। অনুষ্ঠানটা জমজমাট করতে কত ব্যবস্থা করেছিলেন ফাদার! কত্ত ইনভাইটি! অথচ একটা মেয়ে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে গেল বলে পুরো অনুষ্ঠানটার তাল কেটে গেল।

—ও, ততক্ষণে স্যাটাস্যাট কয়েকটা মাত্র পোঁচে সায়নের শেভ করা শেষ। রঙিন তোয়ালেটা আলনা থেকে টেনে প্রায় হাফদৌড়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। যেন আর একটু দেরি হলেই ফেল হয়ে যাবে ফ্লাইট।

আজকাল রবিবার বলে কোনও লাল অক্ষরের দিন সায়নের অভিধানে থাকছে না। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিস আজ বন্ধ। ফ্যাক্টরিও। তবু তার চেয়ারম্যান সায়ন চৌধুরির ঘরে বসে বিশ্রাম করার ফুরসত নেই। হয়তো মার্কেটিঙের কিংবা প্রোডাকশনের কোনও এক-দুজন অফিসারকে আগের দিন বলে এল চলে আসতে ফ্যাক্টরিতে। তাদের ছুটিরও বারোটা। সায়নেরও। নির্জন নিরিবিলি রবিবারে সারা দিন দু-তিনজনে বসে গত সপ্তাহের কাজকর্মের পোস্টমর্টেম, সেই সঙ্গে আগামী সপ্তাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছক—এই নিয়েই বুঁদ হয়ে আছে গত কয়েক মাস। 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস' এখন সায়নের কাছে একটা নেশার মতো। রাতে বিছানায় ঘুমিয়েও হয়তো কোনও নতুন প্রোডাক্টের গবেষণা করে ফুরিয়ে ফেলে ছ'ঘণ্টার তিনশো ষাট মিনিট।

প্রায় ঝড়বৎ স্নান ব্রেকফাস্ট সেরে সায়ন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গীর সামনে অখণ্ড রবিবার। ছুটির দিনে একা থাকাটা তার কাছে এখন অব্যেসের মতো। পত্রপত্রিকার পাতা উল্টে, বই পড়ে, দু-একটা টেলিফোন করে, কখনও সায়নের কেজো ফোন রিসিভ করে অতিক্রম করতে থাকে অনেক অনেক অলস মুহূর্ত। অফিসের ভাবনাও জুড়ে থাকে তার মস্তিষ্ক।

আসলে ক'বছর আগে সায়নের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সায়নের জীবনের চরমতম দুর্ঘটনার দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, সায়নকে বিয়ে করা, অতঃপর সায়নের তিল তিল করে নিজের হাতে গড়া সাবান কোম্পানি 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেয়ারে বসা—এ সবই এখন গার্গীর কাছে এক আশ্চর্য ইতিহাস। তবু এখানকার শত লক্ষ কাজের ফাঁকে কখনও ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার অনুসন্ধিৎসু মন। যেমন সদ্য ঘুরে আসা 'আশ্রয়'-এ ঢুঁ দিতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে, শুধুমাত্র চৈতালির কথা ভেবেই। কাল বিকেলের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, যা হতে পারত, 'আশ্রয়'-এর চার বছরের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা, তা মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্নই। একটা দুর্ঘটনা—তবু তা নিয়ে গোটা প্রতিষ্ঠান এখন তোলপাড়।

আজ বিকেলে পুলিশের একটি তদন্তকারী দল আসবে সেই ভাবনাটা কেন যেন সকাল থেকে উসকোচ্ছিল গার্গীকে। সে এখন রিসার্চ অ্যাকাডেমির কেউ নয়। তবু কালকের কয়েকটি ঘণ্টা, কিছু আলো-জমজমে মুহূর্ত সহসা তাকে অনেকখানি কাছে নিয়ে গিয়েছে 'আশ্রয়'-এর। সকালে উঠেই মনে হয়েছিল তার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। বেচারি

নিবেদিতার কথা ভুলতেই পারছে না। নিবেদিতার সঙ্গে তার একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল সে সময়। দুজনে শুধু এক ঘরে ছিল বলেই নয়, দুজনের মধ্যে একটা মান-অভিমানের পালা চলত প্রায়ই। কারণটা খুবই অদ্ভুত।

গার্গী সবসময়েই স্রোতের বিরুদ্ধে চলা মেয়ে। ক্রিম-পাউডার ইত্যাদি মেখে কখনও প্রসাধন করে না। কোনও রকম সাজগোজ করাতেই তার অনীহা। শাড়ি ব্লাউজের ব্যাপারেও উদাসীন। হালকা রঙের তাঁতের শাড়িই তার পছন্দের। কপালে একটা টিপ পর্যন্ত পরে না। এহেন গার্গীকে নিবেদিতার ইচ্ছে হত সাজগোজ করিয়ে ফিটফাট করে তুলতে, 'অ্যাই গার্গী, আমার এই তুঁতে রঙের সাউথ ইণ্ডিয়ানটা পরে আজ বিকেলে ঘুরতে বেরুবি' কিংবা, 'দেখি, তোকে এই টিপটা পরিয়ে দিই। টিপ পরলে তোকে যা সুন্দর লাগবে না!' গার্গী মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিত তার যাবতীয় সাজের প্রস্তাব, ধুর, আমি কালো, দেখতে খারাপ, আমি আবার কী সাজব?

—তুই কালো কোথায়! উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে পারিস। কিন্তু তোর চোখদুটো কী সুন্দর! একটা চুম্বক বসানো আছে যেন তোর চাউনিতে। আমিই বা এমন কী ফর্সা! নে, এই শাড়িটা পর আজ।

—কক্ষনও না, আমার এই বিস্কুট রঙের তাঁতের শাড়িটাই পরব। আমি অন্যের শাড়ি পরি না।

—ইমপসিব্‌ল। ওটা পরলে তোকে বাইশ বছরের জায়গায় বিয়াল্লিশ-বিয়াল্লিশ মনে হয়।

—হোক, যারা রূপসী নয়, তাদের সাজগোজ মানায় না।

নিবেদিতা তখনও জোর করত, সাজলেই তো রূপসী দেখাবে তোকে। নে—

কিছুক্ষণ জোরাজুরি, তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত গার্গী। অতঃপর নিবেদিতার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। সবচেয়ে ঝামেলা হত ঘরের চাবি নিয়ে। দুজনে একই ঘরে থাকে, একটাই চাবি, সেই চাবি আর গার্গী কিছুতেই রাখবে না। নিবেদিতার আবার চাবি হারিয়ে ফেলার স্বভাব। সে ম্লানমুখে চাবি নিয়ে ঘুরঘুর করত গার্গীর কাছাকাছি। যতক্ষণ নিবেদিতার হাতে চাবি থাকত, অন্য সহকর্মীরা বুঝে যেত, নিবেদিতা-গার্গীর মান-অভিমানের এপিসোড শেষ হয়নি। দু-তিনদিন পরেই অবশ্য আবার ভাব হয়ে যেত দুজনের।

সেই নিবেদিতার সঙ্গে দু-চারবার টেলিকথাবার্তা ছাড়া এতদিন কোনও যোগ-শিকড়ই ছিল না। গার্গী তার নতুন জীবনযাপন আর হাজারো কেজো ব্যস্ততায় এতটাই নিমগ্ন ছিল যে, রিসার্চ-অ্যাকাডেমির বৃত্তান্ত ফিকে হয়ে এসেছিল তার মনে। কাল এতদিন পর নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হতে যে-উচ্ছ্বাস, উল্লাস আর স্বতঃস্ফূর্ততার হাউই হয়ে ওঠার কথা ছিল, তা হতে পারল না ঘটনার অনিবার্যতায়। হঠাৎ নিবেদিতাই বা কেন সন্দেহের চাঁদমারি হল তা বোঝা গার্গীর পক্ষে এই মুহূর্তে অসম্ভব। ঘটনার আদ্যোপান্ত জানতে ও বুঝতে একটা অবধারিত কৌতূহলও উসিয়ে উঠছে তার ভেতর। নিবেদিতার মনে তার তো অনেককাল টুঁ মারা হয়নি, এর মধ্যে 'আশ্রয়'-এর ছাদের ওপর দিয়ে অনেক কাকচিল উড়ে গেছে। সেসব গার্গী জানে না। কিন্তু কেন কে জানে তার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় জানতে ইচ্ছে হল প্রবল।

এত সব ভাবনায় গেরো, তস্য গেরো দিতে দিতে পার হল দীর্ঘ রোদ-দগ্ধ দুপুর। আজ সূর্যের তাপ বড় চড়চড়ে। সায়ন দুপুরে ফ্যাক্টরিতেই খেয়ে নেয় আজকাল। ফলে বাড়িতে রান্নার পাট প্রায় রাখেই না গার্গী। রাঁধতে ইচ্ছে করল না আজও। সকালে যা দু-এক পিস টোস্ট খায়, তারপর বিনা খাওয়ায় কাটিয়ে দিচ্ছে প্রায়শ। তাতে তার খুব একটা অসুবিধে হয়

তা নয়। কেবল বিকেলের দিকে অনুভব করে সামান্য ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। সায়ন অবশ্য সেসব খেয়াল করে না। সে নিমগ্ন থাকে তার নিজস্ব ভাবনার পৃথিবীতে।

আজও সেভাবেই লাঞ্চবিহীন একসময় বেরিয়ে পড়ল 'আশ্রয়'-এর উদ্দেশে। তাদের শরৎ বসু রোডের বাড়ি থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দূরত্ব খুব একটা বেশি তা নয়। পাছে তার পুরনো সহকর্মীরা কিছু ভাবে তাই গাড়ি না নিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল গার্গী। চাকুরিসূত্রে পাওয়া গাড়ির কল্যাণে তাকে আজকাল বাসে চড়তে হয় খুবই কম। তবু বাসে ওঠাটা অভ্যাস রেখেছে ইচ্ছে করেই। খারাপও লাগে না তার। রবিবার দিনটা কলকাতার জীবনে একটা কারণেই স্মরণযোগ্য যে, রাস্তায় সাধারণত কোনও জ্যামজমাট নেই। বাসে উঠে ঘেমে স্নান করা নেই। তবু রোদের তাপও কি কম।

সেই তাপে ভাজা-পোড়া হয়ে একসময় বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছয় 'আশ্রয়'-এর সামনে। আজ গেটে বিষেন সিং নামের বিহারী দারোয়ানটি একটু বেশিই তৎপর। নিশ্চয়ই কালকের ঘটনার পর এই দায়বদ্ধতা। গার্গীকে অবশ্য সে ভালই চেনে। উপরন্তু কালকের অনুষ্ঠানে তার ঘোষিকার ভূমিকার কথা স্মরণ করে একটু বেশিই খাতির করল আজ।

গেট থেকে ঢুকে ছ'ফুট চওড়া পিচ রাস্তা বরাবর সোজা যে-পুরনো ধাঁচের বাহারি অট্টালিকাটি দেখা যায়, তারই নীচের তলার পাঁচটি ঘরে 'আশ্রয়'-এর অফিস। ওপরের ঘরগুলির দুটিতে থাকেন দুই ডেপুটি ডিরেক্টর বা আঙ্কেল—বণধীর তরফদার ও চম্পক চট্টরাজ। বাকি তিনটি ঘরের একটিতে নির্মাল্য-সমুদ্রনীল, দ্বিতীয়টিতে বিশাখা-নিবেদিতা, তৃতীয়টিতে তুলিকা-তিয়াসা। বাকি তিন তত্ত্বাবধায়ক যার-যার বাড়ি থেকে যাতায়াত করে। প্রয়োজনে কখনও থাকেও ওদের ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে।

বাহারি অট্টালিকাটির বাঁয়ে নতুন গড়ে ওঠা স্কুলবাড়িটির নীচের তলায় স্কুল, ওপরে সবুজদের হোস্টেল। আজ রবিবার, বিকেলে হইচইতে গমগম করার কথা লম্বাটে ধাঁচের স্কুলবাড়িটি। কিন্তু কী আশ্চর্য, গোটা কম্পাউণ্ড নীরব, স্তব্ধ, খাঁ খাঁ। বিষেন সিং জানাল, ফাদার হুকুম করিয়েছেন। কোই বাচ্চালোগ আজ আনন্দ কোরবে না।

পিচরাস্তা ধরে এগুতে এগুতে গার্গী তাকাল ডাইনে ফাদারের বাংলোটির দিকে। ফাদার রাতে একা থাকেন ওখানে। অবশ্য শুধু রাতটুকুই। দিনের বেশির ভাগটাই কাটান অফিস চেম্বারে। সারাক্ষণ তাঁর টাক-পরিবৃত মাথায় ঘুরঘুর করতে থাকে লক্ষকোটি পরিকল্পনা।

পিচরাস্তাটা পেরে হয়ে অফিসঘরের সামনে পৌঁছে ফাদারের চেম্বারে একপলক তেরচা নজর ফেলল গার্গী। ফাদার তাঁর চেয়ারে বসে, গম্ভীর, চিন্তান্বিত। দুই আঙ্কেলের সঙ্গে কিছু যেন আলোচনা করছেন নিচু গলায়। এই মুহূর্তে তাদের আলোচনার ছেদ না ঘটিয়ে গার্গী সিঁড়ি পেরিয়ে সোজা চলে এল ওপরে। প্রথমেই একটা বড় বারান্দা, সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খুবই দুশ্চিন্তিত স্বরে আলোচনা করছে সুছন্দা, বিশাখা, অরণি আর সমুদ্রনীল। রবিবারে যাদের 'আশ্রয়'-এ উপস্থিত থাকার কথা নয়, তারাও আছে সম্ভবত ওই একটাই কারণে। সবাই অপেক্ষা করছে পুলিশের স্পেশ্যাল টিমের। এহেন অসময়ে গার্গীকে দেখে সমুদ্রনীল অবাক হয়ে বলল, আরে, আজও তুমি!

গার্গী জানত তাকে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে তার আকস্মিক আগমনের। হেসে বলল, কাল অত ভিড়ে কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারিনি। ভাবলাম আজ ছুটির দিনে সবার সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে। পুরনো দিনগুলো যদি আর একবার ঝালিয়ে তোলা যায়।

গার্গীর উত্তর শুনে বিশাখা চোখের ভঙ্গি করে বলল, ভাল দিনেই এসেছিস। পুলিশের ভয়ে আমরা এখন সবাই অস্থির।

—কেন, অস্থির কেন?

অরণি বলল, অস্থির হব না। পুলিশ এসে কাকে কী জিজ্ঞাসা করবে কে জানে। পুলিশে ছুঁলে তো ছত্রিশ ঘা।

গার্গী অবহেলায় বলল, পুলিশ তো আসতেই পারে। পুলিশের কাজ তদন্ত করা। তার জন্যে কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। যে যা জানে তা বলে দিলেই হল।

বারান্দার অন্য কোণে তুলিকা আর তিয়াসা রেলিঙে ভর দিয়ে নিচু স্বরে কথা বলছিল তা গার্গীর নজর এড়ায়নি। গার্গীকে দেখে তাদের কথা একলহমা থামিয়ে আবার শুরু করল ফিসফাস। এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে নিবেদিতাকে খুঁজছিল গার্গী, না দেখে আবার বলল, তোরা কি পুলিশের ভয়ে সব সিঁটিয়ে আছিস? সিঁটিয়ে থাকবে তো আসামিরা।

বিশাখা রে রে করে উঠে বলল, আমরা কেন সিঁটিয়ে থাকব? যারা থাকবার তারা ঘরের কোণে সিঁটিয়ে আছে।

গার্গী অবাক হল, কারা?

সুছন্দা এখানে নতুন। তার সঙ্গে কালই আলাপ হয়েছে গার্গীর। ছোট্টখাট্ট চেহারা, দেখতে মিষ্টি, গলাটাও সুরেলা, বলল, নিবেদিতা আর নির্মাল্য।

গার্গী সামান্য চমকে ওঠে, কেন? সিঁটিয়ে থাকার কী আছে?

সমুদ্রনীল বলল, একটা নীল অ্যাম্বাসাডার ক'দিন ধরে আমাদের কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল, দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছিল তা অনেকের মতো নিবেদিতাও জানত। কাল সকালেও নাকি একবার দেখা গিয়েছিল গেটের সামনে। নির্মাল্যকে নাকি তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে কেউ-কেউ।

গার্গী আবার অবাক হয়, তাই নাকি?

বিশাখা আরও জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ। সেই অ্যাম্বাসাডারটা নিউমার্কেটে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়েও কেন তার কাছেই চৈতালিকে দাঁড় করিয়ে নিবেদিতা ট্যাক্সি ডাকতে গেল? এর মধ্যে একটা কনস্পিরেসির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

গার্গী থমকায় একটু, তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করে নেয় চারজোড়া চোখ, তা সেই নীল অ্যাম্বাসাডারটাই যে নিউমার্কেটে দাঁড়িয়ে ছিল তা নাও হতে পারে।

অরণি আস্তে আস্তে বলল, তরফদার আঙ্কেল বলছিলেন নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার সাধারণত, কমই দেখা যায় কলকাতায়। সেই কারণেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল নিবেদিতার।

গার্গী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, নিবেদিতা কোথায়?

বিশাখা ঠোঁট উল্টে বলল, ওই তো ওর ঘরে। এ-ঘরে দেবী ও-ঘরে দ্যাবা—

বিশাখার কথা বরাবরই একটু ট্যারাবাঁকা, ঠোঁট-কাটা ধরনের। অথচ আশ্চর্য, সে-ই এখন নিবেদিতার রুমমেট। গার্গী কিছুদিন এই ঘরটাতেই নিবেদিতার সঙ্গে কাটিয়েছে। তিন-চার মাস থাকার পর তাদের জুবিলি পার্কের ভাড়া বাড়ি থেকেই যাতায়াত করত তার মায়ের জোরাজুরিতে। সে চলে যাওয়ার পর তার সিটটিতে এখন বিশাখা।

নিবেদিতার দিকেই এখন সবারই সন্দেহের নজর ধাবিত দেখে গার্গী চিন্তিত হয়। বিশাখার শেষ কথাটি অবশ্য তার বোধগম্য হয় না। এ-ঘরে দেবী আর ও-ঘরে দ্যাবা বলতে বিশাখা ঠিক কী ইঙ্গিত করছে। নির্মাল্য আর নিবেদিতার মধ্যে কোনও সম্পর্কের কথা বলতে চাইছে ও।

কিন্তু নিবেদিতা তো—

অন্যমনস্ক গার্গী চিন্তার কাটাকুটিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঘরটিতে যেখানে নিবেদিতা পাথরের মতো শুয়ে আছে বিছানায়। বরাবরই অগোছালো ছিল ও, এখনও সেরকম। পাশের অন্য খাটটির চেহারা তুলনায় ফিটফাট। ঘরটায় ঢুকতে তিন-চারবছর আগের সুখ-দুঃখে তালপাকানো একঝাঁপি স্মৃতি ছুঁয়ে গেল গার্গীর মগজ। কয়েকটা মাস এখানে দিব্যি ছিল সে। স্কুল-কলেজে তার হোস্টেলে থাকার প্রশ্নই ছিল না। হোস্টেল জীবন কীরকম জানাও ছিল না তার। এখানে কয়েকটা মাস কাটানোয় সেই জীবনটার একটা আলতো স্বাদ জমা হয়েছিল তার ভাঁড়ারে। ছাত্রী হিসেবে নয়, শিক্ষিকা হিসেবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তার পরিচিতি ছিল 'অঙ্কের দিদি'।

তাকে দেখে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করল নিবেদিতা। গার্গীই বারণ করল তাকে, কী দরকার ওঠার?

নিবেদিতার চোখমুখ ফোলা। চোখে শুকনো অশ্রুর দাগ। কাল থেকে ধারাবাহিক কান্নাকাটির ফলে তার গলার স্বরটাও এখন স্তিমিত, ফ্যাঁসফেসে। শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, পুলিশ কি অ্যারেস্ট করবে আমাকে?

নিমেষে গার্গী বুঝে ফেলল, চৈতালিকে হারিয়ে একেই তো নিবেদিতা চুরমার হয়ে আছে শোকে, তার ওপর পুলিশের আতঙ্ক এখন আরও মিইয়ে রেখেছে তাকে। গার্গী বুঝতে পারছে না ঠিক কীভাবে ঘটনাটা বিবৃত করা হয়েছে পুলিশকে। পুলিশই বা কীভাবে গ্রহণ করেছে চৈতালি-নিখোঁজের সংবাদ। তারা কীভাবেই বা এগুবে তদন্তের কাজে। তবু সান্ত্বনা দিতে বলল, অ্যারেস্ট কেন করবে। প্রথমে ইন্টারোগেট করবে। বুঝতে চাইবে চৈতালিকে কে বা কারা এসে নিয়ে গেছে।

নিবেদিতা গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। হয়তো অনুমান করতে চাইল পুলিশ তাকে কী ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। কী হতে পারে সেই প্রশ্নোত্তর পর্বের পরিণাম। তারপর কাল যেরকম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, সেরকমই কেঁদে উঠে বলল, বিশ্বাস কর। আমিও কোনও কিছুই জানিনে। নিউমার্কেটে তো কত-কত মেয়েরা যায়, কেনাকাটি করে। ওরকম ব্যস্ত জায়গা, সেখান থেকে চৈতালিকে কেউ নিয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি আমি।

—ঠিক আছে, এখনই অত ভেঙে পড়িস না। আমি তো তোর জন্যেই এলাম। তুই যাতে কোনও বিপদে না পড়িস।

নিবেদিতার এতক্ষণে একটু সাহস হয়। কাল থেকে গোটা প্রতিষ্ঠানের তর্জনী ক্রমাগত তার দিকেই উদ্যত জেনে লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে নীল হয়ে আছে। গার্গী যখন তার রুমমেট ছিল, দুজনে রাতে পাশাপাশি শুয়ে গল্পের পর গল্পের ঝুড়ি মেলে ভোর করে ফেলেছে কত সময়। বিশাখা তার বিপরীত মেরুর মেয়ে। শুধু নিজেরটা বোঝে। নিবেদিতার সঙ্গে কোনও দিনই খাপ খায় না তার। রাতে শুয়ে গল্প করা দূরে থাকুক, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। নাকও ডাকায় কখনও কখনও, সে-শব্দে ঘুমই আসে না নিবেদিতার চোখে।

গার্গীর কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিবেদিতা এবার বলে ফেলল, জানিস ওরা নির্মাল্যকেও জড়িয়ে দিতে চাইছে এই ঘটনার সঙ্গে। অথচ নির্মাল্য তো বিন্দুবিসর্গও জানে না এ-ব্যাপারে।

গার্গীর ভুরুতে ঘনিয়ে আসছিল একচিলতে কোঁচ, কোনওক্রমে সামলে বলল, কেন?

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে! হয়তো ও আমার সঙ্গে একা গল্প করে কিংবা আমি ওকে কোনও দরকারের কথা বলি, সেটাই ওর অপরাধ। আসলে বিশাখা জেলাস বলেই—।

এই সামান্য কয়েকটা কথার মধ্যেই গার্গী বুঝে নিতে চাইল নিবেদিতার সঙ্গে নির্মাল্যর সম্পর্কটা। রুমমেট ছিল বলেই নিবেদিতার একান্ত জীবন সম্পর্কে কিছুটা চেনা জানা ছিল তার। এখানকার অনেকেই তার জীবনকাহিনী জানে। তবে গার্গী হয়তো একটু বেশিই জানে। বিয়ের মাত্র দুবছরের মাথায় নিবেদিতার স্বামী তাকে ডিভোর্স করেছিল কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই। নিবেদিতার কোলে তখন ছ'মাসের পুত্রসন্তান। বাপের বাড়িতে ফিরে এসে কী করবে তার বাকি জীবন ভেবে যখন বিপন্ন, সে সময় কোনও ভাবে ডঃ বটব্যালের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। তারপরেই এখানে চাকরিটা পেয়েছিল। কিন্তু ডঃ বটব্যালের শর্ত ছিল, এখানে থাকতে হবে আবাসিক হিসেবে, সঙ্গে বাচ্চাকে সঙ্গে রাখা চলবে না। বাচ্চাকে দেখার জন্য শুধু রবিবারকেই বরাদ্দ রাখতে হবে। খুবই কঠিন শর্ত। তবুও মায়ের কাছে সেই ছোট্ট বাচ্চা রেখে নিবেদিতা এখানে শুরু করেছিল তার নতুন জীবন। কিন্তু একা থাকতে থাকতেই কি নির্মাল্যর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিবেদিতার?

গার্গী একটু আগেই সমুদ্রনীলের কাছে যে-তথ্য সংগ্রহ করে এসেছে, সেইটেই এবার বাজিয়ে নিতে চাইল নিবেদিতার কাছে, একটা নীল অ্যাম্বাসাডারকে কি সত্যিই কম্পাউণ্ডের কাছে দেখা যাচ্ছিল ক'দিন ধরে!

নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করে, আমি কোনও দিন শুনিনি। এখন ওরা বলছে নির্মাল্যকে নাকি গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে দেখছে। আমি নির্মাল্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। নির্মাল্য বলল, হ্যাঁ কথা বলেছে। গাড়িটা কেন হঠাৎ গেটের সামনে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে তা জানতে কৌতূহল হয়েছিল বলেই সেদিন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিল এখানে তার কোনও দরকার আছে কি না। তাতে ড্রাইভার কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

গার্গী ঘটনাটা একবার মগজে পাক খাইয়ে বলল, তা নির্মাল্য সেই কথাটা বলে দিলেই তো আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

—নির্মাল্য সবাইকে সেই কথাই বলেছে, কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। আসলে ওরা সবাই মিলে আমাকে আর নির্মাল্যকে স্কেপগোট করতে চাইছে। সেই কারণেই—

—কেন! স্কেপগোট করতে চাইছে কেন?

নিবেদিতা পাগলের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, আমি জানি না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল ওরা আমাকে একদম সহ্য করতে পারছে না। হয়তো এখান থেকে ছুটি করে দিতে চায়। হয়তো—

নিবেদিতার কথা শেষ করার আগেই নীচে কম্পাউণ্ড কাঁপিয়ে একটি গা-হিম-করা গর্জন তুলে এসে দাঁড়াল পুলিশের জিপ। তারও মিনিট পনেরো পরে পঞ্চানন নামের একজন মাঝবয়সী বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে উঁকি দিল নিবেদিতার ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দিদিমণি, ফাদার একবার আপনারে ডাকতিছেন। মেলা পুলিশ এসেছে—

## ॥ ৪ ॥

নিউমার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের একটা অরফ্যান মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে, এরকম একটা পাতি কেসের তদন্তে আসতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না

পুলিশ ইনস্পেকটর দেবাদ্রি স্যান্যালের। তাঁর এখন যা সিনিযরিটি, তাতে কোনও জটিল মার্ডার কেস, অথবা লক্ষ লক্ষ টাকার ফ্রড—এরকম বড়সড় ব্যাপার না হলে মনঃস্থাপন করতে পারেন না ঘটনার আবর্তে। কিন্তু খোদ পুলিশ কমিশনার নাকি ডি.আই.জি. সাহেবকে বলেছেন, এটা ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যালের অরফ্যান-হাউসেব কেস, কোনও সিনিয়র অফিসারকেই যেতে হবে। অগত্যা আসার সময় সঙ্গে নিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অলয় বসুরায়কে।

গত আড়াই বছর লালবাজারে এই বিশেষ দপ্তরটিতে চাকরি করার অভিজ্ঞতায় দেবাদ্রি জেনেছেন, ঘটনার গুরুত্ব নির্ভর করে তাঁর বস্ কী চাইছেন তার ওপর। তাঁর নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দামই নেই। একটা প্রমোশনের টোপ খুড়োর কলের মতো তাঁর সামনে ঝুলে আছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু তিনি এত-এত কেস তদন্ত করছেন, তদন্ত করে রোমহর্ষক সব রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ওপরওলাদের কাছে, কালপ্রিটরা শাস্তিও পাচ্ছে কোনও কোনও কেসে, কিন্তু প্রমোশন নামক শিকেটি কিছুতেই আর ছিঁড়ছে না তাঁর বরাতে।

একেই বোধহয় বলে ফুটো বরাত।

বিশাল কম্পাউণ্ডের ভেতর জিপে গর্জন তুলে হু হু করে ঢুকতে ঢুকতে দেবাদ্রি অবাক হয়ে দেখছিলেন ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যাল নামের মানুষটির অরফ্যান হাউসের চেহারা। কাল সন্ধেয় একটা বড় ফাংশন হয়ে গেছে লনের এক কোণে, তাব মঞ্চের অবশিষ্ট এখনও দৃশ্যমান। মুম্বই থেকে শ্রীরাধা নামের বিখ্যাত অভিনেত্রী এসে হইচই বাধিয়ে দিয়ে গেছেন সে-খবরও পৌঁছেছে দেবাদ্রির কানে। আজ অবশ্য সমস্ত কম্পাউণ্ড নিঃশব্দ। হয়তো কাল সকালে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলে। হয়তো আজ বিকালে স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম আসবে বলে।

বিশাল অফিস বাড়িটির সিঁড়ির কাছে জিপ থেকে নেমে দেবাদ্রি একবার চোখ চালিয়ে দেখলেন কম্পাউণ্ডের ভেতর কোনদিকে অরফ্যান স্কুল, কোথায়ই বা ডঃ বটব্যালের বাংলো বাড়ি। ছাদের চারপাশে লাল টালির কারুকাজ-করা ডলস হাউসের মতো ছোট্ট বাংলোটা দেখে চমৎকৃত হলেন। মনে মনে তারিফ করলেন ফাদারের রুচির।

রুচির ছাপ অবশ্য এ-চত্বরের সর্বত্র। লনের সবুজ মিহি ঘাস, দোতলা অফিস বাড়িটির আভিজাত্যময় গঠন, ছিমছাম স্কুল বাড়ির চেহারা, এমনকী ঢোকার মুখে গেটের ওপর যে আর্চটি আছে, তার ওপর একটি ছোট্ট শিশুর ব্রোঞ্জমূর্তি। বাহারি লতাপাতার আড়ালে সেটা অবশ্য চট করে নজরে পড়ে না কারও, কিন্তু দেবাদ্রির শাণিত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে ঠিকই।

অফিস ঘরের ভেতর ডঃ বটব্যাল বসে আছেন তাঁর আরও দুই সহকারীর সঙ্গে। দেবাদ্রিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ উষ্ণ করমর্দনের পর বললেন, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি, মিঃ সান্যাল। একটু আগেই সি.পি. ফোন করে জানালেন সান্যাল ইজ ওয়ান অফ আওয়ার সিনিয়রমোস্ট ইনস্পেক্টরস। আপনার সমস্যা উনি সমাধান করে দেবেন আশা করছি।

সিনিয়রমোস্ট শব্দটা শুনে দেবাদ্রি আত্মতৃপ্ত বোধ করলেন কিছুটা। যাক, পুলিশ কমিশনার সাহেব যে তাঁব চাকরির বয়সের কথা মাথায় রেখেছেন এটাই যথেষ্ট। এবার প্রমোশনের তালিকা তৈরি করার সময় নিশ্চয়ই তাঁর নামটাও বিবেচনার মধ্যে রাখবেন।

—হ্যাঁ, এবার বলুন ডঃ বটব্যাল, আপনার অরফ্যান হাউসের কী সমস্যা তৈরি হয়েছে কাল?

ফাদার সহসা আরও একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু কটমট করে তাকালেনও ইনস্পেক্টরটির লম্বা চওড়া চেহারা ও গোলগাল মুখখানার দিকে। বললেন, আমার এই

সংস্থার নাম 'আশ্রয়'। এটা একটা সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি। এখানে যারা থাকে, পড়াশুনো করে—তারা সবাই-ই অনাথ নয়। দুঃস্থ, দীনদরিদ্র ছেলেমেয়েদেরও পড়ার ও থাকার সুযোগ দেওয়া হয় এখানে। উই কল দেম প্রিন্স্। সবুজ। চিঠিপত্রে লেখালিখির সময় ওদের সম্পর্ক ডেস্টিটিউট শব্দটা কখনও ব্যবহার করি। কিন্তু অরফ্যান কখনও নয়।

দেবাদ্রি থতমত খেয়ে বললেন, ইজ ইট?

—অফ কোর্স। এখানে যারা থাকে তাদের কখনও বুঝতে দেওয়া হয় না যে তাদের কেউ নেই। এখানে তাদের বাবা-কাকা-দাদা-দিদি সবাই এমনভাবে আগলে রাখে যে, কারও ভাবার অবকাশ নেই তারা দীন দুঃস্থ কিংবা অনাথ। অরফ্যান-হাউস কথাটায় আমার খুবই আপত্তি আছে।

—স্যরি, ডঃ বটব্যাল। যে-ওপরঅলা আমাকে এই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছেন, তিনি অরফ্যান হাউস বলে উল্লেখ করাতেই আমিও সেই ভুলটা করেছি।

—ইন এনি কেস, আপনি এখন নিশ্চয়ই ইন্টারোগেট করা শুরু করবেন। তাই আমাদের কোনও সহকর্মী কিংবা ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই কথাটা যাতে উচ্চারণ না করেন সেই কারণেই আপনাকে সতর্ক করে দিলাম।

দেবাদ্রি সান্যালও একটু গম্ভীর হলেন, থ্যাঙ্কু, ডঃ বটব্যাল।

—আর আমি এখানে ডঃ বটব্যাল নই। ফাদার। 'আশ্রয়'-এ ব্যক্তিপরিচিতি একেবারেই গৌণ। এখানে আমরা যৌথভাবে একটা লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই। আপনারা হয়তো শুনে অবাক হবেন, কিন্তু আমরা চাই এই পৃথিবীতে যারা সোনার বা রুপোর, এমনকী তামার চামচও মুখে দিয়ে জন্মায়নি, তাদের জীবনটা আমরা এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই যাতে তারা জন্মসূত্রে শরীরে নীল রক্ত না পেলেও তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এমন হবে যা তাদের পরিচিত করাবে নীল রক্তের মানুষ হিসেবে।

কথাগুলো বলার সময় গম গম করছিল ফাদারের কণ্ঠস্বর। মাঝারি উচ্চতার গোলগাল ফাদারের সৌম্য মুখ যথেষ্ট উদ্দীপিতও দেখাল এ হেন মুহূর্তে। দেবাদ্রি তাঁর কথার সারমর্ম উপলব্ধি করে সমীহের স্বরে বললেন, ও. কে. ফাদার। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনার কথাগুলো মনে রাখব। কিন্তু আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আপনি কাল যে-রিপোর্টটা পুলিশ কমিশনারকে পাঠিয়েছেন, সেটি আমি সঙ্গে করে এনেছি। চৈতালি নামের যে মেয়েটি নিখোঁজ হয়েছে, তার সম্পর্কে আপনি বা আপনার কলিগরা কেউ কিছু জানলে আমাদের বলতে পারেন। আর আপনাদের যে-টিচারের সঙ্গে মেয়েটি ফুল কিনতে গিয়েছিল তাকেই প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করব।

ফাদার একবার তাঁর সামনে বসা দুই ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন। একটু আগেই এই ঘটনাটা নিয়েই তাদের সঙ্গে চুলচেরা আলোচনা করে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটাই বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে, দেখুন মিঃ সান্যাল, আমার এই প্রতিষ্ঠানের বয়স চার বছর পূর্ণ হল, গতকালই তার পঞ্চম জন্মদিন পালিত হয়েছে। এতদিনের মধ্যে কোনও একটি আলপিন পর্যন্ত হারায়নি 'আশ্রয়' থেকে। এই ঘটনাটা কী করে ঘটল তা ভেবে আমরাও কোনও কূলকিনারা করতে পারিনি এখনও পর্যন্ত। যে-সিস্টারের সঙ্গে চৈতালি গিয়েছিল নিউ মার্কেটে সেই নিবেদিতা গত চার বছর আমাদের এখানে আছে, তার সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে ছিল না। এই ঘটনাটার সঙ্গে সে যে জড়িত তা মনে হয় না আমাদের। আর চৈতালি উঠতি বয়সের মেয়ে, তাকে বা তার বয়সী অন্য মেয়েদেরও এখানে

চোখে চোখে রাখা হয় সারাক্ষণ। এর আগেও অন্য মেয়েরা তাদের সিস্টারদের সঙ্গে এখানে ওখানে গেছে, ফিরেও এসেছে নির্বিঘ্নে। অতএব এই ঘটনাটা একেবারেই আমাদের কাছে অভিনব। আপনি দেখুন, কোনওভাবে মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যায় কি না। পাওয়া না গেলে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হবে।

—ওকে ফাদার, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। কিন্তু যাদের আমি ইন্টারোগেট করতে চাই, সে সময় শুধু আমি আর আমার ওই কলিগ—এই দুজনে ছাড়া আর কেউ থাকবে না। সে রকম একটা ঘর কয়েক ঘণ্টার জন্য বরাদ্দ করুন আমাদের।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ফাদার তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সামনে বসা চম্পক চট্টরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, চম্পক, পাশে যে-ঘরটায় তুমি বসো, সেখানেই পুলিশ ইন্সপেক্টরদের বসার ব্যবস্থা করে দাও। আর নিবেদিতাকে খবর দাও নীচে আসার জন্য। গো, কুইক।

চম্পক চট্টরাজের চেম্বারটি তত বড় নয়, কিন্তু ভারী গোছানো। হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মাপে তাঁর সানমাইকা-লাগানো ঝকঝকে টেবিলটি। টেবিলের ওপর একটি ফনোকম, পেনস্ট্যাণ্ড, পিনের কুশন, কটা পেপারওয়েট। দেবাদ্রি আর তাঁর সহকর্মী অলয় বসুরায় দুটো চেয়ারে বসতে না বসতেই দরজায় বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটি তরুণীর ছায়া। প্রায়-ফর্সা রং, খোঁপা করে বাঁধা হালকা চুল, নাকটা সামান্য বসা। চোখমুখ ফুলে আছে সম্ভবত কান্নার কারণে।

—হুঁ, আপনিই কি সিস্টার নিবেদিতা?

প্রথম প্রশ্নেই প্রবলভাবে আলোড়িত হল নিবেদিতা, কেন না এ ভাবে তাকে কেউ কখনও সম্বোধন করেনি। এই প্রতিষ্ঠানে সিস্টার হিসেবেই তাদের পরিচিত করতে চান ফাদার। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে তার পরিচিতি নিবেদিতাদি হিসেবেই।

—আমি নিবেদিতা, নিবেদিতা সান্যাল।

—আপনি তো চার বছর এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, মিসেস সান্যাল। হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা আপনার উপস্থিতিতে ঘটে গেল, তার কী ব্যাখ্যা করবেন বলুন তো?

নিবেদিতা বহুক্ষণ ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল এই মুহূর্তটির জন্য। ভেতরে একধরনের ভয়, শঙ্কা, আবার তার নিজের নির্দোষ থাকার সাহস—দুয়ে মিলিয়ে কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিল সে। পুলিশ অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘটনাটা আমার উপস্থিতিতে ঘটেনি। ঠিক যে সময় আমি ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিলাম সে সময় আমার অনুপস্থিতিতেই কে বা কারা এসে—

—কে বা কারা এসে চৈতালিকে নিয়ে গেল, তাদের কি আপনি দেখেছেন?

—না, দেখিনি। আমি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসে দেখি ফুলের বোকেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। চৈতালি কোথাও নেই। কাছেই একটা ছেলে আমের ঝুড়ি নিয়ে বসেছিল। সেই বলল—

—সে বলল বলেই আপনি তা-ই মেনে নিলেন?

—এ ছাড়া কাছাকাছি জিজ্ঞাসা করার মতো কাউকে পাইনি।

—কেন? চারদিকে তো অনেক দোকানপাট ছিল, তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন?

—দোকানদাররা সবাই দোকানের ভেতরে ছিল, তাদের কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলেই আমার মনে হয়েছিল।

—সেখানে কিন্তু কোনও আমঅলাকে আর দেখা যায়নি। আমরা ফাদারের রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাল সন্ধ্যেবেলা গিয়েছিলাম।

নিবেদিতা একটু উদ্বিগ্ন বোধ করল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, ফুটপাথের দোকান তো আর স্থায়ী নয়। হয়তো সেদিনই বসেছিল।

—অর্থাৎ যাকে আপনি সাক্ষী বলে সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তার অস্তিত্ব আপনি দেখাতে পারবেন না। তাই তো?

নিবেদিতা চুপ করে থাকে। পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টির মধ্যে কেমন একধরনের অবিশ্বাস। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া সামনে আর কাউকেই পাইনি যাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম।

দেবাদ্রির গলার স্বরটা এবার কেমন চেবানো ধরনের মনে হল, তা হলে আপনি এমন নির্জন জায়গায় কেন চৈতালিকে দাঁড় করিয়েছিলেন যেখানে কেউ সাক্ষী থাকবে না?

নিবেদিতার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, কাঁপা স্বরে বলল, জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়, সেখান দিয়ে বহু মানুষজন যাতায়াত করছিল।

দেবাদ্রি স্থির চোখে পরখ করছিলেন নিবেদিতাকে। হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, চৈতালিকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, না সে স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গে চলে গেছে?

নিবেদিতা থমকাল ভীষণভাবে। দেবাদ্রি সান্যালের প্রশ্নের দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা সে একবারও ভাবেনি। আমঅলা অবশ্য বলেছিল দুজন লোকের সঙ্গে চৈতালি গাড়িতে উঠেছে। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, চৈতালিকে আমি যতদূর জানি, সে কারও সঙ্গে স্বেচ্ছায় যাবে না। তাকে নিশ্চয়ই জোর করে ধরে নিয়ে গেছে কেউ।

—আর ইউ সিওর?

—সিওর।

—আচ্ছা সিস্টার, আপনার স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হল কেন?

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক, ঘটনার সঙ্গে এতই খাপছাড়া যে নিবেদিতা কিছুক্ষণ বোবা। শকটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বলল, তার সঙ্গে চৈতালি নিখোঁজ হওয়ার কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে পুলিশকে অনেক কিছুই জানতে হয়।

—এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

দেবাদ্রি আবার পরখ করল নিবেদিতাকে, কিন্তু উত্তর দিতে আপনাকে হবেই। আজ হোক, অথবা কাল। পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তর আপনি যত দেবেন ততই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন।

—কিন্তু এ-প্রশ্নটা ঘটনার সঙ্গে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। চৈতালির হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে না।

—ঠিক আছে, এবারে প্রশ্ন করি, নির্মাল্যবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কতদিনের?

নিবেদিতা হয়তো এরকম কোনও প্রশ্ন আশা করে থাকবে। তার সঙ্গে নির্মাল্যর সম্পর্ক নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যে একটা গুঞ্জন হয় তা তার কানে আসে। বলল, সম্পর্ক বলতে আপনি কী মিন করতে চাইছেন?

দেবাদ্রি মুচকি হেসে বললেন, মানে যেরকম সম্পর্ক হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে।

—সেরকম কোনও সম্পর্ক আমাদের মধ্যে নেই। নির্মাল্য আমার বন্ধু। এখানে আরও কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক আছে, তারা যেরকম আমার বন্ধু, নির্মাল্যও সেরকম, হয়তো ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব একটু বেশিই।

দেবাদ্রি ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন, কতটা বেশি।

নিবেদিতা চুপ করে থাকে। পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞাসাদের সীমা যে এতটা শালীনতা লঙ্ঘন করে তা জানা ছিল না তার। কী করেই বা জানবে! কোনও পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি তো সে হয়নি এর আগে। বলল, সম্পর্ক মাপার তো কোনও থার্মোমিটার বা ব্যারোমিটার জাতীয় যন্ত্র নেই যে তা দিয়ে মেপে দেখব!

দেবাদ্রির মুখের মুচকি হাসি আরও একটু বিস্তৃত হল। পাশেই বসে থাকা তাঁর সহকর্মী অলয় বসুরায়ের দিকে একবার তাকিয়ে কিছু কথা বললেন ইঙ্গিতে। তারপর নিবেদিতাকে বললেন, ও.কে., সিস্টার নিবেদিতা। আপনি এখন যেতে পারেন। যদি দরকার হয়, তাহলে কাল বেলা এগারোটা নাগাদ আপনাকে নিয়ে একবার নিউ মার্কেটে যাব। চৈতালি যেখানে দাঁড়িয়েছিল ফুল নিয়ে সেই স্পটটা দেখব। আর যদি সেই আমঅলা থাকে তো—

বলেই কী যেন ভেবে একটু থেমে তাকালেন নিবেদিতার দিকে, আপনার কয়েকজন কলিগ, আই মিন তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞাসাবাদ করব, কিন্তু তার আগে চৈতালির রুমমেট যে ক'জন আছে, তাদের পাঠিয়ে দিতে বলবেন ফাদারকে?

নিবেদিতা ধীর পায়ে চলে যাওয়ার একটু পরেই দরজার কাছে দু'জন কিশোরীকে দেখা গেল। একজনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে দেবাদ্রি অন্যজনকে ভেতরে ডাকলেন। মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা, দেখতে মোটামুটি ভালই, বয়স পনেরো-ষোলো, পরনে ঘন নীল রঙের ফ্রক। মেয়েটির নাম অনিন্দিতা।

—আচ্ছা অনিন্দিতা, তুমি এই প্রতিষ্ঠানে কত দিন আছ?

অনিন্দিতা শান্তশিষ্ট, মুখচোরা ধরনের। দুজন পুলিশের সামনে বসে ভয়ে আরও জড়োসড়ো। জড়ানো গলায় বলল, দু'বছর।

—আর চৈতালি?

—চৈতালি আমার আগে থেকেই এখানে আছে।

—আচ্ছা, তুমি জানো চৈতালির সঙ্গে বাইরের কারও সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ ছিল কি না!

অনিন্দিতা ঘাড় নাড়ল, আমি জানি না।

—চৈতালি কখনও একা কম্পাউন্ডের বাইরে যেত? কারও সঙ্গে দেখা করতে? কিংবা কেউ আসত ভেতরে তার সঙ্গে দেখা করতে?

অনিন্দিতা ঘাড় নাড়ল, আমি জানি না।

দেবাদ্রি বুঝলেন, হয় মেয়েটিকে এভাবে কিছু না বলতে শেখানো হয়েছে অথবা পুলিশের ভয়ে কিছু বলতে চাইছে না। কিন্তু এ-বয়সের মেয়েকে কিছু ধমকধামক দিলে হয়তো কেঁদেই ফেলবে হাউমাউ করে। তাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিয়ে ডাকলেন অন্য মেয়েটিকে।

দ্বিতীয় মেয়েটির নাম অতসী। রং ময়লা, বয়সও অনিন্দিতার চেয়ে একটু বেশি, অপেক্ষাকৃত লম্বাও। আরও পার্থক্য এই যে, পুলিশ অফিসার দেখে এ-মেয়েটি ঘাবড়ায়নি একটুও। দেবাদ্রি সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, চৈতালি আর আমি একই সঙ্গে আশ্রমে এসেছি। কিন্তু চৈতালির সঙ্গে বাইরের কারও যোগাযোগ কখনও ছিল না।

—কেউ দেখা করতে আসত চৈতালির সঙ্গে?

—না। দেখা করতে এলে তো অফিসে তার নাম এন্ট্রি হবে।

—আচ্ছা, এমনও হতে পারে সবার নজর ফাঁকি দিয়েও কারও মাধ্যমে যোগাযোগ য়েছিল। সেই কারণেই একটা নীল অ্যাম্বাসাডার মাঝে মধ্যে এসে দাঁড়াত গেটের সামনে।

অতসী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপর জিজ্ঞাসা করল, কারও মাধ্যমে?

—হ্যাঁ। তোমাদের কোনও টিচারের মাধ্যমে?

অতসী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, না। চৈতালির তেমন কোনও কিছু থাকলে অন্তত আমাকে বলত।

—তাই নাকি। দেবাদ্রির কপালে ভাঁজ, ওর মধ্যে ইদানীং কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে ড়েনি কারও?

—অস্বাভাবিকতা! অতসী হঠাৎ বলল, হ্যাঁ। তা একটা ছিলই ওর মধ্যে।

দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠতে চাইলেন, কীরকম অস্বাভাবিকতা?

অতসী সময় নিল একটু, আস্তে আস্তে বলল, ও রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে উঠে পড়ত ছানা থেকে।

—ইজ ইট? দেবাদ্রি সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন অতসীর দিকে, তারপর কী করত?

—ঘুমের মধ্যেই চলাফেরা করত ঘরের মধ্যে। কখনও দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলত।

—সে কী! তারপর?

ছিটকিনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারও না কারও ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন ছুটে গিয়ে াইট জ্বালিয়ে দি! 'সরি' বলে এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

—স্ট্রেঞ্জ! এরকম কি প্রায়ই হত?

—প্রায়ই ঠিক তা নয়। তবে মাসে এক-দু দিন তো হতই।

—কিন্তু ছিটকিনি খোলার সময় যদি তোমাদের ঘুম না ভাঙ্গে?

—হুঁ। তাও একদিন হয়েছিল। ছিটকিনি খুলে প্রথমে বারান্দায়, তারপর সিঁড়ি বেয়ে সাজা নীচে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল মাঠের দিকে।

—তারপর? তারপর? দেবাদ্রি ভারী উত্তেজিত।

—ভাগ্যিস নিবেদিতাদি তাঁদের হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলেন। ্তনি ওখান থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে চৈতালিকে ধরে ফেলেছিলেন! তখনও চৈতালি ুমে।

—ঘুমে! না ঘুমের ভান করে?

—না। ঘুমের ঘোরেই ছিল। আমরা জানতাম ও ঘুমের মধ্যে ওরকম হাঁটে। নিবেদিতাদিও াই বলেছিলেন। উনি না ধরে ফেললে কী যে হত চৈতালির!

দেবাদ্রি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বললেন, কী আবার হত! চৈতালির এখন যা অবস্থা য়েছে, তাই হত। চিড়িয়া ফুরুৎ! কিন্তু এত সব হিস্ট্রি কই তোমাদের সিস্টার নিবেদিতা তো ললেন না আমাকে। স্রেফ চেপে গেলেন!

—বলেননি বুঝি?

—না। কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা অত রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

অতসী চুপ করে থেকে বলল, নিবেদিতাদির রাতে ঘুম হয় না। প্রায়ই নাকি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—তাই নাকি? দেবাদ্রিকে হঠাৎ খুব চিন্তিত দেখায়, তা হলে তো ভারী মিস্টেরিয়াস ক্যারেক্টার!

বলে পাশে বসে থাকা সহকর্মী অলয় বসুরায়ের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন বার দুই পরক্ষণে অতসীকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার। আর হ্যাঁ, তোমাদের ব্রাদার নির্মাল্যকে একবার পাঠিয়ে দিতে বল তো।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক একে-ওকে জেরা করার পর দেবাদ্রি যখন 'আশ্রয়' ছেড়ে বেরুলেন, হঠাৎই দেখা হয়ে গেল গার্গীর সঙ্গে। দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠে বললেন, আরে আপনি এখানে?

গার্গী অবশ্য ইতিমধ্যে দেবাদ্রিকে দেখেছে একের পর এক—একে-ওকে জেরা করতে হেসে বলল, এটা আমার প্রথম কর্মস্থল। এসেছিলাম সবার সঙ্গে দেখা করতে।

—শুনেছেন এখানে একটা মিসহ্যাপ হয়েছে?

—শুনলাম তো। খুবই অবাক লাগছে। এখন আপনার ওপরই দায়িত্ব
বার করার।

দেবাদ্রি চিন্তিত মুখে বললেন, হুঁ, করতে তো হবেই। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার যখন বারবার খোঁজ নিচ্ছেন!

ততক্ষণে ফাদারও বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। পুলিশের জিপ হর্ন দিয়ে লন কাঁপিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফাদার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

তাঁর চারপাশে তখন অনেক ভিড়। আস্তে আস্তে বললেন, মনে হচ্ছে পুলিশ কমিশনার যোগ্য অফিসারের হাতেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। লেট আস অল ওয়েট ফর চৈতালি আর হ্যাঁ, সবাই শোনো। তোমাদের জন্য অন্য একটা সুখবর আছে। সুখবরটা পাঠিয়েছে মুম্বই থেকে অভিনেত্রী শ্রীরাধা। আজ এই ঝামেলার দিনে ভাঙলাম না খবরটা। কাল বলব

## ॥ ৫ ॥

রেণু-রেণু ধোঁয়া রং ভোরের দিকে মুখ করে গিটারটিতে টুংটাং শব্দ তুলছিল সমুদ্রনীল তার দু' পায়ের ওপর ন্যস্ত এই প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। বহুকালের পুরনো গিটারটিই যেন তা হৃৎপিণ্ড। তাতে সুর সঞ্চার করতে করতে বুঁদ হয়ে থাকে নিজের ভেতর। আজও চো বোজা, কিন্তু আঙুলের কারুকাজ চলছে নির্ধারিত ছন্দে। ভোরের এই ব্রাহ্ম মুহূর্তটাই যে সুরের জেগে ওঠার সময়। এ হেন সন্ধিক্ষণে গোটা কলকাতা থাকে আধোসুপ্ত, পৃথিবী অপেক্ষা করে সূর্যের প্রথম রশ্মির চুম্বনের, আর মানুষের মগজ থাকে ভারী পরিষ্কার—ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। এ সময়ে সুর জেগে ওঠে এক মায়াবী পরীর মতো। ডানা মেলে উড়ে থাকে 'আশ্রয়'-এর এ-কোণ ও-কোণ। তার প্রতিটি মুহূর্তই ভারী উপভোগ করে সমুদ্রনীল

টিচার্স হোস্টেলটির একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছেন ফাদার—মেন্টর'স হাউস। তত্ত্বাবধায়ক আসলে সবুজদের মেন্টর। তাদের বন্ধু, শিক্ষক, নির্দেশক সবই। সেই মেন্টর'স হাউসে একটি ঘরে সমুদ্রনীল রোজই ভোরে তার প্রিয় গিটারটি বাজায়। তার গিটারের শব্দে ঘু

ভাঙে এখানকার বাসিন্দাদের। একশো সবুজও জানে তাদের প্রিয় শিক্ষক নীলদার আশ্চর্য সুরপ্রিয়তার কথা। তার সুরে অবশ্য মিশে থাকে এক ছন্ন বিষাদ। তাতে তার জীবনের ছোট্ট একটা ট্রাজেডি তো প্রকাশিত হয় রোজ।

তার সহকর্মীদের অনেকেই একে-একে জেনে গেছে তার সেই ব্যথার ইতিহাস।

আজ অবশ্য সেই ব্যথার সঙ্গে সুরে জড়িয়ে যাচ্ছে এক টুকরো কান্নাও।

সমুদ্রনীলের রুমমেট নির্মাল্য আবার একটু অলস, ঘুমকাতুরে। সুরের কাঁপা-কাঁপা ছন্দ তার কোঁকড়া চুলে বিলি কাটলেও সে বালিশ সাপ্টে চোখ বুজে দ্বিতীয় ঘুমের চেষ্টায় রত হয়। কখনও বলেও, রোজই তোর একই সময়ে কী করে ঘুম ভাঙে বল্ তো? তোর কি একদিনও ইচ্ছে করে না বেহুঁশ হয়ে আটটা-ন'টা পর্যন্ত ঘুমোতে?

রোজই বলে, তবু রুটিনের মতো রোজ ভোরে সমুদ্রনীলের গিটার শুনতে শুনতে একসময় সুর শোনাটাই অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে নির্মাল্যের। এখন কোনও দিন তার গিটারের স্বর শুনতে না পেলেই বরং সে অবাক হবে, উসখুস করতে থাকবে কোথাও যেন একটা তাল কেটে গেছে, কী যেন আজ নেই এই ভেবে।

আজ যেন সেরকমই একটা ছন্দহীন ভোর। সমুদ্রনীলের আঙুল থেকে যে-সুরটা বেরুচ্ছে তা প্রতিদিনকার মতো নয়। আজ শুধু কান্না আর কান্না। কিছুক্ষণ উসিবিসি করে নির্মাল্য হঠাৎ বলে উঠল, কী বাজাচ্ছিস, ধুস্!

সমুদ্রনীল উত্তর দেয় না। তার আঙুল থেকে আজ যেন ঝরে পড়ছে আরও গভীরতর কোনও ট্রাজেডি।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত পুলিসি-জেরা চলায় রূপায়ণ থেকে গিয়েছিল এখানে। এরকম মাঝেমধ্যে থাকে ও। সমুদ্রনীলদের ঘরে একটা ক্যাম্পখাট ভাঁজ করা থাকে, সেইটেই পেতে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তারও ঘুম ভেঙে যেতে কিছুক্ষণ পরে বলল, এটা কি বিরহের সুর, নীল? চৈতালি চলে গেছে তাই?

সমুদ্রনীল উত্তর দেয় না।

—এই বয়সের মেয়ে, খাঁচায় আটকে রেখে সন্ন্যাসিনী করে তুলতে চাইলে কি থাকে? উড়ে যাবেই।

সমুদ্রনীল এবারও কোনও জবাব দেয় না।

—না কি যে-মেয়েটা তোকে লেঙ্গি মেরে চলে গেছে তার স্মরণে বাজাচ্ছিস?

গিটারের তারে আঙুলের কারুকাজ চালাতে চালাতে সমুদ্রনীল এতক্ষণে বলে, যা হোক কিছু ভেবে নে—

এইটেই সমুদ্রনীলের দুর্বলতম জায়গা। ত্রিস্তা নামের একটি ছটফটে, দেখন-হাসির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল একদা। বছর দুই তার সঙ্গে ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ সে এক দিন 'তোমার ওই ষোলশ টাকা মাইনেয় তো আর সংসার চলবে না' বলে তার ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিতে পাওয়া একটা চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল ব্যাঙ্গালোর। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল, 'তোমার জন্যও ওখানে একটা চাকরি ঠিক করে ফেলব ঠিক। তার পরই—।' অবশ্য তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি ত্রিস্তার।

নির্মাল্য হঠাৎ বলল, এ সব প্রসঙ্গ এখন থাক, রূপায়ণ।

অতএব ঘরের মধ্যে কয়েক লহমা বাক্য বিনিময়ের বিরতি। শুধু সমুদ্রনীলের ছড়িয়ে দেওয়া বিরহের রেশ তখনও ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে 'আশ্রয়'-এর আবহাওয়ায়। কিছুক্ষণের

মধ্যেই রোজকার মতোই চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করে কম্পাউণ্ডের ভেতরকার প্রাণস্পন্দন। কিন্তু না, রোজ যেমন হয়, তেমন নয়। কোথাও যে একটা খেই কেটে গেছে তা প্রতিষ্ঠানের যে কোনও মুখের অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায়।

ভোর উত্‌রে সকালের রোদ একটু উসিয়ে উঠতেই হঠাৎই তাদের ঘরে হন্তদন্ত পায়ে ঢুকে পড়ল তুলিকা। তার পরনে রাতের ঢোলা ম্যাক্সি। পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত কাটা চুলের রাশ ছড়িয়ে বুকে-পিঠে। তার চোখের নীচে কালি। তার ওপর কাজলে ধেবড়ে আরও কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছে মুখখানা। সমুদ্রনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটা গুড নিউজ আজ সবার কাছে জানাবেন ফাদার।

সুখবরটা কী তা কেউ জানে না, কিন্তু কথাটা কাল রাত থেকে কেবলই বলাবলি হচ্ছে পাঁচমুখে, কিছু একটা ফ্যান্টাস্টিক খবর আছে 'আশ্রয়'-এর বাসিন্দাদের জন্য। সমুদ্রনীল এতক্ষণে তার আঙুলের কারুকাজ বন্ধ করে স্থিরচোখে তাকাল তুলিকার দিকে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবাইকেই মনে মনে একটু সমীহ করতেই হয় বাঘের মাসি তুলিকাকে।

—কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বলে পাঠিয়েছেন ফাদার। 'আশ্রয়'-এর বার্থডে ভালয় ভালয় মিটে গেলে সবাইকে একটা স্পেশাল লাঞ্চ দেবেন বলেছিলেন। ফাদারের ইচ্ছে ছিল আজ দুপুরেই সেই লাঞ্চ দেওয়ার। কিন্তু এখন 'আশ্রয়'-এর যা পরিস্থিতি, ফাদার মনে করছেন তাতে হইহুল্লোড় করে লাঞ্চ খাওয়ার মতো কারও মনের অবস্থা নেই। তোমরা কী বলো?

নির্মাল্য, রূপায়ণ দুজনেই এতক্ষণে চূড়ান্ত আল্‌সের মতো বিছানায় ঘাপটি মেরে উপভোগ করছিল ভোর-ঘুমের রেশ। কিন্তু তুলিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই তড়াক করে উঠে বসেছে বিছানায়। ফাদারের বক্তব্য তুলিকা মারফত শোনার পর সমুদ্রনীল, রূপায়ণ আর নির্মাল্য একে অপরের দিকে তাকাল। কী বলবে ভেবে থমকাল কয়েক মুহূর্ত। একটু পরে সমুদ্রনীল বলল, ফাদার যা ভাল মনে করবেন।

—ফাদার তোমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন। তিনি তো সব সিদ্ধান্ত তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেই নেন।

সমুদ্রনীল কিছুক্ষণ পরখ করল তুলিকার বাসি মুখখানার সৌন্দর্য ও ভাবগতিক। আসলে ফাদার সব সিদ্ধান্ত নিজেই নেন। কিন্তু তার আগে সমস্যাটা এমন সুকৌশলে অন্যদের সামনে পেশ করেন যাতে ফাদারের সিদ্ধান্ত তাদের মুখ দিয়ে অমনিই বেরিয়ে আসে।

রূপায়ণ খুব বেশি আদব কায়দার ধার ধারে না। সে হঠাৎ বলে উঠল, চৈতালির জন্য মন খারাপ আজ না হয় দু দিন পরে মিটে যাবে। তার জন্য স্পেশ্যাল লাঞ্চ বন্ধ করে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

তুলিকা তার কাজল-ধ্যাবড়ানো চোখ বিদ্ধ করল রূপায়নের দিকে, কিন্তু সেটা খারাপ দেখাবে না?

সমুদ্রনীল তৎক্ষণাৎ বলল, আমার মনে হয় আপাতত খাওয়ার ব্যাপারটা মুলতবি থাক কাল পুলিশ এসেছিল তদন্ত করতে। আজ নিবেদিতাকে নিয়ে পুলিশ নিউমার্কেটে যাবে স্পটটা দেখতে। এত সব পুলিশি হামলার ভেতর স্পেশ্যাল লাঞ্চ হজম করাটা বোধহয় একটু শক্তই।

নির্মাল্যও সায় দিয়ে বলল, একজ্যাক্টলি।

তুলিকা আর না-দাঁড়িয়ে প্রস্থান করল ঝড়বৎ। নিশ্চয়ই ফাদারের কাছে খবরটা পৌঁছে তেই। নির্মাল্য সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, তুলিকার এই ম্যাক্সি পরে কম্পাউণ্ডের তের এদিক-ওদিক ঘোরাটা আমার একদম বরদাস্ত হয় না।

সমুদ্রনীল একঝলক তাকাল রূপায়ণের দিকে। নির্মাল্য ঠিক বোঝে না কোনও কোনও ব্য বিশেষ কারও সামনে করা উচিত নয়। রূপায়ণ আর তুলিকা দুজনেই দুভাবে ফাদারের ঙ্গ সম্পর্কিত। রূপায়ণের সঙ্গে হয়তো রক্তের সম্পর্কও আছে ফাদারের। নির্মাল্যের কথাটা গনও ভাবে, ভায়া রূপায়ণ যদি তুলিকার কানে যায়, সেখান থেকে ফাদারের কানে, তাহলে র্মাল্যের বিপদ হতে পারে। হতে পারে কেন, কিছুটা হয়েছে ইতিমধ্যে। নিবেদিতার সঙ্গে গনও সম্পর্কের কারণেই হোক, অথবা অন্য কোনও গূঢ় কানভাঙানিতেই হোক, বেদিতার মতো নির্মাল্যও ফাদারের গুডবুকে নেই। হয়তো নির্মাল্যের এহেন আল্‌পটকা ব মন্তব্য তার বিরুদ্ধে ভাংচি হয়ে গেছে আগেই।

তবে রূপায়ণকে বোঝা একটু মুশকিল। তার মন্তব্য আরও অশালীন ও ব্যাকরণ বহির্ভূত। াদারকে নিয়েও সে অনেকসময়---

বেলা ঠিক ন'টা নাগাদ পুলিশের জিপ গর্জন করতে করতে মাড়িয়ে এল সবুজ লনের চেরা ছ'ফুট রাস্তাটা। পুলিশের জিপের শব্দ যেন এখন একরাশ ভীতির ভাইরাস। সেই স হু হু করে সেঁধিয়ে গেল আশ্রয়-এর প্রতিটি মানুষের শরীরে। ভাইরাসরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি রল ও যতক্ষণ জিপটা দাঁড়িয়ে থাকল নিঃশ্বাস ছাড়তেও যেন ভুলে গেল 'আশ্রয়'-এর সিন্দারা।

নিবেদিতা তৈরিই ছিল। জিপের শব্দ শুনেই মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে নেমে গেল ঁড়ি বেয়ে। কারও দিকে তাকাল পর্যন্ত না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আসামি যেন এগিয়ে চ্ছে কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবে বলে।

একটু পরেই আবার জিপের গর্জন।

জিপটা কম্পাউণ্ডের বাইরে যেতেই সম্বিৎ ফিরল সমুদ্রনীলের। ও একা গেল। ওর সঙ্গে কউ গেলে হত না!

রূপায়ণ বলল, নির্মাল্য গেলে পারত। ওরই তো—

ওরই কী তা আর খোলসা করে বলল না রূপায়ণ। নির্মাল্য তার ইঙ্গিতটা গায়ে না মেখে লল, আমি যেতে চেয়েছিলাম, নিবেদিতা বলল, লাগবে না।

একটা নিবিড় অস্বস্তি ঘিরে রইল গোটা মেন্টর'স হাউসে যতক্ষণ না নিবেদিতা ফিরে এল ন্টা দুই পরে।

ইতিমধ্যে স্পেশাল লাঞ্চের পরিকল্পনা বাতিল করেই ফাদার একটা মিটিং ডেকেছেন লা এগারটায়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সবাইকে নিয়ে এ ধরনের মিটিংগুলো সাধারণত হয় লের দোতলায় ডাইনিং হলে। স্কুলবিল্ডিঙের একতলায় ঢুকতেই প্রথম ঘরটা বেশ প্রশস্ত। খানে প্রতিদিন প্রার্থনা হয় ক্লাস শুরু হওয়ার ঠিক আগে। তারপর অনেকগুলো ক্লাসরুম।

দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে, প্রেয়ার রুমের ওপরের ঘরটাই ডাইনিং হল। ফাদার আসবেন নে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই হলের চেয়ার টেবিলগুলো গিজগিজ করছে সবুজে। ত্বাবধায়করাও অপেক্ষা করছে ফাদারের জন্য। ফাদার অবশ্য খুব কমই আসেন ডাইনিং লে। হঠাৎ কোনও বিশেষ উপলক্ষে স্পেশাল লাঞ্চ বা স্পেশাল ডিনারের ব্যবস্থা হলে বেই আসেন কেন এই বিশেষ আয়োজন তা বক্তৃতার মাধ্যমে পেশ করতে। তাঁর অবশ্য

হাতে সময় থাকে খুবই কম। টাট্টু ঘোড়ার মতো প্রায় দৌড়তে দৌড়তে উঠে আসেন সিঁ বেয়ে। দ্রুত সিঁড়ি ভাঙার ফলে হাঁপাতে থাকেন অল্প অল্প। কিন্তু এক মুহূর্তও জিরেন না নিয়ে সবার সামনে ছোট্ট অথচ সুন্দর ভাষণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন কী সেই বিশেষ উপলক্ষ যা সেলিব্রেট করতে এই বিশেষ ভূরিভোজ। হয়তো কোনও এক সবুজ কোথাও কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়ে এসেছে, কিংবা কোনও সবুজ শিশির মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছে অন্য কোনও সংস্থার আমন্ত্রণে, অথবা বিদেশ থেকে হঠাৎ অভাবিতভাবে কোনও অর্থ সাহায্য এসেছে তা দিয়ে নতুন একটা ক্লাসরুম তৈরি করা যাবে— এমন নানান উপলক্ষ তৈরি হয় দু-তিন মাস পর পর। সবুজেরা যখন লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো সেদিনকার বিশেষ মেনুর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে, তখনই ফাদার শুরু করেন তাঁর দ্রুত ভাষণ।

আজও সেরকমই কোনও সুখবরের জন্য সবাই প্রতীক্ষা করছে টানটান—যদিও তাদের সামনে কোনও বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত নেই।

ফাদার এলেন ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। একই রকম হন্তদন্ত পায়ে ব্যস্তসমস্ত মুখভঙ্গি। তাঁর দু পাশে যথারীতি দুই আঙ্কেল। তাঁরাও ফাদারের সঙ্গে ছুটতে গিয়ে গলদঘর্ম। বিশেষ করে তরফদার-আঙ্কেল একটু মোটা বলে তাঁর শরীরে অধিকতর ঘামবন্যা

যথারীতি আজও ফাদার কোনও ভূমিকা করে সময় নষ্ট করলেন না। ডাইনিং হলের একদিকে তিনটি হাতলঅলা চেয়ার পাশাপাশি। তারই মাঝখানেরটায় বসে দু-একমুহূর্ত চোখ স্থির করলেন সবুজদের সারবন্দি নিশ্চল বসে থাকা, তাদের পরনের পোশাক, চুল আঁচড়ানো ও শৃঙ্খলাপরাণয়তার দিকে। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, শোনো সবুজেরা, আজ তোমাদের জন্য একটা ভাল-লাগার খবর। তোমরা তো জানই ভাল খবর না থাকলে ফাদার তোমাদের কাছে বড় একটা আসেন না। তবে অন্যদিনের সঙ্গে আজকের পার্থক্য হল, এই সব ভাল খবরের দিনে তোমাদের সামনে থাকে ভাল-ভাল খাওয়া। কিন্তু আজ তা নেই। বুঝতে পারছ ইচ্ছে করেই তা করা হয়নি। কারণ পরশু সকালে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনায় আমাদের প্রত্যেকেরই মন খারাপ। যতক্ষণ না চৈতালিকে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে, নিশ্চয়ই হইহই করে আনন্দ করে স্পেশাল লাঞ্চ খেতে তোমাদের কারও মন চাইবে না। এই কারণেই খাওয়াটা আজকের জন্য মুলতবি। চৈতালি ফিরে এলেই দ্বিগুণ উৎসব করে—

ফাদার তাঁর স্বভাব অনুযায়ী দু-এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন বক্তৃতায়। পরক্ষণেই শু করলেন। হ্যাঁ, সুখবরটা দেওয়ার আগে প্রথমেই তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, গত পরশুর অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সফল করে তোলার জন্য। গতকাল এবং আজ দুদিনে কলকাতার বিভিন্ন মহল থেকে এত এত টেলিফোন পেয়েছি যে, তাদের কথাগুলো একত্রে টেপ করে রাখতে পারলে তা হত এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ। তোমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বেশ কয়েকটি চিঠিও এসেছে আজ। সেগুলো অফিসের নোটিশবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা বিকেলের দিকে একবার দেখে নিতে পারো। কলকাতার মহামান্য মেয়র স্বয়ং ফোন করে জানিয়েছেন, তিনি অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ, অভিভূত। কেন এই প্রতিষ্ঠানের কথা আগে কখনও শোনেননি তা ভেবে আফসোস করেছেন বারবার। হয়তো তিনিও শিগগির তোমাদের জন্য কোনও সুখবর দিতে পারেন।

ফাদার আবার একটু বিরতি দিলেন হয়তো দম নেওয়ার জন্য বা হয়তো উ সবুজদের চোখেমুখে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যও। একবার তাকালেনও তাঁর দিকে সার দিয়ে বসে থাকা তত্ত্বাবধায়কদের মুখের দিকেও।

—হ্যাঁ, অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ব্রাদার অ্যাণ্ড সিস্টারদের। তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই যে অনুষ্ঠানটি এরকম উচ্চতায় উঠতে পেরেছে তা স্বীকার করেছেন সবাই। এত সব প্রশংসা, অভিনন্দন শুনতে শুনতে গর্বে বুক ফুলে উঠছিল আমার। কিন্তু এই সব প্রশংসা তো আসলে তোমাদেরই প্রাপ্য।

বলে আবার থামলেন ফাদার। তাঁর চকচকে টাকের ঘামবিন্দুগুলি চট করে রুমালে মুছে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আর বেশিক্ষণ এই নীরস বক্তৃতা তোমাদের সামনে দেব না। বিশেষ করে খাওয়ার ব্যবস্থাই যখন করা হয়নি। এবার তোমাদের সামনে আসল খবরটা তাহলে দি। খবরটা পেয়েছি কাল সকালেই। হোটেল থেকে মুম্বইয়ের ফ্লাইট ধরতে বেরবার মুখেই ফোন করেছিলেন অভিনেত্রী শ্রীরাধা। তিনি পরশু সন্ধের অনুষ্ঠান দেখে অসম্ভব খুশি। বলেছেন মুম্বই থেকে কলকাতা আসা সার্থক হয়েছে তাঁর। 'আশ্রয়'-এর ছেলেমেয়েরা যে এত কিছু শিখেছে, শিখে তা পরিবেশন করে আনন্দ দিচ্ছে পাঁচজন জ্ঞানীগুণী মানুষকে, এতে তিনি চমৎকৃত। প্রত্যেক সবুজকেই তিনি আলাদা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে তিনি তাদের মধ্যে—

বলতে বলতে এবার একটা দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ফাদার পৌঁছলেন তার আসল বক্তব্যে।

—তাদের মধ্যে প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছে রিয়া নামে যে-মেয়েটি তাকে খুব মনে ধরেছে ওঁর। বলেছেন 'আশ্রয়' কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে তিনি রিয়াকে নিজের কাছে রেখে আরও লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলবেন। ওর ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ভার তাঁরই।

এত বড় ডাইনিং হলটা এতক্ষণ নিঃস্তব্ধ ছিল, হঠাৎ একটা শিহরণ, গুঞ্জন ধাঁ করে বয়ে গেল গোটা হলঘরে। ফাদারের কথার তাৎপর্য কী তা বুঝতে একটু সময়ও লাগল যেন সবার।

—ভাবতে পারো, রিয়া এখন থেকে থাকবে মুম্বইয়ে শ্রীরাধার প্রাসাদোপম বাড়িতে। মানুষ হবে রাজকন্যার মতো। কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না তার। রিয়ার জীবনযাপনই বদলে যাবে অতঃপর। খবরটা শোনার পর আমি সারাদিন থম্ হয়ে ভেবেছি শ্রীরাধার মহানুভবতার কথা। আর রিয়ার ভাগ্যের কথাও। সেই সঙ্গে এও চিন্তা করেছি, যে-মহান উদ্দেশ্যে আমার এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তা একটু হলেও সফল। আমি তো চাই-ই, এখানকার সবুজেরা বড় হোক, মানুষ হোক। তারা এক এক দিকে বিকশিত করে তুলুক নিজেদের। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত থাক।

বলে ফাদার আর দাঁড়ালেন না এক মুহূর্তও। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল আরও একশো কাজ বাকি রয়ে গেছে অফিসে। যেমন হুড়মুড় করে লন পেরিয়ে এসেছিলেন এখানে, দুদ্দাড় করে উঠেছিলেন সিঁড়ি বেয়ে, তেমনই ঘোড়ায় জিন দিয়ে নেমে গেলেন একই দ্রুততায়।

সে-দৃশ্যের দিকে চোখ পেতে ডাইনিং হলে কিছুক্ষণ হতবাক নীরবতা। এর আগেও বহুবার নানান সুখবর এভাবেই বক্তৃতা দিয়ে ফাদার শুনিয়েছেন সবাইকে। তার সঙ্গে আজকের সুখবরের যেন আকাশ-সমুদ্র পার্থক্য।

ফাদার চলে যেতেই জোড়া জোড়া চোখ একসঙ্গে বিদ্ধ হল রিয়ার চুড়িদার পরা চেহারার দিকে। রিয়ার মুখেচোখে ততক্ষণে দুলে উঠেছে এক-ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময়। বুঝে উঠতে পারছে না 'আশ্রয়'-এর আশ্রম-পরিবেশ ছেড়ে হঠাৎ মুম্বইয়ের এক প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বৈভবের

জীবনযাপন করতে কীরকম লাগবে তার! আর রিয়ার সহপাঠীদের চোখে বিবিধ প্রতিক্রিয়া। কেউ রিয়ার এই অসম্ভব সৌভাগ্যে চমকিত, হতচকিত, কারও অভিব্যক্তিতে উল্লাস, কেউ বা সামান্য ঈর্ষান্বিত।

রাই বসেছিল তার পাশেই। সে রিয়ার সহপাঠী, একান্ত বন্ধুও। শুধু তার চোখে যেন রিয়ার এই চলে যাওয়ায় সায় নেই। একঘর বিস্ময় ও স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ সে-ই বলল, তুই সত্যিই চলে যাবি, রিয়া?

অবাক রিয়া বলল, সে কী, যাব না?

—সে তোর ব্যাপার। কিন্তু আমাদের সবাইকে ছেড়ে তুই সেখানে একা থাকতে পারবি?

রিয়া কিছুক্ষণ দোলাচলে। সে তখনও ভেবে চলেছে শ্রীরাধার সুখে-ঐশ্বর্যে টইটম্বুর এব আশ্চর্য পৃথিবীর কথা। হিন্দি সিনেমার অজস্র সেলুলয়েডে শ্রীরাধার প্রাসাদপ্রতিম বাড়িতে বসবাস ও বৈভবে ডুবে থাকার দৃশ্য তাকে ততক্ষণে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক স্বপ্নের দেশে।

তার মুখ থেকে কোনও উত্তর শোনার আগেই হঠাৎ স্কুলবিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় শব্দে উঠে এল ফাদারের খাস বেয়ারা বিট্টু। ডাইনিং হলে হুমদো মুখ বাড়িয়ে বলল নিবেদিতা-দিদিমণি, আপনার ভিজিটর।

পুলিশের গাড়িতে করে নিউ মার্কেটের সেই বিশেষ জায়গাটি সনাক্ত করে আসার পর এখনও কারও সঙ্গে একটাও কথা বলেনি নিবেদিতা। সেখানে পুলিশ অফিসাররা তাকে কী জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে কি না ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে টুঁ-শব্দটি উচ্চারণ করেনি এখনও। তার সহকর্মীরা সবাই-ই এখন ভীষণ অস্বস্তিতে। এর মধ্যে তার আবার ভিজিটর!

নির্মাল্যই জিজ্ঞাসা করল, কে দেখা করতে এসেছেন? কী নাম, জেনে এসেছ?

—হ্যাঁ। ভিজিটরস রুমে বসে আছেন। নাম বললেন, বিলাস সান্যাল।

মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়কদের সবারই মুখে একটাই অভিব্যক্তি, হঠাৎ এ-লোকটা নিবেদিতার কাছে কেন!

অরণি আর সুছন্দা তাকাতাকি করল নিজেদের ভেতর, তুলিকা আর তিয়াসা চোখাচোখি করল দুজনে, রূপায়ণ ভুরু নাচাল সমুদ্রনীলের দিকে, বিশাখা ভ্রূকুটি করল নির্মাল্যর চোখে আর সাদা হয়ে গেছে নিবেদিতার মুখ। সবাই জানে বিলাস সান্যাল তার প্রাক্তন স্বামী।

## ॥ ৬ ॥

অফিসের প্রথম ঘণ্টাটি গার্গী বরাদ্দ করেছে ডাক ফাইল দেখার কাজে। তার সামনে তখন বিছিয়ে থাকে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নানান চিঠিপত্র, রিপোর্ট রিটার্ন। কখনও বীরভূম মেদিনীপুর কখনও কুচবিহার থেকে পাঠানো চিঠিপত্র বা সেল-ফিগারে চোখ রেখে মনে মনে হিসেব করতে থাকে কোন জেলায় কাজের গতিপ্রকৃতি কীরকম, বিক্রি বাড়ছে, না কমছে বাড়লে কত বাড়ছে, বা কমলে কত? না কি স্থির হয়ে আছে বিক্রিবাটার পরিমাণ। অথবা কোথাও গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে কি না। দিলে কী ধরনের সমস্যা।

গার্গী যতটা পারে নিজেই চিঠিচাপাটি করে জেলায় পাঠিয়ে দেয় কোম্পানির নির্দেশনায়। কখনও ডেকে পাঠায় স্ট্যাটিসটিক্যাল সেলের অনিল হেমব্রমকে। লোকটি ভারী কাজকর্মের। জেলার হিসেব হাতে পেলেই আপ-টু-ডেট করে রাখে তার রিপোর্ট রিটার্ন।

একটু আগেই একজন অদ্ভুত মানুষ এসেছিলেন গার্গীর চেম্বারে। লোকটির নাম হরদেব সিং। এক্স-আর্মি, ইউ. পি-র লোক। সৈন্যবাহিনীতে যে একদা ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর ইয়া মোটা স্ট্যালিন-স্ট্যালিন মোচ। এখন একটা এন. জি. ও-র প্রধান। গার্গীর কাছে এসেছিলেন একটা সেমিনারে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানাতে। বিষয় ঃ অফিসে মহিলা বসদের ভূমিকা।

সেমিনারের অদ্ভুত বিষয়টি অনুধাবন করে ভারী মজা লাগল গার্গীর। তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করে বলল, যাব, নিশ্চয়ই যাব।

হরদেব সিং কথায় কথায় বলছিলেন বছর দুয়েক আগে মণিপুরে উগ্রপন্থী দমন করার কাজে গিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। বিচিত্র নয়, বলা ভাল ভয়ঙ্কর।

—ম্যাডাম, আজ আমাকে দেখছেন স্যুটেড-বুটেড হয়ে আপনার সামনে বসে খোসমেজাজে গল্প করতে। অথচ দু'বছর আগে একটুর জন্যে ওপারে রওনা দিতে দিতেও বেঁচে আছি স্রেফ বরাত জোরে।

—কীরকম? গার্গী আগ্রহী হয়।

—আমরা দুই কর্নেল হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম জিপে করে। রাস্তার ওপর একটা গাছের গুঁড়ি কীভাবে যেন উপড়ে পড়েছিল। জিপের দু'দিক থেকে দু'জন নেমে গুঁড়িটা সরাতে যেতেই সর্বনাশ। গুঁড়ির ওপাশে একজন উগ্রপন্থী যে লুকিয়ে শুয়েছিল তা ভাবতেই পারিনি। সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে তার স্টেনগান তাক করল—

—আপনার দিকে? গার্গী আতঙ্কে ওঠে।

—নো। গড সেভ্‌ড্ মি, বাট কিল্ড মাই ফ্রেণ্ড। আমার সহকর্মীর দিকেই স্টেনগানের নল! গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন সহকর্মী।

—আর আপনি?

—আমি তক্ষুনি আমার রিভলভার বার করে শেষ করে দিয়েছিলাম উগ্রপন্থীটিকে, বলে হরদেব সিং হাসলেন, সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও, আজও অবাক হয়ে ভাবি, স্টেনগানের নল যদি প্রথমে আমার সহকর্মীর দিকে তাক না করে আমার দিকে তাক করলে কী হত! হয়ত এরই নাম ভাগ্য।

গার্গী অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল এক্স-কর্নেল হরদেব সিং-এর মোচঅলা ডাগরাই চেহারাটার দিকে। হেসে বলেছিল, জীবনে এরকম আশ্চর্য অনেক কিছুই ঘটে। ঘটে বলেই জীবনটা এত বৈচিত্র্যময়, মিঃ সিং।

হরদেব সিং তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডাকের চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আরও কিছুক্ষণ ভেবেছিল লোকটির কথা। কেন যেন তারপর হঠাৎই মনে পড়েছিল 'আশ্রয়'-এর কথা, ভাবছিল, ফোন করে নিবেদিতার খবর নেবে কি না। নিবেদিতাকে নিয়ে দেবাদ্রি সান্যালের কথা ছিল নিউমার্কেটের যে-বিশেষ জায়গাটিতে চৈতালি হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার। সেখানে কী ঘটল, চৈতালি নিরুদ্দেশের কোনও ক্লু পাওয়া গেল কি না, নিবেদিতাকেই বা দেবাদ্রি কী জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিতে ইচ্ছে করছিল ভীষণ। ইদানীং এই একটা খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছে গার্গীর। কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে তার উৎসের খোঁজে মুহূর্তে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে যায়। জানতে ইচ্ছে হয় কেন হল এটা, কী তার সমাধান।

কী সত্যিই ঘটল সেটা জানতে নিবেদিতাকেই ফোন করবে, না কি পুলিশ ইনস্পেকটর দেবাদ্রি সান্যালকে, ভেবে কিছুক্ষণ দ্বিধায় টলোমলো।

ফোন করার আগেই অবশ্য চোখ আটকে গেল হাতের তেলোয় উঠে আসা একটি রঙিন আমন্ত্রণপত্রে। চিঠিটা পাঠিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এক ট্যুরিজম-সংস্থা। তারা বিভিন্ন কোম্পানি বা কর্পোরেট সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সস্ত্রীক (বা সস্বামী) মানালিতে যাওয়ার জন্য। মানালির এক বিলাসবহুল হোটেলের কনফারেন্স হলে সফল বিজনেস ম্যাগনেটরা তাঁদের জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি সবিস্তার বর্ণনা করবেন একে-একে। তার সঙ্গে ঢালাও পান-ভোজন। ওয়ার্কশপ শেষ হলে সেখান থেকে মারহি, রোটাংপাস পার হয়ে কেলং ঘুরিয়ে আনবে ওরা। যাওয়ার পথে লাহাঔল আর স্পিতি গ্লেসিয়ারের পথে একদিন একরাত্রি তাঁবুর মধ্যে রোমহর্ষক বাস। সেখানে চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। এহেন অভিজ্ঞতার জন্যে একটা মোটা টাকা দিতে হবে ট্যুরিজম সংস্থাটিকে। তবে রোমাঞ্চের তুলনায় টাকাটা নাকি অকিঞ্চিৎকর।

গার্গী কিছুক্ষণ উদাস হয়ে ভাবল, সায়নকে এই আমন্ত্রণপত্রটির কথা বলবে কি না। সায়ন জাগতিক ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন হলেও ভ্রমণের ব্যাপারে ভারী উৎসাহী। এরকমই একটা আমন্ত্রণ পেয়ে গত বছর তাকে নিয়ে গিয়েছিল গুজরাট। ক'দিন আগে বলছিল, সামনের সেপ্টেম্বরে তার ইউরোপ যাওয়ার আমন্ত্রণ আছে, গার্গী যাবে কি না. গার্গী অবশ্য যাবে কি যাবে না এমন দোলাচলে কিছুক্ষণ আবর্তিত হয়ে বলেছে, দুজনে একসঙ্গে গেলে কোম্পানি চলবে!

বহুক্ষণ ভাবনার রাজ্যে বসবাস করে হঠাৎই গার্গী টেলিফোনের বোতাম টিপে ধরল দেবাদ্রি সান্যালকে, হ্যালো, মিঃ সান্যাল, আপনার ইনভেস্টিগেশন কত দূর?

আজকাল গার্গী দেবাদ্রির সঙ্গে এরকমই সখ্যের স্বরে কথা বলে। কিছুটা হিউমারও থাকে তার গলায়, কিছুটা বস বস ভাব। আর আশ্চর্য, গার্গীর বুদ্ধিমত্তায়, বিশ্লেষণী ক্ষমতায়, পর্যবেক্ষণশক্তিতে দেবাদ্রি এতটাই ফ্যান হয়ে পড়েছে তার যে, এ ধরনের প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হয় না

দেবাদ্রির গলায় অবশ্য উল্লাস, পুরো রহস্যটা এখনও উদ্ধার করতে পারিনি, তবে জট খোলার অনেকগুলো প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতে এসেছে।

—তাই। গার্গী কেন যেন উদ্বিগ্ন হয়, কীরকম?

—তার আগে 'আশ্রয়' হোস্টেলে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বলি। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে-মেয়েটি নিখোঁজ হয়েছে, সেই চৈতালির একটা অভ্যেস ছিল রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে নেমে হাঁটা।

—হ্যাঁ, সেরকমই তো জানা গেল সেদিন।

—ওদেরই ঘরের আর একটি মেয়ে দিন দুয়েক আগে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে বসেছে বিছানায়।

গার্গী আশ্চর্য হল, কেন?

—উঠে বসে চেঁচাচ্ছিল, 'চৈতালি, চৈতালি' বলে।

গার্গীর কপালে ভাঁজ পড়ে, স্ট্রেঞ্জ!

—অবাক করবার ঘটনাই। মেয়েটির নাম অতসী। তার চিৎকার-চেঁচামেচিতে হোস্টেলের অন্য ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছিল তাদের ঘরে। অতসী তখনও থরথর করে কাঁপছে। বলছে,

তাদের ঘরের সামনে টানা বারান্দায় নাকি চৈতালি ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে সে নাকি স্পষ্ট দেখেছে তাকে।

—কী বলছেন, মিঃ সান্যাল?

—হ্যাঁ। অর্ফান হাউসের ভেতর রীতিমতো আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে এই ঘটনায়।

গার্গীর সেই মুহূর্তে মনে পড়ল অর্ফান হাউস শব্দটা একেবারেই পছন্দ করেন না ফাদার। দেবাদ্রি সান্যালকে কোনও এক সময় ফাদারের অপছন্দের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে এমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলল, অতসী সত্যিই দেখেছে তো দৃশ্যটা? না কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে? অনেক সময় এরকম হয় কারও কারও। স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, তারপর ভাবে সত্যি সত্যি ঘটেছে ঘটনাটা।

—না, তা নয়। অতসীর সঙ্গে একই ঘরে থাকে অনিন্দিতা নামে আর একটি মেয়ে। সেও নাকি উঠে দেখেছে ঘোমটা-ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত বারান্দা দিয়ে ছুটে সিঁড়ির দিকে গেল।

—ঘোমটায় ঢাকা? চৈতালি কি শাড়ি পরত? এখনকার মেয়েরা তো সালোয়ার-কামিজ কিংবা চুড়িদারই পরে বেশির ভাগ।

—চৈতালিও তাই পরে বলে হোস্টেলের অন্য ছেলেমেয়েরা জানিয়েছে। তবে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের শাড়ি পরাটা একেবারে অস্বাভাবিক তা তো নয়।

—তা নয়। কিন্তু অতসী কি চৈতালির মুখ দেখতে পেয়েছিল? ঘোমটায় ঢাকা ছিল মুখ, তাই তো বললেন আপনি?

—অতসী বলছে, চৈতালি। কিন্তু চৈতালি রাতের বেলা আসবেই বা কী করে! এ তো আর ভুতুড়ে ব্যাপার হতে পারে না। তবে আরও একটা মিস্টেরিয়াস ব্যাপার সে রাতে ঘটতে দেখেছে সবাই।

গার্গী কৌতূহলী, কীরকম মিস্টেরিয়াস?

—স্কুল-বিল্ডিং থেকে অফিস-বিল্ডিং প্রায় দেড়শো গজ দূরত্বে। অতসীর চেঁচামেচিতে হোস্টেলের সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়েছিল যার-যার ঘরের বাইরে। তাদের কেউ কেউ নাকি দেখেছে অফিস-বিল্ডিঙের দোতলায়—তত্ত্বাবধায়করা যেখানে থাকেন, সেখানে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা।

—সত্যিই?

—হ্যাঁ। কেউ কেউ আবার এমনও বলছে, স্কুল-বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে নেমে সেই ঘোমটা-পরা ছায়ামূর্তি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দ্রুত হেঁটে মিলিয়ে গেছে অফিস-বিল্ডিঙের ভেতর।

—তাই? গার্গী ক্রমশ বিস্মিত হচ্ছে।

—হ্যাঁ। কারও আবার ধারণা, ঘোমটা ঢাকা ছায়ামূর্তিটা চৈতালি নয়, সিস্টার নিবেদিতা।

সিস্টার নিবেদিতা শব্দ দুটো উচ্চারণ করার ভঙ্গিটা মোটেই ভাল ঠেকল না গার্গীর কানে। দেবাদ্রি সান্যাল পুলিশের লোক। তাদের কথা বলার ধরনটাই যেন বদলে যায় উর্দির খোলস গায়ে চাপালে। কিন্তু রাতের এই অদ্ভুত, আধিভৌতিক ঘটনাটাও নিবেদিতার ঘাড়ে গিয়ে কেন চাপাল তা অনুমান করার চেষ্টা করল গার্গী। তার কেন যেন মনে হচ্ছে যে-করেই হোক, চৈতালি অপহরণের সমস্ত দায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে নিবেদিতার ওপর। কেন তা বুঝে উঠতে পারল না। সে যতদূর নিবেদিতাকে চিনেছিল, তাতে নিবেদিতা কোনও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার মেয়ে নয়। তার ভেতরটা খুব পরিষ্কার। গার্গী এও জানে

যে, তার স্বামী তাকে নিতান্তই অন্যায়ভাবে ডিভোর্স করেছে। নিবেদিতা কোনও প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল তার বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়িতে থাকার পাত্রীও সে নয়। তাই শেষমেষ তার ঠিকানা থিতু হয়েছে 'আশ্রয়'-এর শিক্ষিকা হিসেবে।

ফাদার অর্থাৎ ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যালের কাছে সে-কারণেই সে যথেষ্টই কৃতজ্ঞ। সেই নিবেদিতা চার বছর এমন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকার পর এরকম একটা জঘন্য কাজ করবে তা নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

দেবদ্রির সঙ্গে কথা বলার ফুরসতেই গার্গীর মগজ তখন দ্রুত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল এই সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে তার কয়েক মাস জড়িত থাকার দিনগুলো। তখনও তো প্রতিষ্ঠানটির নাম 'আশ্রয়' হয়নি। ডঃ বটব্যাল তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরে রূপ দিতে শুরু করেছেন তাঁর এই মানসকন্যা প্রতিষ্ঠানটির রেখাচিত্র। তখন গার্গীরা দল বেঁধে চলে যেত নিকটবর্তী কোনও জেলায়। কোনও একটা হোটেল বা গেস্টহাউসে উঠে সারাদিন টহল দিত দরিদ্রতম গ্রামগুলিতে যেখানে কুচো কুচো ছেলেমেয়েগুলো বেড়ে উঠছে নিতান্ত অবহেলায়, অনাহারে, অনাদরে। বাচ্চাগুলোর দু'বেলা খাওয়ার জোগান দিতে হিমসিম তাদের গরিবস্য গরিব বাবা-মা। এই সব এলাকার দুঃস্থ বা অনাথ ছেলেমেয়েদের কীভাবে আরও একটু পরিশীলিত জীবনযাপন করানো যায় সেটাই ছিল রিসার্চ অ্যাকামেডির অন্যতম কাজ। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অনুরোধ করা হত গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করতে। অনেক বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ডঃ বটব্যালের, যাদের কাছে লিখলেই এসে পৌঁছত ব্যারেল ব্যারেল গুঁড়ো দুধ, কিংবা সয়াবিন জাতীয় খাবার। কোনও সংস্থা আবার পাঠিয়ে দিত শীতের কম্বল কিংবা বাচ্চাদের জামা-প্যান্ট-ফ্রক-ইজের। কাজটার মধ্যে গার্গীরা অনুভব করত একধরনের জব-স্যাটিসফেকশন। এর মধ্যে কিছু দুঃস্থ মেধাবী ছেলেমেয়েকে আবিষ্কার করলে তাদের বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করা হত কলকাতায় অ্যাকাডেমির বোর্ডিং-হাউসে নিখরচায় তাদের রাখতে রাজি আছে কি না। রাজি থাকলে তাদের বলা হত একটা ফর্ম পূরণ করতে।

গার্গী যতদিন অ্যাকাডেমির সঙ্গে জড়িত ছিল, বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে এভাবে আনতে পেরেছিল বোর্ডিং হাউসে। এভাবেই এক-একটা ট্যুরের পর তিন-চার জন করে নতুন খুদে অতিথি বাসিন্দা হত অ্যাকাডেমির। তাদের খাওয়া পরা থেকে লেখাপড়া সবই অ্যাকাডেমির দায়িত্ব। গার্গী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অব্যাহত ছিল সেই কাজ। খুদে বাসিন্দাদের সংখ্যা তখন দাঁড়িয়েছে একশোয়। হয়তো এইটেই ফাদারের ঈপ্সিত সংখ্যা। একশো সবুজ নিয়েই তাঁর 'আশ্রয়'-এর অভিধান।

এরকমই একবার তারা ট্যুরে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ। রাত দশটার লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর ফাঁকা কামরায় গভীর রাত পর্যন্ত জেগে হইহল্লোড় করতে করতে যখন ঘুমিয়েছিল—হয়তো রাত দুটোটুটো হবে। নামার কথা ছিল মুর্শিদাবাদ স্টেশনে যেখানে ট্রেন পৌঁছয় ভোর রাতে। অত রাত পর্যন্ত তুমুল আড্ডা, গান ইত্যাদির পর অনেকেরই আশঙ্কা ছিল গন্তব্যে পৌঁছনোর আগে জেগে উঠতে পারবে কিনা। সে সময় নিবেদিতাই বলেছিল, সে জানলার ধারে বসে থাকবে বাকি রাত। বহরমপুর পার হলেই ডেকে তুলে দেবে বাকিদের। বহরমপুর পর্যন্ত জেগে বসেও ছিল নিবেদিতা। কিন্তু কী আশ্চর্য কাণ্ড, বহরমপুর পেরনোর ঠিক পরেই হঠাৎ চোখ দুটো জুড়ে এসেছিল তার। হয়তো কয়েক মিনিট। একটু পরে চটকা ভাঙতেই সে আবিষ্কার করেছিল, মুর্শিদাবাদ স্টেশন সদ্য পার হয়ে যাচ্ছে লালগোলা

প্যাসেঞ্জার। একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলেছে বুঝতে পেরেই হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠেছিল সে, এ মা, কী হবে? এই গার্গী, এই তুলিকা, এই নীল—

ততক্ষণে বেশ গতি নিয়ে ফেলেছে ট্রেন। চেন টেনে থামাবে সে উপায়ও ছিল না। বাকি সবাই ঘুম ভেঙে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে নিবেদিতার দিকে। তার ওপর ভরসা করেই তো অন্যেরা জম্পেশ করে ঘুমিয়েছে। এখন সব অপকর্মের দায় যেন নিবেদিতারই। নিবেদিতা তার দায়িত্বহীনতার কথা ভেবে তখন হাউমাউ করে কাঁদছে। তাকে থামানোই যাচ্ছিল না তখন। পরের স্টেশন জিয়াগঞ্জে নেমে আবার বাস-টাস ধরে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসতে হয়েছিল তাদের। সে কী হ্যাপা! স্টেশনে তাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন আঙ্কেল তরফদার। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে কী বকা! নিবেদিতা সেবার কিছুতেই আর সহজ হতে পারেনি। তারপর থেকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ভীষণ ভীষণ সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিবেদিতা। সেই নিবেদিতার ওপরই কিনা এবার গোটা 'আশ্রয়', এমনকী পুলিশেরও সন্দেহের তর্জনী।

ফোনের মধ্যেই একটা দীর্ঘশ্বাস চালিয়ে দিয়ে গার্গী বলল, হঠাৎ আপনারা সবাই এক নিবেদিতাকে নিয়েই পড়লেন কেন, মিঃ সান্যাল? ওখানে তো আরও অনেক মিস্টেরিয়াস চরিত্র আছে। চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব মানুষ ওখানে থাকে, খায়, ঘুমোয়, কিন্তু জীবনযাপনে তারা ভারী বিচিত্র ধরনের।

দেবাদ্রি সান্যাল তার কথায় একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, সিস্টার নিবেদিতার ওপর সন্দেহ হওয়ার অনেকগুলো কারণ ঘটেছে ইতিমধ্যে। অব্যর্থ সব ক্লু।

—সত্যিই? গার্গীর গলায় তখনও সন্দেহ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম। চৈতালি নিখোঁজের তৃতীয় দিন নিবেদিতা সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বিলাস সান্যাল। নামটা শুনে নিশ্চয়ই চমকে উঠছেন আপনি?

গার্গী সত্যিই বিস্মিত হল, হঠাৎ তিনি কী কারণে?

—হ্যাঁ। শুধু সেই দিনই নয়। আমরা ফাদারের অফিসের ভিজিটরস বুক পরীক্ষা করে জানতে পেরেছি, গত দু'মাসের মধ্যে আরও তিনদিন বিলাস সান্যাল দেখা করেছেন সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। নিবেদিতাও স্বীকার করেছেন সেটা।

গার্গী এতক্ষণে যুক্তিহীন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। তবু কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে হঠাৎ বলল, তাতে কী প্রমাণ হয়?

দেবাদ্রি সান্যাল হো হো করে হাসলেন টেলিফোনের ও-প্রান্তে, আপনি কি বিলাস সান্যালের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অবগত?

গার্গী চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করল কয়েক বছর আগের নিবেদিতাকে। প্রায় ফর্সা রং, চোখ আয়ত, টিকলো নাক, কোঁকড়া চুলের মেয়েটি তার প্রাক্তন স্বামী সম্পর্কে কিছুই বলতে রাজি হত না কাউকে। গার্গী দু-একবার জানতে চাইলে শুধু বলত, সব বলা যাবে না। হি ইজ অ্যা ডেঞ্জারাস ক্রিয়েচার।

দেবাদ্রির প্রশ্ন শুনে গার্গীর চিন্তান্বিত স্বর, তেমন নয়।

—আপাতদৃষ্টিতে বিলাস সান্যাল একজন সফল বিজনেস ম্যাগনেট। সফ্টওয়্যারের ব্যবসা করেন, ভালই রোজগারপাতি। পাতিপুকুরে একটা বিশাল বাড়ি করেছেন। বিয়েও করেছেন আবার। কিন্তু তাঁর একটা সাইড-বিজনেস আছে বলে জনশ্রুতি।

—সাইড-বিজনেস?

—হ্যাঁ। চোরাকারবারীদের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন সম্পর্ক আছে বলে পুলিশের কাছে খবর। কিন্তু এখনও তেমন ক্লু নেই পুলিশের হাতে। আমি কালই জেনেছি সমস্ত ব্যাপারটা। থানাকে বলেছি, বিলাস সান্যাল সম্পর্কে আরও জোরদার ইনভেস্টিগেশন করতে। এতদিন পুলিশ অত গা করেনি যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের হাতে। কিন্তু সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর এখনও গোপন আঁতাত বহাল রয়েছে জানতে পারার পর ঘটনাটা দারুণ বাঁক নিয়েছে এই মুহূর্তে।

গার্গী কথাই বলতে পারল না।

—এখন তাহলে প্রশ্ন, কেন বিলাস সান্যাল এত ঘন ঘন দেখা করছে সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে!

## ॥ ৭ ॥

পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল যেভাবে এগোচ্ছেন চৈতালি-নিখোঁজ রহস্যের তদন্তে, আর তাঁর জাল গুটিয়ে আনছেন এক নিবেদিতাকেই দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে, তাতে গার্গী বুঝে গেল তাকেই এখন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে হবে এই রহস্য উন্মোচনে। নিবেদিতা সত্যিই এ-কাজে জড়িত কি না তা অবশ্য গার্গীর কাছে পরিষ্কার নয়। তবে এটাও দেখতে হবে কোনও নিরপরাধ ব্যক্তিকে যেন অকারণে হয়রানি না করে পুলিশ।

আসলে দেবাদ্রি সান্যালের তদন্তের ওপর কোনও দিনই আস্থা নেই গার্গীর। গত কয়েক বছরে পুলিশের পাশাপাশি যে ক'টা কেসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে হয়েছে তাকে, তাতে দেখেছে, কোনও বিষয়েই বেশি গভীরতায় ঢুকতে চায় না পুলিশ। হয়তো কার্যকারণ বোঝার মতো মেধাও নেই তাদের। খুবই সহজে ছাড়াতে চায় জটিল জটগুলো। তাতে প্রকৃত অপরাধী বেরিয়ে যায় নাগালের বাইরে। চার্জশিট তৈরি করতে এত দেরি করে যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে আদালতে খারিজ হয়ে যায় কেসগুলো। চার্জশিট যদিও বা একটা খাড়া করল, তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি এত দুর্বল যে, অপরাধী ধারে কাছে থাকলেও পুলিশের জালে তারা ধরা পড়ে না।

হোমিসাইড ব্রাঞ্চ থেকে মিসিং স্কোয়াড সেলে বদলি হয়ে এসেছেন দেবাদ্রি সান্যাল এই কেসটা তিনি ঠিকমতো মোকাবিলা করতে পারছেন না এরকম মনে হতে গার্গী চঞ্চল হয়ে উঠল ক্রমশ। তাহলে তাকে আরও একবার জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে 'আশ্রয়'-এর সঙ্গে তার অফিসের শতব্যস্ততার মধ্যেও।

তার টেবিলে পড়ে থাকা কয়েকটা জরুরি ফাইলে ডুবে থাকল কিছুক্ষণ। তার মধ্যেই গার্গী এও ঠিক করে ফেলল তাকে এখন ঘন ঘন যেতে হবে 'আশ্রয়'-এ—তার পুরনো কাজের জায়গাটিতে। পর পর দু দিন ওখানে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছে এখনও তার একটা বড় আসন পাতা আছে তাদের ভেতর। সে গেলে খুশি হয়ে ওঠে ওখানকার পুরনো সহকর্মীরা। নতুনরাও অখুশি হয় তাও নয়।

মনস্থির করেই টেবিলের বকেয়া কাজগুলো দ্রুত সেরে ফেলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেণ্ডিং ফাইলের ট্রে সাফ। ঘড়িতে এখন সাড়ে তিনটের মতো। রকম ঘণ্টাদুয়েক সময় যদি অফিস থেকে বার কবা যায় তাহলে একবার টুঁ দিয়ে আসতে পারে রহস্যে থম হয়ে থাকা কম্পাউণ্ডটার ভেতর।

ড্রাইভার রতনকে খবর পাঠাতে যাবে, হঠাৎই তার নজরে পড়ল, তার বিশাল টেবিলজোড়া ঝকঝকে কাচের নীচে একখণ্ড ছোট্ট চিরকুট কে যেন রেখে গেছে তার অনুপস্থিতিতে। চিরকুটে দু-লাইন কিতা হাইটেক পেনের সবুজ কালিতে ঃ

Spreading around you fame

You are twinkling like a gem.

কবিতাটা পড়ে সহসা কেমন একটা প্রতিক্রিয়া হল গার্গীর শরীরে। মনে হল কবিতার লক্ষ্যবস্তু সে-ই! তক্ষুনি চেম্বারের বাইরে বসে থাকা তার পি. এ. পিয়ালি সান্যালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, পিয়ালি, এই চিরকুটটা এখানে রাখল কে?

পিয়ালি একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল গার্গীর একরত্তি ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে। তাদের ম্যাডাম তো খুব সহজে রাগেন না। একটু গম্ভীর থাকেন বটে, কিন্তু মনটা দারুণ ভাল। তা ছাড়া তার সঙ্গে বেশ ভালই সম্পর্ক। মাঝে মধ্যেই কোনও একটা কাজ দিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলেন, 'দ্যাখো তো পিয়ালি. এটা কত তাড়াতাড়ি করে দিতে পারো।' সেই ম্যাডামের আজ রুষ্ট মুখ দেখে তাড়াতাড়ি বলল, ম্যাডাম, কাল আপনি যখন ছিলেন না, ওপর থেকে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার নেমে এসে আমাকে এটা দিয়ে বললেন, 'এটা ম্যাডামের কাচের নীচে রেখে দিন তো।'

অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার, মানে সায়ন্তন ব্যানার্জি! মাত্র কয়েক মাস হল এই কনসার্নে চাকরি নিয়ে এসেছেন বছর চল্লিশ বয়সের এই অফিসারটি। তাদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায়মজুমদার প্যারাডাইসের চাকবি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বহুদিন খালি পড়ে ছিল পদটি। কিছুকাল আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক ঝাড়াইবাছাই করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল সায়ন্তন ব্যানার্জিকে। আগে কোন একটা টেক্সটাইল কোম্পানিতে পাবলিসিটি ম্যানেজার হিসেবে তাঁর কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকায় নির্বাচন করা হয়েছিল তাঁকে। গার্গী শুনেছিল, ভদ্রলোক কবিতাটবিতা লেখেন। প্যারাডাইসের কয়েকটি বিজ্ঞাপনে নিজের কবিতা ক্যাপশন হিসেবে ব্যবহার করেছেন অ্যাড-কম্পানিকে দিয়ে। হঠাৎ তাঁর সেই প্রতিভা কিনা একেবারে খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টেবিলে!

ভুরুতে ভাঁজ ফেলল গার্গী, কিন্তু ব্যাপারটা আপাতত চেপে গেল। পরে কোনও এক সময় ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ব্যাপারটা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গার্গী তার অফিস-চত্বর ছেড়ে রওনা দিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড অভিমুখে। গার্গীর এই একটা বদভ্যাস। কোনও একটা ভাবনা হঠাৎ ভেতরে ছড়িয়ে গেলে সারাদিন সারা রাত সেটা পিন ফোটাতে থাকবে ক্রমাগত। নিবেদিতার ঘটনাটাও ঠিক তেমনই। নিবেদিতা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে এক ঘরে থাকার সুবাদে তার সম্পর্কে সে যতটুকু জেনেছিল, 'আশ্রয়'-এর অন্য কারও তা জানার কথা নয়। তবে তার স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে এইটুকুই শুধু বলত, কেন—তার খুঁটিনাটি কখনও বলেনি, বলতে চায়নি, শুধু বলত, 'তুই তো ডঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের গল্পটা পড়েছিস। সেরকমই কিছু একটা আঁচ করে নে।' সেই বিদঘুটে স্বামীর সঙ্গে তার আবার সম্পর্ক হয়েছে, তিনি আবার নিয়মিত

আসছেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক ঘটনা। নিবেদিতা যে রকম স্বভাবের মেয়ে তাতে যে-স্বামী তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই স্বামীর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে সেরকমটা হওয়ার কথা নয়। তবু অনেক অসম্ভবও তো সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন যোগাযোগ হল! এই যোগাযোগর সঙ্গে চৈতালির নিখোঁজ হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে কি না!

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এহেন বিশাল কম্পাউণ্ডটির গেটের কাছে পৌঁছে গার্গী বলল, গাড়িটা গেটের বাইরেই থাকুক, রতন।

গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে, নামার আগেই সামান্য একটা অঘটন ঘটতে দেখল গার্গী। তাদের পেছন থেকে একটা নীল অ্যাম্বাসাডার এসে হুস করে দাঁড়াল কিছুটা সামনেই। নীল রঙের গাড়িটা দেখেই গার্গীর মগজ সহসা টালমাটাল। চোখ ছানাবড়া করে দেখল, গাড়ির ভেতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন আর কেউ নয়, রণধীর তরফদার। হাতে দু-তিনটে বড় বড় প্যাকেট। নেমেই ধাঁ ধাঁ করে সেঁধিয়ে গেলেন ভেতরে।

তিনি নামতেই নীল অ্যাম্বাসাডারটা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সোজা।

নীল গাড়িটির নম্বরটা মনের কোণে টুকে নিতে একটুও ভুল হল না গার্গীর। মনে রাখা সহজও কারণ চারটে চারঅলা গাড়ি একবার দেখলে আরও একবার নজর পড়বেই সংখ্যাটার বিশেষত্বের জন্য।

রণধীর তরফদারের হাতের প্যাকেটগুলো বেশ ভারীই। বইতে কষ্টই হচ্ছে মোটাসোটা মানুষটার। অফিস-বিল্ডিং পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে কেন গেটের বাইরে গাড়িটা ছাড়লেন সেটা একটা গূঢ় প্রশ্ন যা গার্গীকে ভাবিত করল কিছুক্ষণ।

ভাবনাটা মাথার ভেতর কিছুক্ষণ গুলিয়ে সেও ঢুকে পড়ল কম্পাউণ্ডের ভেতর। তার গাড়িটা গেটের বাইরে থাকল অবশ্য ভিন্ন কারণে। তাকে গাড়ি চড়ে যাতায়াত করতে দেখলে পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। অন্য তত্ত্বাবধায়করা হয়তো ভাবতে পারে গার্গী এখন খুব উঁচু পোস্টে কাজ করে, খুব বড়লোক, খুব গুমর। তাতে হয়তো ওরা মন খুলে মিশতেও পারবে না গার্গীর সঙ্গে। কিন্তু রহস্যের জট ছাড়াতে গেলে তার এখন সবার সঙ্গে মিশে যাওয়াটা খুবই দরকার। ঠিক চার বছর আগের মতোই সহজ সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে হবে 'আশ্রয়'-এর সঙ্গে।

ছ'ফুট চওড়া পিচরাস্তাটা দুপুর রোদ্দুরে পার হয়ে যে মুহূর্তে পৌঁছেছে অফিস-বিল্ডিংটার সামনে, ভাবছে সোজা উঠে যাবে দোতলায় মেন্টর'স হাউসে, হঠাৎই তাঁর হালকা ক্রিমরঙের শাড়িটা বোধহয় চোখে পড়ে গেল ফাদারের। দেখেই তাঁর বিখ্যাত গমগমে গলায় হাঁক দিলেন, গার্গী, গার্গী,—গার্গী –

গার্গী ভেবেছিল ফাদারের সঙ্গে দেখা করবে ফেরার সময়। কিন্তু তা আর হল না। ফাদারের চেম্বারে ঢুকতেই সেই পরিচিত দৃশ্য। ফাদার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফোন করছেন কাকে যেন। ফোন করতে করতেই তাকে ডাক দিয়েছেন। তার টেবিলের এপাশে বসে আছেন বেশ ভারী ও লম্বা চেহারার এক না-বিদেশি না-এদেশি পাকাচুলো বয়স্ক ভদ্রলোক। এক মুখ সাদা চুল দাড়ি। চোখের মণির রং ধূসর। গায়ের রং একদা সাহেবদের মতোই ছিল, এখন রোদপোড়া তামা-তামা। মাথায় সবুজ ফেল্টের শেড্অলা টুপি। পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে ঢোলা সাদা গেঞ্জি। বেশ বর্ণাঢ্য চেহারা। কাঁধে রঙিন ব্যাগ।

এরকম বিচিত্র সব চেহারার লোক প্রায়শ ফাদারের কাছে এসে বসে আছেন। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। ফাদার একটা মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে আমানত রেখেছেন—তার সুদ থেকে প্রতিষ্ঠানের খরচ অনেকটা মিটলেও ফাদারকে আরও নির্ভর করতে হয় বাইরের সাহায্যের ওপর। কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত থাকার সুবাদে গার্গী এও জেনেছে এ-দেশে বহু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে নানা ধরনের সাহায্য পাওয়া যায় দুঃস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ বা লেখাপড়ার খরচ হিসেবে। ফাদার সেইসব সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তাদের লোকজনও দেখতে আসে এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলছে, তাঁরা যে টাকা দিচ্ছেন তা ঠিকঠাক ব্যয়িত হচ্ছে কি না। এই অদ্ভুত লোকটি নিশ্চয় সেরকমই—

গার্গীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফাদার হাত নেড়ে তাকে বসতে বললেন চেয়ারে। রং চঙে মানুষটার পাশে বসতে সামান্য অস্বস্তি হচ্ছেল গার্গীর। তবু বসতেই হল। ফাদার অবশ্য তখনই রিসিভারটা রেখে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন গার্গীর দিকে, গার্গী, ইনি হলেন আলফ্রেড ডিসুজা। অ্যাট ওয়ান টাইম উই ওয়্যার বোথ ইন ইংলণ্ড। আমি চলে এলেও উনি ওখানেই একটা বড় অর্গানাইজেশনে যুক্ত ছিলেন এতদিন। সম্প্রতি ফিরে এসেছেন ইণ্ডিয়াতে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখে উনি থ্রিলড। অ্যাণ্ড, মিঃ ডিসুজা, সি ইজ গার্গী, সি হ্যাড অ্যা ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার। আমাদের এখানেই ছিল—

আলফ্রেড ডিসুজা তৎক্ষণাৎ গার্গীর দিকে হ্যাণ্ডশেক করার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। গার্গী কিছু বোঝার আগেই তার ডান হাতটা বার দুই ঝাঁকিয়ে জড়ানো গলায় বললেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

ফাদার ততক্ষণে গার্গীর এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত থাকার কথা, এখন কত উঁচু পদে চাকরি করছে সেসব বৃত্তান্ত ফলাও করে বলে হাসি-হাসি মুখে বললেন, মিঃ ডিসুজা হ্যাজ ব্রট অ্যা গুড নিউজ ফর আশ্রয়।

আলফ্রেড ডিসুজা ততক্ষণে তাঁর কাঁধের লাল-নীলরঙের টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি মস্ত ঝোলা ব্যাগটি থেকে একটা চকচকে সোনালি কাগজে মোড়া টফি বার করে এগিয়ে দিলেন গার্গীর দিকে। কিছুটা হতভম্ব গার্গীকে নিতেই হল টফিটা। তার ডানহাতটা তখনও ডিসুজার রুক্ষ থাবার মতো হাতের চাপুনিতে কেমন করকর করছে।

ফাদার হেসে বললেন, ডিসুজার এই এক অভিনব আদবকায়দা। নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হলেই তার হাতে টফি বা ওরকম কিছু একটা দেবে। ওর ব্যাগে সবসময়ই কিছু না কিছু টুকিটাকি থাকবেই।

আলফ্রেড ডিসুজার সাদা ধবধবে গোঁফদাড়ির ভেতর তখন ফুটি-ফুটি হাসির ঝিলিক। ফাদার তার গমগমে স্বরে বলে চলেছেন তার বন্ধু আলফ্রেড ডিসুজা কী সুখবর নিয়ে এসেছেন 'আশ্রয়'-এর জন্য। সুখবরটির অবশ্য সত্যিই এই বিচিত্র মানুষটির মতোই চমকপ্রদ। আলফ্রেড ডিসুজার স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দিল্লিতে। অতঃপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আপাতত অবসর জীবন কাটাতে চলে এসেছেন কলকাতায়। তারও ইচ্ছে শেষ জীবনটা এরকমই কোনও সেবামূলক কাজ করে কাটাবেন। আপাতত তাঁর ইচ্ছে 'আশ্রয়'-এরই কোনও একটি মেয়ের ভরণপোষন ও লেখাপড়ার খরচ বহন করা। তিনি মাসে মাসে একটি করে চেক দিয়ে যাবেন 'আশ্রয়'-এর অ্যাকাউন্টে। এভাবেই দিয়ে যাবেন যতদিন না মেয়েটি বিবাহযোগ্য হয়। ততদিন কিন্তু

মেয়েটি জানবে না কে তার জন্য এত খরচ বহন করছেন। মেয়েটির বিয়ের বয়স হলে তার বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করবেন। শুধু একটাই শর্ত। তিনি দুই পুত্রের জনক হওয়া সত্ত্বেও তাদের একজন স্টেটসে একজন কানাডায় সেট্‌ল্‌ড। কেউই আর এ দেশে ফিরে না। এই বৃদ্ধ বয়সে আলফ্রেড ডিসুজা বা তার স্ত্রীকে দেখাশোনা করার কেউই নেই। অতএ তার একান্ত ইচ্ছে বিয়ের পর মেয়েটি তাদের শেষজীবনে একটু দেখাশোনা করবে। কি কোন মেয়েটির দায়িত্ব নেবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব তিনি ফাদারের ওপরই ন্যস্ত করেছেন

আলফ্রেড ডিসুজার এহেন অদ্ভুত পরিকল্পনা ভারী চমৎকৃত করল গার্গীকে। বিয়ের আ পর্যন্ত মেয়েটি জানবে না কে বহন করছেন তার যাবতীয় খরচখরচা।

আলফ্রেড ডিসুজার হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী অভিনন্দন জানাল, এরক একজন সহৃদয় মানুষের সঙ্গে আলাপিত হয়ে সত্যিই খুশি হলাম আজ। আশা করি আবা দেখা হবে।

অতঃপর ফাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গার্গী চলে এল অফিস-বিল্ডিঙের দোতলা যেখানে তার সহকর্মী বন্ধুরা হয়তে এতক্ষণে ফিরে এসেছে তাদের দৈনন্দিন শিক্ষকতা সে দোতলায় উঠেই যে-মস্ত বারান্দাটা সেখানে কাউকে না কাউকে দেখা যায়। আজ সুনসান। নিশ্চয়ই যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বারান্দা-সংলগ্ন পরপর তিনটি ঘর। তার প্রথমটিতে থাকে নির্মাল্য আর সমুদ্রনী পরেরটিতে বিশাখা-নিবেদিতা, তারপর তিয়াসা-তুলিকা। বারান্দাটা অতঃপর এল হয়ে ঘু গেছে বাঁয়ে। সেখানকার দুটি ঘরে থাকেন দুই আঙ্কেল রণধীর তরফদার ও চম্পক চট্টরা দুজনেই অবশ্য ঘরে থাকার ব্যাপারে অনিয়মিত। অরণি, সুছন্দা আর রূপায়ণ বাড়ি থে যাতায়াত করে এখানে।

সব ঘরেরই এখন দরজা বন্ধ। কোনওটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া, কোনওটা ভে থেকে। তবে একমাত্র নিবেদিতাকেই পাওয়া গেল ঘরে। বাকি সবাই কেউ স্কুল থে বেরিয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে গেছে কেনাকাটা করতে, কেউ বা স্কুলে অন্য কাজে ব্যস্ত।

গার্গী অবশ্য নিবেদিতাকেই চাইছিল একা। হয়তো নিবেদিতাও কোথাও ঘুরতে বেরু কিন্তু ক'দিন ধরে তার খুবই মন খারাপ। ঘর থেকে বেরুবার কথা ভাবতেই পারছে ন গার্গীকে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হল সামান্য। বলল, ভালই হয়েছে তুই এসেছিস।

গার্গী বসল তার বিছানায়। এর আগেও বহুবার এভাবেই মুখোমুখি বসে দু'জনে খু ধরত গল্পের ঝাঁপি। আজও ঝাঁপি নিয়েই এসেছে গার্গী, কিন্তু তার অভীষ্ট এখন ভিন্ন। আ তাকে এগোতে হবে সাবধানে। প্রথমেই যদি নিবেদিতার স্বামী সম্পর্কিত আলোচনা কর বসে তাহলে হয়তো সাবধান হয়ে যাবে নিবেদিতা। অতএব—

—আচ্ছা নিবেদিতা, যে নীল অ্যাম্বাসাডারটার কথা সবাই বলাবলি করছে, সে গাড়িট নম্বর কেউ বলতে পারবে? মানে যারা চোখে দেখেছে তারা কি গাড়িটার নম্বর খেয়া করেছিল?

নিবেদিতা বোধহয় এ ক'দিনে বহুজনের বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। হয়তো এ-প্রশ্নটা কেউ করেছে। হয়তো পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালই করেছে। তক্ষুনি জবাব দিল, অ দেখিনি, কিন্তু নির্মাল্য বলছে, গাড়িটার নম্বর তার মনে নেই, কিন্তু কিছু একটা বিশেষত্ব অ নম্বরটায়।

গার্গীর উত্তেজনা বেড়ে গেল হঠাৎ। যদি এই নীল অ্যাম্বাসাডারটাই সেই নী অ্যাম্বাসাডারটা হয়ে থাকে তাহলে আঙ্কেল রণধীর তরফদার এই গাড়িতে ফিরলেন কে

আর ফিরলেনই যদি, তাহলে কম্পাউণ্ডের ভেতর গাড়ি না ঢুকিয়ে গেটের বাইরে থেকে ছেড়ে দিলেন কেন!

ভাবনাটা নিবেদিতার সামনে প্রকাশ না করে হঠাৎ গার্গী বলল, জানিস, তরফদার আঙ্কেলকে আসতে দেখলাম দু-তিনটে ভারী প্যাকেট দু' হাতে ঝুলিয়ে। উনি কি আজ এখানেই থাকবেন।

রণধীর তরফদারের নাম শুনে নিবেদিতার মুখখানা হঠাৎ বেঁকে গেল রাগে। কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারল না, তারপর বলল, হি ইজ দ্য রুট অফ অল মিসচিভ্‌স্।

গার্গী নিরিখ করতে শুরু করল নিবেদিতার প্রতিক্রিয়া, শান্তকণ্ঠে বলল, কেন!

—উনিই তো আমার নামে এই সব আজে বাজে কথা রটাচ্ছেন। আর ফাদার ওঁর কথা শুনে সব দায় চাপাচ্ছেন আমার ঘাড়ে।

—তাতে আঙ্কেল তরফদারের কী লাভ?

নিবেদিতা গম্ভীর হয়ে বলল, লাভ আছে বলেই তো এ সব কথা রটাচ্ছেন।

গার্গী তবু নিশ্চিত হতে চাইল, কী লাভ?

নিবেদিতা ভাল করে একবার তাকাল গার্গীর দিকে। আঙ্কেল তরফদারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার আগে তাকে পাঁচবার ভাবতে হবে। অন্তত এই প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকতে হলে। তবু গার্গী তার এককালের একান্ত বন্ধু। তাকে বলাই যায় কথাটা। বলল, তোকে বলেই বলছি। সেদিন পুলিশ ইনস্পেক্টরের জেরাতেও কথাটা বলতে পারিনি! আঙ্কেল তরফদারের দু'জন ক্যাণ্ডিডেট আছে, যাদের উনি এখানে ঢোকাতে চাইছেন, কিন্তু ফাদার কিছুতেই তা মানতে রাজি হচ্ছেন না। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে কিছুদিন ধরে। ফাদার বলছেন, 'কোনও ভেকেন্সি নেই।' এই কারণেই আমার সঙ্গে নির্মাল্যর নামও জড়িয়ে দিচ্ছেন আঙ্কেল। এ ভাবে বদনাম দিয়ে দু'জনকে প্রতিষ্ঠান থেকে একসঙ্গে বিদায় করতে পারলেই আঙ্কেলের কার্যসিদ্ধি হয়। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া? গার্গী তখন নীল অ্যাম্বাসাডারের ব্যাপারটা মেলাতে চাইছে।

—তা ছাড়া আমার যদ্দুর ধারণা লোক লাগিয়ে উনিই চৈতালিকে পাচার করে দিয়েছেন কোথাও।

গার্গী চমকাল না, কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল, কেন?

—আসলে ফাদার এই প্রতিষ্ঠানে যেভাবে একাধিপত্য বজায় রেখেছেন, তা আঙ্কেল তরফদারের ঠিক সহ্য হচ্ছে না।

গার্গী কপালে ভাঁজ ফেলে ভাবল ব্যাপারটা। সে যখন এই প্রতিষ্ঠানে ছিল, সে সময়টা প্রতিষ্ঠানের সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস। তখনও ক্ষমতা নিয়ে কিংবা আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় ছিল না। আঙ্কেল তরফদার খুব খেটেছিলেন রিসার্চ অ্যাকাডেমিটিকে গড়ে তোলার কাজে। তত্ত্বাবধায়কদের নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরেছেন এ-জেলায় ও-জেলায়। তখন ভাবেনওনি ক্ষমতার এ হেন ভাগাভাগি নিয়ে। তারপর গত চার বছরের ইতিহাস কী ভাবে বাঁক নিয়েছে তা তো গার্গী জানে না।

বলল, তাই নাকি!

—হ্যাঁ, এখন আঙ্কেল তরফদার যদি কোনওক্রমে ফাদারকে ডিসক্রেডিট করতে পারেন, তাহলে ফাদার একটু দুর্বল হয়ে পড়বেন। আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন আঙ্কেলের ওপর। চৈতালি যেদিন নিখোঁজ হয়েছে, তারপর থেকে আঙ্কেল একেবারে সেঁটে আছেন ফাদারের সঙ্গে। কেবলই পরামর্শ দিয়ে চলেছেন এটা-ওটা।

যুক্তিগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। গার্গী তথ্যগুলো নেড়েচে দেখে এবার ঢুকতে চাইল নিবেদিতার স্বামী বিলাস সান্যালের এপিসোডটি তুলতে। কি তার আগেই তুলিকা আর তিয়াসা কোথায় গিয়েছিল, দু'জনে কলকল করতে করতে ফির বারান্দা দিয়ে, হঠাৎ গার্গীকে দেখে ঢুকে পড়ল নিবেদিতার ঘরে, তুই আবার!

গার্গী হেসে বলল, কেন, আসতে আপত্তি আছে? অনেকদিন পর এসে মনে হচ্ছে আ সেই জীবনটাই ফিরে পেয়েছি। বোস, তুলিকা।

তুলিকা তার ঘাড়-অবধি ছাঁটা ঝোপা চুল ঝাঁকিয়ে বলল, নো টাইম। নো টাইম। এক বসার সময় নেই। ফাদার এখন ডি'সুজার সঙ্গে সন্ধের ফ্লাইটে দিল্লি চলে যাচ্ছেন। আমা বললেন, কাল ভোরে মুম্বইয়ের ফ্লাইটে রিয়াকে তুলে দিতে। ভোর সাড়ে ছ'টায় আই সিক্স সেভেনটি সিক্স। অন্তত পৌনে চারটেয় না উঠলে প্লেন ধরতেই পারব না। অতএব

খবরগুলো গার্গীর কাছে কিছু নতুন কিছু পুরনো। ফাদার এখনই দিল্লি যাচ্ছেন তা এ আগে বলেননি গার্গীকে, বলার কথাও নয় অবশ্য। তবে রিয়া মুম্বই চলে যাবে তা শুনে আগেই। জিজ্ঞাসা করল, রিয়া একা যাবে?

—হ্যাঁ। শ্রীরাধা সান্তাক্রুজে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন রিয়াকে রিসিভ করার জন্য। রিয়া এখন ভি. ভি. আই. পি। আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে হয়তো পাত্তাই দেবে আমাদের, তুলিকা হাসতে হাসতে বলল।

তিয়াসা সাধারণত চুপচাপ থাকে। তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় খুবই কম। এখন তুলি কথা শুনে হাসল ফিক ফিক করে। তুলিকা অবশ্য বলল, নো টাইম, কিন্তু বেশ জমিয়ে ব গেল গার্গীর সঙ্গে আড্ডা মারতে। অতএব বিলাস সান্যাল প্রসঙ্গ তোলার আর সময়ই ে না গার্গী। রাত আটটা নাগাদ তাকে উঠতেই হল সায়নের কথা ভেবে।

পরদিন সকালে একটা অদ্ভুত ফোন পেল গার্গী, নিবেদিতার গলা, কেমন ফ্যাসফ করছে তার কণ্ঠস্বর, গার্গী, অতসীকে কাল রাতে কিডন্যাপ করা হয়েছে হোস্টেলের থেকেই। ফাদার ছিলেন না আশ্রয়-এ, দিল্লি গিয়েছিলেন রাতে। সেই সুযোগে—

## ॥ ৮ ॥

মিসিং স্কোয়াড সেলের অপ্রশস্ত, সাদামাঠা, আসবাবপত্রহীন চেম্বারটিতে বসে সার্কাসের এক ইহুদি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের। চারতলায় এহেন ছোট্ট বসার ঘরটি তেমন পছন্দের নয় তাঁর। চেয়ে থানার চাকরি অনেক আরামের। তার গ্ল্যামারও অনেক বেশি। এর আগে হোমিস ব্রাঞ্চে যখন ছিলেন সেই চাকরিটা অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খুনের কেসের গোয়েন্দা করা ঢের পৌরুষের। কিন্তু এখানে সারাক্ষণ হারানো মানুষ খুঁজে বেড়ানোর চাকরি যে সমস্যাবহুল, তেমনই এই চেম্বারে বসে থাকাটাও অস্বস্তিকর।

ইহুদি ভদ্রলোকের নাম পিটার জোসেফ। বয়স পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু চুল এক পাকেনি। চোখদুটো কটা রঙের, পুরু ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। খুবই ছটফট করছি

একমাত্র মেয়ে জেনি হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ায়। শুধু চলেই যায়নি, বাবার ন্মারি খুলে লাখ খানেক টাকাও নিয়ে গেছে শুধুমাত্র একখণ্ড চিরকুটে তা লিখে রেখে। জেনির বয়স একুশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। মেমসাহেবদের মতোই তার চেহারা, ়রের গঠন, গায়ের রং ইত্যাদি। পিটার জোসেফ তাঁর মেয়ের যে ছবিটি তুলে দিলেন াদ্রি সান্যালের হাতে, সেটি দেখে পোড়-খাওয়া ইনস্পেক্টর তারিফ করলেন মনে মনে। কম সুন্দরী মেয়ে এরকম ভজগটভাবে পালাল!

ইহুদি লোকটি চলে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত নিরিবিলি। ঠিক সে সময় পি বি এক্স ়ক একটা লাইন এল দেবাদ্রির, হ্যালো, আমি গার্গী চৌধুরি বলছি—

—হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরি, বলুন।

—আপনি কি খবর পেয়েছেন কাল রাতে আর একটি মেয়ে হঠাৎ নিপাত্তা 'আশ্রয়' ়ক?

দেবাদ্রির গলা স্তিমিত হয়ে এল, হ্যাঁ। ফার্স্ট আওয়ারেই ফোন পেয়েছিলাম। তার একটু ়ই ওখানকার ডেপুটি ডিরেক্টর চম্পক চট্টরাজ এসেছিলেন। মেয়েটির ফটো ও অন্যান্য রণ দিয়ে গেলেন একটা কাগজে লিখে। কিছুক্ষণ আগে ঘুরেও এসেছি ওখান থেকে।

—খুবই আশ্চর্য লাগছে। একই প্রতিষ্ঠান থেকে পর পর দুটো মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল!

দেবাদ্রি সান্যাল হাসলেন, তেমন আশ্চর্যের নয়, মিসেস চৌধুরি। আমি এখন যে সেলে স্টেড, সেখানে রোজই একটা-দুটো করে মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার খবর আসে। একটু ়গেই এক ইহুদি ভদ্রলোক এসেছিলেন কাঁচুমাচু মুখে। তাঁর মেয়ে গতকাল 'কলেজে যাচ্ছি' ন বইখাতা নিয়ে বেরিয়েছে, যাওয়ার সময়ে বাবার অলক্ষে তাঁর টেবিলে একটা চিরকুট ়খ গেছে, 'এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। চললাম। খোঁজ করার চেষ্টা কোরো না। থানে যাচ্ছি, সে অনেক দূরের পথ।'

ও-প্রান্তে চুপ করে রইল গার্গী। কিছুক্ষণ পর বলল, ওটা নিশ্চয়ই কোনও লাভ স্টোরি। ় সঙ্গে 'আশ্রয়' থেকে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে এক করে ফেলবেন না, মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি সান্যাল হা হা করে হেসে উঠে বললেন, লাভ স্টোরি। ভালই বলেছেন, মিসেস ধুরি, তবে এটা একটা ভিন্ন ধরনের লাভ। শুনলে আপনি একটু চমকে উঠবেন।

গার্গী ও-প্রান্তে আবারও চুপ করে থাকে। তারপর বলল, আপনি চেম্বারে আছেন?

—হ্যাঁ, আছিই তো।

—তা হলে আপনার ওখানে মিনিট দশেকের মধ্যেই যাচ্ছি। যদি আপনার চেম্বারের ়কেশনটা একটু বলে দেন।

-আপনি আসবেন! ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম, ম্যাডাম। তবে বুঝতেই পারছেন, ়লিশের আখড়া মানেই চোর-ডাকাত, ছিনতাইবাজ-খুনেদের ভিড়। খুব একটা স্বস্তি পাবেন এখানে এলে।

—তবু যাওয়াটা দরকার। কতকগুলো পয়েন্ট আলোচনা করতাম।

—ঠিক আছে, মিসেস চৌধুরি। আপনি তো গাড়িতেই আসবেন। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ন এন্ট্রান্স নিয়ে ঢুকেই ডানদিকের বড় বাড়িটা বড় সাহেবদের বসার আস্তানা। ওটাই মেন ল্ডিং। কিন্তু আপনি তাকাবেন বাঁ দিকে। দেখবেন, চারতলা বিশাল একটা বাড়ি। বাড়িটার ়চ লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে ঃ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। ভেতরে ঢুকেই নজরে পড়বে ়টা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে চারতলা পর্যন্ত। আপনি সিঁড়ি ভাঙতে থাকুন। দোতলায় উঠে

দেখবেন ডানদিকে হোমিসাইড ব্রাঞ্চ। তার টানা লম্বা বারান্দায় সার সার ক্রমশ মমি হয়ে উঠতে থাকা পড়ে আছে অভিভাবকহীন মোটরবাইক। বহুকাল পড়ে থাকার ফলে কোনওটাই আর ব্যবহারযোগ্য নেই। ওই বারান্দাটার একেবারে শেষ মাথাতেই হোমিসাইড ব্রাঞ্চ—যেখানে আমি কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিলাম। কিন্তু আপনি সোজা উঠে আসুন চারতলায়। সিঁড়িতে ওঠার পথে দেখবেন চিটিং সেল, অ্যান্টি-রাউডি সেল ইত্যাদি সব পিলে চমকানো শব্দ। আপনার অবশ্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চার তলায় উঠে বাঁদিকের বারান্দায় ঢুকে প্রথমে ঘরটিই মিসিং স্কোয়াড সেল। সেই ঘরটিতে বসেন কয়েকজন সাব-ইনস্পেক্টর। সেটি পেরিয়ে ভেতরে এলেই আমার বসার জায়গা।

দেবাদ্রি সান্যাল এমন নিখুঁতভাবে মিসিং স্কোয়াড সেলের পথনির্দেশ বাতলে দিয়েছে যে, এসপ্লানেড ইস্টের অফিস থেকে বেরিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ঢুকে তাঁকে খুঁজে বা করতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হল না গার্গীর। তাকে দেখেই দেবাদ্রি সান্যালের উষ্ণ অভ্যর্থনা বসুন মিসেস চৌধুরি, ইট'স মাই প্লেজার টু ওয়েলকাম ইউ—

গার্গী চেম্বারটির এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন দেখে দেবাদ্রি আবার বললেন, কী দেখছে মিসেস চৌধুরী? আমার বসার জায়গাটা তেমন ঝকঝকে নয়, তাই! আসলে থানার কোন পুলিশ ইনস্পেক্টর যতখানি রাজকীয়তায় চাকরি করেন, তিনিই আবার হেড কোয়ার্টারে ঢুকে এরকমই দীনদশা প্রাপ্ত হল। ওই যে কথায় বলে না, ইট'স বেটার টু বি দি হেড অব অ ক্যাট দ্যান টু বি দি টেল অব অ্যা লায়ন। আসলে এখানে এত উঁচু র‍্যাঙ্কের বাঘা-বাঘা পুলি অফিসার আছেন যে, ইনস্পেক্টর-সাব ইনস্পেক্টরদের দশা সিংহের লেজের মতো, যাই হোক বলুন চা, না কফি?

—নো, থ্যাঙ্কস। আপনার সময় বেশি নষ্ট করব না। জাস্ট ফর অ্যা ডিসকাশন চ এলাম। একটা এত বড় প্রতিষ্ঠান থেকে দু-দুটো মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল এটা সম্পর্কে ক ভাবছেন?

—ম্যাডাম, আপনি মাত্র দুটো মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল বলে এত ভাবছেন! এখানে য কাজ করতেন তা হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতেন। আমাদের এখানে মিসিং স্কোয়াড সে এত কিশোরী বা তরুণী নিখোঁজ হওয়ার খবর আসে যে, সুস্থির হয়ে বসাই যায় না চেয়ারে একটু আগে আপনাকে টেলিফোনে বললাম না, এক ইহুদি মেয়ের বাবা এসে কী রকম ভে পড়লেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে চলে যাওয়ায় —

গার্গী অবশ্য এই মুহূর্তে শুনতে চাইছিল না দেবাদ্রি সান্যালের এত সব খেজুরে গল্প কিন্তু দেবাদ্রি নাছোড়, আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ওই যে বললেন, লা স্টোরি। এও এক বিচিত্র প্রেমের গপ্পো। পার্ক সার্কাসের এই ইহুদি মেয়েটা কার স পালিয়েছে শুনবেন?

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না তা শুনে কী লাভ তার।

—পালিয়েছে আর একটা ইহুদি মেয়েকে নিয়ে।

গার্গীর কপালে ভাঁজ পড়ে, সে আবার কীরকম?

—লেসবিয়ান, লেসবিয়ান, বুঝলেন ম্যাডাম। দেশটা উচ্ছন্নে গেল একেবারে। এক আগেই আলিপুর সি আই ডি ডিপার্টমেন্টের মিসিং স্কোয়াড সেল থেকে আমার কাউন্টা পার্ট জানান, তাদের এলাকায়ও একই কেস। দুটো মেয়ে এভাবে—, বুঝলেন, ওই যে একটা সিনেমা হয়ে গেল না, এসব তারই প্রভাব!

এহেন অপ্রীতিকর একটা আলোচনা দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে চালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল গার্গীর। তবু দেবাদ্রির শেষ কথাটায় খটকা লাগল, সিনেমার দোষ দিচ্ছেন কেন! ছবি তৈরি হয় সমাজে যা ঘটছে তাকেই ভিত্তি করে। আসলে সমাজটাই বদলে যাচ্ছে হয়তো। তা এইসব নিখোঁজ মেয়েদের কি খুঁজে বার করতে পারছেন?

দেবাদ্রি হতাশ হয়ে বললেন, এদের কি চট করে খুঁজে পাওয়া যায়! বিশেষ করে যারা হাতে কিছু নগদ টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আনন্দফূর্তি করতে। ভারত ভ্রমণ করতে করতে টাকায় যখন টান পড়তে শুরু করে, অমনি ঘরের মেয়ে ফিরে আসে সুড়সুড় করে। এই তো মাস আগে এক মাঝবয়সী গৃহবধূ তার অর্ধেক বয়সী এক অবিবাহিত যুবককে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল স্বামীর লকার থেকে দেড় লাখ টাকা হাতিয়ে। স্বামী ব্যবসায়ী, ভোরে উঠে বেরিয়ে যান ব্যবসা দেখতে, ফেরেন মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায়। তার বউ তো পালাবেই। ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর ছবি নিয়ে। বার বার বলছিলেন, 'টিভি-তে একটু অ্যানাউন্স করিয়ে দিন।' বউয়ের ঠিকানা হিসেবে নিজের নামের সঙ্গে কোম্পানির নামটাও জুড়ে দিলেন। তা অ্যানাউন্সমেন্টও হল, কিন্তু বউ তবু ফেরে না। তাঁকে বলেছিলাম, দেড় লাখ টাকা। উড়োতে মাস ছয়েক লাগবে ওদের। তারপর আপনার বউ ফেরত পাবেন। তো বিশ্বাস করুন, বউ ফিরে পেয়ে ভারী খুশি। আমাকে এসে বউ ফেরত পাওয়ার কাহিনী বিবৃত করে বলে গেলেন, টিভিতে তাঁর বউয়ের ফটোর সঙ্গে স্বামীর নাম ঠিকানা ও কোম্পানির নাম অ্যানাউন্স করায় তাঁর ব্যবসার নাম এখন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। তাতে তাঁর প্রতিপত্তি হয়েছে ইদানীং।

দেবাদ্রির এইসব আষাঢ়ে গল্পে গার্গী যথাসম্ভব নিজেকে গম্ভীর রাখার চেষ্টা করছিল। দেবাদ্রি অবশ্য তাঁর গল্পে আগের মতোই মশগুল, জানেন, মিসেস চৌধুরি, এই ইন্দি ভদ্রলোককেও আমি বলে দিয়েছি, এক লাখ টাকা উড়োতে দুটো মেয়ের মাস চারেক লাগবে। তারপর ফিরে আসবে আপনার মেয়ে।

গার্গী চোখে বিস্ময় জ্বালিয়ে বলল, ব্যস, এই হল আপনার দাওয়াই?

—হ্যাঁ। যারা ফুর্তি করতে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে, তাদের পেছনে পুলিশের ছুটে বেড়ানো মানে অযথা সময় নষ্ট করা, আর সরকারি পয়সারও অপচয়।

—তা হলে চৈতালি আর অতসীর ভবিতব্যও কি একই? তারা তো আর ভারত ভ্রমণে বেরোয়নি। কিডন্যাপ করা হয়েছে।

-চৈতালিকে কিডন্যাপ করা হলেও অতসীকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

—কেন! গার্গীর কপালে আবার কোঁচের সমাহার। সে অবশ্য এখনও ঠিকঠাক জানেও না কীভাবে নিখোঁজ হয়েছে অতসী।

—দেখুন মিসেস চৌধুরী, অতসীকে তার ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু সে বেরিয়ে পালিয়ে গেল কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না 'আশ্রয়' কর্তৃপক্ষ।

অতসী নিখোঁজের ব্যাপারে গার্গী কিছুটা শুনেছিল নিবেদিতার কাছ থেকে, আর দেবাদ্রি যা শুনেছেন চম্পক চট্টরাজের মুখে, দুই কাহিনী খাপে খাপে জোড়া দিয়ে যে গল্পটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে তা এরকম। চৈতালি নিখোঁজ হওয়ার পর তাদের ঘরটিতে বাকি দুজন-অনিন্দিতা আর অতসী থাকত। চৈতালির খাটটি খালিই পড়ে আছে তার নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে। গতকাল রাতেও সেই ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল অতসী আর অনিন্দিতা। খুব

ভোরের দিকে অনিন্দিতা টয়লেটে যাওয়ার কারণে বিছানা থেকে উঠে দেখে ঘরের দরজা ভেজানো, ছিটকিনি লাগানো নেই। আর অতসীর বিছানা খালি। অনিন্দিতার প্রথমেই মনে হয় অতসী নিশ্চয়ই টয়লেটে গেছে। হোস্টেলের ঘরগুলির প্রতিটির সামনেই টানা লম্বা বারান্দা। বারান্দার শেষদিকে কমন টয়লেট। হেস্টেলের নিয়ম যে যখন রাতের বেলা বাইরে যাবে, অন্তত একজনকে ডেকে দিয়ে যাবে—কারণ দরজা খোলা রেখে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। তবে সে নিয়ম সবাই যে মানে তা নয়। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় এত গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে যে তাদের ডেকে-ডেকেও তোলা যায় না। কিংবা কেউ ভাবে আর একজনকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলার কী দরকার। পাঁচ-সাত মিনিট দরজা খোলা থাকলে কী আর হবে এত উঁচু পাঁচিল দেওয়া কম্পাউণ্ড যখন, কী আর বিপদ ঘটতে পারে! অনিন্দিতা টয়লেট থেকে ফিরে এসে হইচই করতেই জানা গেল অতসী নেই।

ঘটনাটা বিবৃত করে দেবাদ্রি সান্যাল বললেন, এ ক্ষেত্রে বোঝা মুশকিল অতসী চুপিচুপি দরজা খুলে পালিয়ে গেছে কারও সঙ্গে, না কি রাতের বেলা অপহরণ করা হল তাকে।

—কিন্তু তেমন কোনও ঘটনা কি ঘটেনি সে রাতে, বা কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না—যাকে আপনারা বলেন সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স?

দেবাদ্রি এতক্ষণে বললেন, হ্যাঁ, দুটো ঘটনার কথা আমি নোট করেছি। তার একটি তুলিকা নামের একজন তত্ত্বাবধায়ক কাল রাতে মেয়েদের হোস্টেলে শুয়েছিলেন, কারণ আজ ভোরেই রিয়াকে মুম্বইয়ের ফ্লাইটে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তার। মেন্টর'স হাউসে ঘুমোলে অত ভোরে উঠে মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে রিয়াকে ডাকাডাকি করা অসুবিধা হত তার পক্ষে।

গার্গী ঘটনাটা মনে মনে জরিপ করে বলল, তুলিকা রাতের বেলা কিছু ঘটতে দেখেনি বা শোনেনি?

—না। তুলিকাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রিয়াকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করে দিয়ে ফিরে এসেছে আটটা নাগাদ। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, হোস্টেলের বারান্দায় নাকি ফিসফাস শব্দ হচ্ছিল রাতে। কিন্তু অনেক রাত করে শুয়েছে, মাঝরাতে ফিসফাস শব্দ শুনেতে পেয়ে ভেবেছিল হয়তো মেয়েরা টয়লেটে যাতায়াত করছে। অন্যের ঘুম ভেঙে যাবে বলে জোরে কথা না বলে ফিসফিস করছিল। এখন হায় হায় করছে কেন আলসেমি ঝেড়ে ফেলে তখন ওঠেনি। ফাদার দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে এসে তাকে নির্ঘাত ছুটি করে দেবেন 'আশ্রয়' থেকে।

গার্গী অন্যমনস্কের মতো বলল, তা দিতে পারেন ফাদার। যা রাগী মানুষ!

—হ্যাঁ। চম্পক চট্টরাজও বলছিলেন, ফাদার ভীষণ হট্-টেম্পারড্। 'আশ্রয়' তাঁর প্রাণের প্রাণ। তাঁকে কেউ ঘটনাটা জানাতেই পারছিল না ভয়ে। শেষে তুলিকাই টেলিফোন করে ঘটনাটা জানিয়েছে আজ বেলা তিনটে নাগাদ। শুনে ফাদার নাকি কথাই বলতে পারছিলেন না কিছুক্ষণ। একটু পরে তুলিকাকে বলেছেন, তুমি মেয়েদের হোস্টেলে রাতে ঘুমিয়েছিলে, আর তোমার নাকের ডগা দিয়ে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে ছিপে করে তুলে নিয়ে গেল, তুমি জানতেই পারলে না! ওয়ার্থলেস'! কী করতে চাকরি করছ!

—কোথায় টেলিফোন করেছিল তুলিকা?

—ওই যে বাইরে কোথায় গেছেন। শুনলাম ওখানে অল ইণ্ডিয়া ডেসটিটিউট সোসাইটির কনভেনশন হচ্ছে। তাতে ফাদার পশ্চিমবঙ্গকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। তিনদিনের প্রোগ্রাম, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠানে এমন অঘটন শুনে কাল সকালেই ফিরে আসছেন কলকাতায়

গার্গী সায় দিল, ফিরে আসাই তো উচিত। পর পর দুটো মেয়ে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম তো নষ্ট! কিন্তু আপনি আর একটা ঘটনার কথা কী যেন বলছিলেন?

দেবাদ্রি হেসে বললেন, আঙ্কেল তরফদার নাকি রাতে উঠেছিলেন একবার। তিনি দেখেছেন নিবেদিতা বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে মধ্যরাতে।

গার্গী চমকে উঠে বলল, কী করছিল একা একা?

—আকাশের দিকে তাকিয়েছিল উদাস হয়ে।

গার্গী এবার আর চমকাল না। ওই অদ্ভুত রোগটা তারও তো আছে। সেও তো মধ্য রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অনেক দিনই ছাদে চলে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎ-হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা তার খুব ভাল বন্ধু ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর ভারী একা হয়ে গেছে গার্গী। বাবা তাকে প্রতিনিয়ত যেরকম সাহস জোগাতেন তাতে তখন বেঁচে থাকার একটা অন্য মানে ছিল। সায়ন বাবার সেই জায়গাটা নিতে পারেনি। 'আশ্রয়'-এ থাকতেও সে মাঝে মাঝে ওরকম মাঝরাতে আকাশের তারা গুনত। তখন তিন বছরও হয়নি বাবা মারা গেছেন। তার কাণ্ড দেখে নিবেদিতাও কখনও তার পাশে এসে দাঁড়াত একইভাবে। বলত, নক্ষত্র দেখলে বেশ সময় কেটে যায়, তাই না। হয়তো নিবেদিতা এখনও গার্গীর সেই রোগে সংক্রামিত।

কিছুক্ষণ অর্ধমনস্ক থেকে গার্গী হঠাৎ বলল, আঙ্কেল তরফদার ইজ অ্যা ভেরি মিস্টেরিয়াস পার্সন। আপনি কি তার সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর নিয়েছেন?

দেবাদ্রি কিছুটা হতচকিত হল। গার্গীর চোখের দিকে চোখ রেখে বুঝতে চাইল ব্যাপারটা। এই মহিলার চোখ বোধহয় এক্সরে-র মতো! তীক্ষ্ণ চোখে যখন তাকান কারও দিকে, তার ভেতরটাও যেন পড়ে ফেলতে পারেন অচিরেই। বললেন, মিঃ তরফদারকে তো আমার মনে হয় খুবই জেন্টলম্যান, যা দু-একদিন আলাপ হয়েছে 'আশ্রয়'-এ গিয়ে, তাতেই—

—দু-একদিন আলাপে কি একটা আস্ত মানুষকে চেনা যায়, মিঃ সান্যাল? আঙ্কেল তরফদারের 'আশ্রয়'-এ থাকার কথা রাতের বেলাও। তিনি কিন্তু ফাদারের কাছ থেকে স্পেশাল পারমিশান নিয়েছেন নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকবেন বলে! কিন্তু সেখানে থাকেন না, থাকেন অন্যত্র।

—কোথায়?

—তাঁর বউদির সঙ্গে। বউদি কিন্তু উইডো।

—বলেন কি মিসেস চৌধুরি? কেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নেই?

—সেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। যখন দুর্গাপুজোর সময় কেনাকাটা করেন একসঙ্গে দুটো দামি শাড়ি কেনেন। একটা নিজের স্ত্রীর জন্যে, আর একটা বিধবা বউদির জন্য। বউদিকে দেখলে অবশ্য আপনি বুঝতে পারবেন না তিনি বিধবা। খুব সাজগোজ করে থাকেন সবসময়। বেশ সুন্দরীও।

—খুব ইন্টারেস্টিং।

—আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, আঙ্কেল তরফদারের দাদা অপঘাতে মারা যান বিয়ের বছর খানেক পরেই। ট্রেনে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর দাদার দেহ। লোকে বলে আঙ্কেল তরফদারই দাদাকে খুন করে রেললাইনে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন বডিটা। বউদির কারণেই।

—কী সর্বনাশ!

—হ্যাঁ। কিপ ওয়াচ অন হিম। উনি সাধারণত 'আশ্রয়'-এ রাতের বেলা থাকেন না। কাল কিন্তু ছিলেন—এটা একটা গুরুত্বপূণ তথ্য।

দেবাদ্রি সান্যাল বললেন, কী বলতে চাইছেন, মিসেস চৌধুরি? রণধীব তরফদারই?

—এখন কোনও কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। 'আশ্রয়'-এর অনেক চরিত্রই ভারী রহস্যজনক। চৈতালিকে অপহরণ করা হল নিউ মার্কেট থেকে—সেটা বাইরের কোনও দুর্বৃত্তের কাজ হলেও হতে পারত। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আর একটি মেয়ে অন্তর্হিত হল 'আশ্রয়' থেকে, এটা বাইরেব দুর্বৃত্তের কাজ বলে আর নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই 'আশ্রয়'-এর ভেতরের কেউ জানত।

দেবাদ্রি সান্যাল এতক্ষণে তাঁর আদত জায়গায় ফিরে এলেন। মুচকি হেসে বললেন, তা হলে তো প্রথমেই সন্দেহ করতে হয় সিস্টার নিবেদিতাকে।

গার্গীর কণ্ঠে সামান্য উষ্মা, কেন?

—সিস্টার নিবেদিতা নিজের পরিচয় দেন ডিভোর্সি বলে। তাঁর ছেলেকে যে স্কুলে ভর্তি করেছেন, সেখানে ভর্তি ফর্মে 'নেম অফ দ্য ফাদাব' কলামে ফাদার শব্দটা কেটে লিখেছেন 'মাদার', তারপর সেখানে নিজের নাম বসিয়েছেন নিবেদিতা বাগচি অর্থাৎ তার কুমারী জীবনের নাম। কেন বাবার নামের পরিবর্তে মায়ের নাম লেখা যাবে না তা নিয়ে লড়াই করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে। শেষে কোর্টের রায় এনে বাধ্য করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে মায়ের নামে ছেলের পরিচয় লিখতে। অথচ 'আশ্রয়'-এর খাতায় তাঁর নাম নিবেদিতা সান্যাল। এদিকে প্রাক্তন স্বামী ঘন ঘন আসছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি দেখা করছেনও। কেন করছেন তা কারও কাছে বলতে রাজি নন। অথচ তাঁর স্বামী একজন চাম্পিয়ন চরিত্রের মানুষ। জানেন তাঁর সম্পর্কে?

গার্গী ইতস্তত করে বলল, সবটা জানি না।

—হি ইজ অ্যা মিনি চার্লস্ শোভরাজ। একদিন তার সম্পর্কে সব বলব। যা খবর পেয়েছি---

## ॥ ৯ ॥

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের নির্জন, ছিমছাম রাস্তা বরাবর দু'জনে হাঁটছিল একটু জোরেই। ঘড়িতে পৌনে এগারোটার মতো। এগারোটায় ক্লাস, তার অন্তত পনেরো মিনিট আগে টিচার্স রুমে গিয়ে ঢুকতে হবে এটাই ফাদারের আদেশ। আজ একটু দেরিই হয়ে গেল। দেরিটা অরণির জন্যেই। সুছন্দা রিনরিন করে বলছিল, তুমি একটা লেট লতিফ। ফাঁড়ির মোড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, জানো? পাক্কা পনেরো মিনিট। পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছে। ভাগ্যিস আকাশটা মেঘ করে আছে। নইলে মাথার চাঁদিও ফেটে চৌচির হত এতক্ষণে।

অরণি বোকা-বোকা হেসে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করছিল. কী করব, মায়ের বয়স হয়েছে। এখন রাঁধতে কষ্ট হয়। যতদিন বৃতা ছিল, টুকিটাকি ফাইফরমাস খেটে দিত মায়ের হুকুম মতো। বৃতার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখন তো মা নিলক্ষী একা। রোজ ভোরে উঠে

ঘরের কাজ করতে করতে বলেন, এবার বিয়েটা সেরে ফ্যাল, টুকুন। আমি আর কদ্দিন পারব!

'আশ্রয়'-এ তত্ত্বাবধায়কের চাকরি করতে করতে কবে যে অরণির সঙ্গে একটা মাখো-মাখো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সুছন্দার তা দু'জনের কেউই ঠিকঠাক মনে করতে পারে না। মাস ছয়েক আগে তারা খেয়াল করল, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে এসে একে অপরের জন্য অপেক্ষা করাটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে দু'জনের। অরণি আসে গড়িয়া থেকে। সেখানে অনেক দিনের একটা ছোট্ট পুরনো দোতলা বাড়িতে তার বসবাস। তার বাবা মারা গেছেন সেই কবে ছোটবেলায়। মা দুই ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। বৃতার হিল্লে হয়েছে, আর একজনের হিল্লে হলে বেঁচে যান। দ্বিতীয় হিল্লেটা যার করার কথা সেই সুছন্দা আসে বেলেঘাটা থেকে। তার বাবাব সেলসট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি। মধ্যবিত্ত পরিবার। আরও একটি বোন আছে সুছন্দার। অতএব বড মেয়ের বিয়ে দেওয়ার একটা তাড়া আছে তার বাবা-মায়ের। কিন্তু সুছন্দাই ঠিক বিয়ে কবতে ভরসা পাচ্ছে না অরণিকে। না পারার দু'দুটো কারণ।

প্রথম কারণটাই অবশ্য বারবার উল্লেখ করে সুছন্দা, তোমার মা তো ছেলের বিয়ে-বিয়ে করে অস্থির। কিন্তু বিয়ে করতে গেলে ইয়েরও দরকার। ইয়ে মানে টাকা। তুমি ষোলশ আমি ষোলশ, এই টাকায় কি দু'জনে বিয়ে কবা চলে এই বাজারে! তার ওপর এখন 'আশ্রয়' এমন টালমাটাল যে, কবে চাকরি আছে কবে নেই তা আমরা তো ছার আমাদের বাবাও জানেন না। বাবা অর্থে ফাদার।

পর পর দুটো কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তাদের প্রতিষ্ঠানে এখন একটা মৃদু ভয়, একটা শঙ্কা চারিয়ে গেছে। হঠাৎ চারদিকে ফিসফাস, গুঞ্জন চলছে যে হয়তো ফাদার বন্ধই করে দেবেন তাঁর এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা 'আশ্রয়'। কাল তুলিকা যখন এস. টি. ডি. করেছিল ফাদারকে, সব শুনে ফাদার নাকি মন্তব্য করেছিলেন, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে তো বন্ধ করে দিতে হবে 'আশ্রয়'।

অরণি অবশ্য শুধু 'আশ্রয়' থেকে পাওয়া মাইনের ওপর ভরসা করে বিয়েব কথা ভাবছে তা নয়। তার বাবা অকালপ্রয়াত হওয়ার আগে যে-ছোট্ট দোতলা বাড়িটি করে যেতে পেরেছিলেন, তার এক তলাটা ভাড়া দিয়ে হাজার তিনেক টাকা পাচ্ছে মাস-মাস। তার সঙ্গে 'আশ্রয়'-এর মাইনে যোগ করলে খুব একটা খারাপ অঙ্ক হবে না। কিন্তু 'আশ্রয়' যদি নিরাশ্রয় হয়ে ওঠে তাহলে অবশ্য চিন্তার কথা। সুছন্দার কথায় কিছুটা চিন্তিত দেখায় অরণিকে, তোমার কি মনে হয় 'আশ্রয়' বন্ধ করে দেবেন ফাদার?

—কী করে বলব! সুছন্দা ঠোঁট ওলটায়। সুছন্দা অবশ্য ক'মাস ধরে ভাবছিল বিয়েটা করেই ফেলবে, তবে আরও বছরখানেক পর। কিন্তু সম্প্রতি যে-দ্বিতীয় কারণটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, সেটা খুবই মারাত্মক। অরণির গলায় একটা কাটাকুটির চিহ্ন আছে, সেটা কীসের দাগ তা এতকাল জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মাস দুয়েক আগে যখন বিয়ের কথা ভেবে দু'জনে হিজিবিজি খেলছে ক্রমাগত, সে সময় গলার ওই খুঁতখুঁতে তারকাচিহ্নটি কী জিজ্ঞাসা করেছিল সুছন্দা।

অরণি হেসেছিল লঘু চালে, তেমন কিছু নয়, বছর পাঁচেক আগে একটা ছোট্ট অপারেশন হয়েছিল।

—কীসের অপারেশন! সুছন্দার ভেতর খুঁতখুঁতে ভাবটা দানা বাঁধতে থাকে।

—ভোকাল কর্ডে। ক্লাসিকাল শিখতে গিয়েছিলাম এক খ্যাতিমান ওস্তাদের কাছে। এমন তেড়েফুঁড়ে রেয়াজ করতে শুরু করেছিলাম যে ক্যানসার হয়ে গেল।

—ক্যানসার! সুছন্দা ছিটকে উঠেছিল।

—হ্যাঁ, অপারেশন করে ডাক্তার অবশ্য বলেছিলেন, 'তোমার পুনর্জন্ম হল'। তা সত্যিই পুনর্জন্ম হয়েছে। তারপর আর জ্বালায়নি ভোকাল কর্ডটা। তবে ক্ষতির মধ্যে ক্ষতি, গান এত প্রিয় ছিল আমার, সেটা শেষ।

দুরারোগ্য অসুখের নামটি শোনার পর থেকে বেশ কিছুদিন ঘুমোতে পারেনি সুছন্দা। মাস কয়েক আগেও যদি জানত অরণির গলার তারকাচিহ্নটির কারণ, তাহলে হয়তো এতখানি ন্যাওটা হত না অরণির। এখন পিছোবার পথও নেই। অরণিকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে।

কিন্তু তাকে বিয়ে করার ভাবনাটা বারবার নাড়াচাড়া করছে সুছন্দা। বাবা-মায়ের কাছে অরণির কথা অনেকবার বলেছে, নানা আলোচনাও করেছে। বছরখানেক পর তারা যে বিয়ে করবে তাও বলা হয়ে গেছে। কিন্তু অরণির শরীরে যে এরকম একটি প্রাণঘাতী অসুখ কোনও এক সময় বাসা বেঁধেছিল তা গত দু'মাসের মধ্যে বলতে পারেনি কেন যেন। অরণিকে যে ভালবাসে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন তার মনে চব্বিশ ক্যারেটের প্রশ্ন, অরণিকে বিয়ে করবে কি করবে না?

মিনিট পনেরো পা চালিয়ে হাঁটতেই 'আশ্রয়'-এর লতাপাতা ভরা গেট। অরণিরা দূর থেকে দেখল রূপায়ণ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। এ সময় রূপায়ণের তো টিচার্স রুম থেকে প্রেয়ারে যাওয়ার কথা! গেটে কেন!

—কী হল, স্কুল নেই আজ!

রূপায়ণ দুষ্টু দুষ্টু মুখে হাসল, আজ ফাদার একদম ক্ষেপু হয়ে এসেছে। মিটিং ডেকেছে সবাইকে ফায়ার করবে বলে।

'ক্ষেপু' 'এসেছে' 'ডেকেছে' শব্দগুলো ফাদার সম্পর্কে অবলীলায় উচ্চারণ করে রূপায়ণ। প্রতিদিনই এমন অভব্য শব্দ ফাদার বা তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অসংখ্যবার ব্যবহার করে রূপায়ণ, কিন্তু তার চাকরির কোনও ক্ষতিই হয় না। অথচ অরণিরা সারাক্ষণ চাকরির চিন্তায় কুঁকড়ে থাকে। সুছন্দা বহুদিন ধরেই তাকে বলছে অন্য চাকরির চেষ্টা করতে। এখানে তাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু অরণির ধারণা নিশ্চয়ই তাদের স্কুলটা কোনও একদিন সরকারের অনুমোদন পাবে, তখন নিশ্চয়ই স্কেলে মাইনে দেওয়া হবে তাদের। ফাদারের তো অনেক চেনাজানা, তাঁর 'কানেকশান'ও প্রচুর, উদ্দেশ্যও মহান, তবু কেন যে স্কুলটাকে রেকগ্নিশন করিয়ে আনতে পারছেন না! সেটাই টিচার'স রুমে তাদের আলোচনার গোপন বিষয়বস্তু।

—তাহলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সুছন্দার প্রশ্ন, ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে চাও না বলে?

—বলতে পার তোমাদের জন্যই। কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দেরি করে ফেলেছি। মিটিঙে যদি লেট করে ঢুকি, তা হলে প্রথমে আমাকেই ফায়ার করতে শুরু করবে ক্ষেপু। তার চেয়ে তোমাদের সঙ্গে ঢুকলে গালাগালটা তিন ভাগ হয়ে যাবে।

অরণি আর সুছন্দা নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে। আরও দ্রুত পেরতে থাকে সবুজ লনের বুকচেরা পিচপথ। ফাদার অবশ্য সত্যি খেপচুরিয়াস হয়ে আছেন। তাঁর চেম্বারে পা দিতে না দিতেই শুনল গমগমে স্বর। বৈশাখী গুমোটে ফাদারের চকচকে টাকে বিন্দু বিন্দু

ঘাম। ফোলা দুই গাল কাঁপছে কথা বলার তুবড়িতে। চোখ রক্তবর্ণ, রাগে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে দু-চোখের মণি। কাকে কতক্ষণ ফায়ার করেছেন কে জানে। এখন ঠেসে ধরেছেন তুলিকাকে, ইউ আর আ ফার্স্ট ক্লাস ইডিয়ট। পরশু রাতে তুমি মেয়েদের হোস্টেলে ঘুমোলে। ভোরে উঠতে হবে বলে তোমার তো রাতে ঘুম হওয়ার কথা নয়, আর তোমার চোখের সামনে দিয়ে কি না—

তুলিকার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন। ফাদার যে ফিরে এসে তাকে চিবিয়ে খাবেন তা তো জানতই সে।

রূপায়ণ, অরণি আর সুছন্দা নিঃশব্দে ফাদারের চেম্বারে ঢুকে পেছনদিকের চেয়ারে জায়গা করে নিয়েছে ততক্ষণে। বাকি ছয় তত্ত্বাবধায়ক আর দুই আঙ্কেল আগেই হাজির। সবারই মুখচোখ যুদ্ধে যাওয়ার আগে রক্ততিলক পরার মতো থমথমে।

ফাদার তখন গমগমে স্বরে বলে চলেছেন, গত চার বছরের মধ্যে এই কম্পাউণ্ডে একটাও অঘটন ঘটেনি। হঠাৎ পাঁচদিনের মধ্যে দু'দুটো মেয়ে উধাও হয়ে গেল এটা তো আমার বুকে হাতুড়ি দিয়ে দুটো পেরেক বসিয়ে দেওয়ার মতো! এর পর তো সভা সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। বড় মুখ করে অল ইণ্ডিয়া ডেসটিটিউটস্ কনভেনশনে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হয়ে, প্রথম দিনে একটা দীর্ঘ বক্তৃতাও দিয়ে ফেললাম এইসব দুঃস্থ, সহায়সম্বলহীন বালকবালিকাদের জীবন যাতে সবচেয়ে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। তাদের প্রতি দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই যেন নজর থাকে। তাদের মুখে কোনও একদিন তুলে দিতে পারি রুপোর চামচ। তাদের রক্তও একদিন হয়ে ওঠে নীল রক্ত। ঠিক সেই সময় কিনা টেলিফোনে আমাকে শুনতে হল আমারই প্রতিষ্ঠান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে আর একটা মেয়ে! টেলিফোনে খবরটা পেয়েই ওখানকার কাউকে কিছু না বলে শুধু একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি, সরি, আই অ্যাম ইনডিসপোজড অফ—

একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বলে আবার থামলেন ফাদার। আড়চোখে দেখে নিলেন তিন লেট-কামারের মুখগুলো। অরণি সুছন্দা আটাশে মেরে আছে তাদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু হওয়ার আশঙ্কায়। নিবেদিতার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন ফাদার। তার ঠিক পেছনের সিটেই বসে আছে নির্মাল্য। তার মুখের ওপর দু-একবার চোখ আছড়ে ফেলে ফাদার তাকালেন আঙ্কেল তরফদারের দিকে, তোমার ওপর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলাম, আর সেই রাতেই কি না —

আঙ্কেল তরফদার জানতেন এই প্রসঙ্গটা উঠবে মিটিঙে। ফাদারে ধমকে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। হয়তো কোনও একটা উত্তর প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই তুলিকা বলে উঠল, আঙ্কেল তরফদারের বিরুদ্ধে আমার আরও একটা অভিযোগ আছে। পরশু রাতে আমি মেন্টরস হাউসে ছিলাম না। আমাদের ঘরটায় একাই ছিল তিয়াসা। আঙ্কেল তরফদার কেন মাঝরাতে দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে তুলেছিলেন তিয়াসাকে?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে বহুতল বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার মতো ওলটপালট অবস্থা। জোড়া জোড়া চোখ আচম্বিতে ছুঁয়ে গেল রণধীর তরফদারের মুখ। পরশু রাতের ঘটনা, অথচ না-তুলিকা না-তিয়াসা কেউই অভিযোগটি এতক্ষণ ভাঙেনি কেন?

ফাদারের কানেও তোলা হল এতক্ষণে! তাও এহেন প্রকাশ্যে মিটিঙে।

আঙ্কেল তরফদারের গোল মুখখানা আরও রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। বললেন, ডেকেছিলাম, তার একটা কারণ ছিল নিশ্চয়ই।

—কী কারণ? ফাদার কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলেন সহসা।

—আসলে রিয়াকে নিয়ে অত ভোরে তুলিকা এয়ারপোর্টে যাবে, মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, অত ভোরে যাওয়ার সময় তুলিকা হয়তো রিয়ার প্লেনের টিকিটটা নিতেই ভুলে গেল। তাই তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই—

তুলিকা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, তাই আপনি মাঝরাতে তিয়াসাকে ডেকে তুলেছিলেন। আমি ও ঘরে রাতে শুইনি জেনেও

আঙ্কেল তরফদার কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বললেন, আসলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম তুমি মেয়েদের হোস্টেলে শুতে গিয়েছ।

তুলিকা তার মোটা করে কাজল লাগানো চোখ আরও বড় বড় করে বলল, সত্যি ভুলে গিয়েছিলেন, না ইচ্ছে করে ভুলে গিয়েছিলন, আঙ্কেল? আপনি জানেন তিয়াসা খুব নরমসরম মেয়ে। ও ভাবতেই পারেনি অত রাতে কেউ ওর দরজায় টোকা দেবে। এমনিতেই ও একা শুতে ভয় পায়। তবু বাধ্য হয়ে শুয়েছিল। আর সেই সুযোগে আপনি—

তিয়াসার শরীরটা খুব বড়সড়, প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির মতো লম্বা, তেমনই স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু সে ভীষণ ভীতু। তা ওর সহকর্মীরা সবাই জানে। তুলিকা যখন তর্জনী তুলে অভিযোগ করছিল, মাথা নিচু করে লজ্জাবতীমুখে বসেছিল তিয়াসা। তার পাশে বসা বিশাখা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, কই, এ সব কথা তুই তো আমাদের বলিসনি?

তিয়াসা তখন দ্বিগুণ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। মেয়েটা এতটাই ভীতু আর লাজুক তা যেন খাপ খায় না ওর অত বড় শরীরের সঙ্গে। আসলে ঘটনাটা একমাত্র তুলিকার কাছেই ব্যক্ত করেছিল সে। মোটেও চায়নি কথাটা পাঁচকান হোক। কিন্তু তুলিকা যে এভাবে প্রকাশ্য মিটিঙে প্রসঙ্গটা তুলবে, আঙ্কেল তরফদারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে তিয়াসার ঘটনাটিকেই প্রকাশ্যে এনে ফেলবে তা সে ভাবতেই পারেনি ঘুণাক্ষরে।

ফাদার প্রবল বিস্ময়ে তাকালেন তিয়াসার দিকে, ইজ ইট আ ফাক্ট?

তিয়াসার মুখটা আরও নিচু হতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এনি ইনডিসেন্ট প্রপোজাল?

তিয়াসা তখন মিশে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে। কোনওক্রমে মাথা নেড়ে জানাল, না।

আঙ্কেল তরফদারের মুখ লাল থেকে সাদা হয়ে উঠছে ক্রমশ, তুলিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, আই ডিড নট এক্সপেক্ট দিস ফ্রম ইউ। আমি রিয়ার প্লেনের টিকিটের জন্যই—

খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল রণধীর তরফদারের মুখ। কথাটা শেষ না করেই কেমন রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন সহসা। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ টানটান, হিম নীরবতা। মাথার ওপরে ঘূর্ণায়মান ফ্যানের ঝড়। তবু বৈশাখী গুমোটে দরদর করে ঘাম আরও তীব্র হয়ে ওঠে। থম মেরে আছে বাইরের রোদহীন দৃশ্যপটও।

কিন্তু রণধীর তরফদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনী তখনই নামল না। নিবেদিতা বোধহয় এরকমই একটি অনিবার্য মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। তার মুখটা ঈষৎ বঙ্কিম দেখাচ্ছিল চিলতে হাসির রেখা ফুটে ওঠার কারণে। সন্ধেতারার মতো জ্বলজ্বল করছিল চোখদুটো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আঙ্কেল তরফদার কিন্তু শুধু তিয়াসাকে জাগিয়েই ক্ষান্ত দেননি। অত রাতে মেন্টর'স হাউসের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্কুল বিল্ডিঙের দিকে গিয়েছিলেন।

—সে কী! ফাদার চমকে উঠলেন আবারও।

আঙ্কেল তরফদার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন আচমকা। মুখ থমথমে করে বসে রইলেন নিঃশব্দে।

ফাদার বোধহয় এতটা ভেবে উঠতে পারেননি। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন নিজের মনে। তারপর স্তম্ভিত হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ইজ ইট অ্যা ফ্যাক্ট, তরফদার?

রণধীর তরফদার ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। আসলে ঘুম ভাঙার পর থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছিল তুলিকা হয়তো শেষরাতে উঠে তাড়াহুড়োয় রিয়াব প্লেনের টিকিটটাই ভুলে ফেলে যাবে। তিয়াসা যখন বলল তুলিকা মেয়েদের হোস্টেলে ঘুমিয়েছে, তক্ষুনি মনে হল ওকে এখনই একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কথাটা।

ফাদার হতবাক হয়ে বললেন, মাঝরাতে তুমি তাই ছুটলে তুলিকাকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে? তারপর তুলিকাকে মনে করাতে পেরেছিলে?

রণধীর তরফদারকে খুবই হতাশ দেখাচ্ছিল, ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, না, স্কুল বিল্ডিঙের সিঁড়ির কাছে গিয়ে মনে হল এত রাতে সবাইকে ডাকাডাকি করে তোলাটা ঠিক হবে না।

ফাদারের কাছে রণধীর তরফদারের কথাগুলো ভারী অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। শুধু ফাদারের কাছেই নয়, তত্ত্বাবধায়করাও সবাই যেন মূক ও বধির হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। দু দুটি কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় যখন গোটা 'আশ্রয়' কম্পাউণ্ড থমথম করছে, সে সময় আঙ্কেল রণধীর তরফদারের এই মধ্যরাতের নাটকে গল্প চকিতে ঝাঁকিয়ে দিল সবাইকে। অরণি মুখ নিচু করে তার পাশে বসা সুছন্দাকে ফিসফিসিয়ে বলল, আঙ্কেল তরফদারকে আমার কোনও দিনই সুবিধের লোক বলে মনে হয় না।

সুছন্দা অবশ্য উত্তর দেয় না। তার অন্য পাশে বসা রূপায়ণ খুক খুক করে হেসে বলল, বেশ জমেছে কিন্তু ব্যাপারটা। দেখি ক্ষেপু এবার ক্যা করে?

ফাদার চোখ গোল্লা করে বললেন, তরফদার, এই প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু তোমার হাতেও গড়া।

ফাদারের স্বরে কী যেন ছিল, শুনে রণধীর তরফদার এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ফাদার। 'আশ্রয়'কে যে 'আশ্রয়' করে তুলতে বহু ঘাম রক্ত জল করতে হয়েছে আমাকেও। এত বছর পর এরকম একটা অভিযোগের আঙুল যে আমার দিকে উঠতে পারে তা আমার কাছে সত্যিই অবিশ্বাস্য। যাই হোক, অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুলিকা আর নিবেদিতার অভিযোগ অনুযায়ী আমিই এই অপকর্মের দায়ভাগী কি না। যদি তাই মনে করেন তাহলে আমি এই মুহূর্তে পদত্যাগ পত্র দিয়ে দেব। তারপর আইন যা বলবে তাই হবে। তবে আমি নিজেকে মনে করি নির্দোষ।

রণধীর তরফদার তাঁর বক্তব্য এমন জোর দিয়ে বললেন যে কিছুক্ষণের জন্য ঘরে আবার উৎকণ্ঠার স্তব্ধতা। ফাদারও থতমত খেয়ে গেলেন এমন আচমকা প্রতিরোধে। অন্যদের মুখচোখও নিরিখ করে নিলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে, কেসটা যখন আইন রক্ষকদের হাতে দেওয়া হয়েছে, তারাই সিদ্ধান্ত নিক কে দোষী।

—একজ্যাক্টলি। রণধীর তরফদার বললেন, বরং আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে ভবিষ্যতে আর এরকম অঘটন না ঘটে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে সবাইকে। আপনি নিরাপত্তার ব্যাপারটা আরও জোরদার করুন, ফাদার।

আঙ্কেল তরফদার খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু ফাদারের চেম্বারে বসা অনেকের কাছেই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না যেন। আঙ্কেল তরফদার আশ্রয়-এ রাতে থাকেন না সাধারণত। দশটা-পাঁচটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাঁর কাজকর্মের পরিধি। তবে দরকারমতো সকালেও চলে আসেন। কখনও থাকেন রাত পর্যন্ত। আবার প্রয়োজনে রাতও কাটান তাঁর নির্ধারিত ঘরটিতে।

ফাদার সায় দিয়ে বললেন, অন্তত একটা কাজ এখনই করা যায়। ছেলেমেয়ে হোস্টেলে একটা ঘর তো ফাঁকাই পড়ে আছে। তত্ত্বাবধায়করা পালা করে সপ্তাহে একবা ওখানে গিয়ে রাতে থাকবে। মাঝরাতে অন্তত একবার উঠে ঘুরে ঘারে দেখবে হোস্টেলে ঘরগুলো।

ন'জন তত্ত্বাবধায়কের কাছেই প্রস্তাবটা রীতিমতো অস্বস্তিকর। কিন্তু ফাদার যখন নিজে কথাটা বলেছেন, সেটাই 'আশ্রয়'-এর আইন। যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটা তোলা হয়েছে তা কারও পক্ষেই কোনও অজুহাত দেখানো অবান্তর।

অরণি চোখে ত্রাস মাখিয়ে সুছন্দার দিকে একবার তাকাল। ফাদার বহুদিন থেকে তাে বলছিলেন 'আশ্রয়'-এর মেন্টর'স হাউসে থাকার জন্য। দুই আঙ্কেলের জন্য দু'খানা ঘর বর আছে, কিন্তু কেউই থাকেন না সেখানে। অন্তত তার একখানা ঘর ব্যবহার করতে পা রূপায়ণ আর অরণি। যে-দুটি ঘরে নিবেদিতা-বিশাখা বা তুলিকা-তিয়াসা থাকে, তাদের কোনওটায় আর একটা চৌকি ঢুকিয়ে থেকে যেতে পারে সুছন্দা। কিন্তু তাদের তিনজ কেউই কথাটা কানে নিত না ঠিক। হয়তো এবার তাদের সবাইকে মেন্টর'স হাউসে থাক বাধ্যতামূলক হবে।

কিন্তু না, কোপটা পড়ল শুধু রূপায়ণের ওপর। সিদ্ধান্ত হল, যে-ছয় তত্ত্বাবধা মেন্টর'স হাউসে থাকে, তারা সপ্তাহের ছ'টা দিন পালা করে স্কুল-বিল্ডিঙের হোস্টেলে গি রাতে থাকবে। সপ্তম দিন থাকবে রূপায়ণ।

ফাদারের এই নতুন ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার দিন দুয়েক পরেই হঠাৎ মুম্বই থেকে যে এল শ্রীরাধার। শ্রীরাধা জানালেন, রিয়াকে তিনি একটি কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে তাকে দেখলে এখন আর চেনাই যাবে না। কিন্তু রিয়া জানিয়েছে সে খুব একা বোধ কর শ্রীরাধা তো সারাক্ষণ তাঁর শুটিং আর ফিল্ম সংক্রান্ত নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রিয়াকে সম দিতে পারছেন না। যদিও রাইও মুম্বই চলে আসে, তাহলে তারও সমস্ত দায়িত্ব নিতে শ্রীর রাজি। সুখী হবে রিয়াও।

কিন্তু রাই প্রস্তাবটা শুনেই নাকচ করে দিয়েছে। তাতে একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন ফাদা বলেছেন, কেন, ওর কি রাজরানি হতে ইচ্ছে করে না? ও মুম্বই গেলে আর একটা দু ছেলে কিংবা মেয়ের জায়গা হতে পারে 'আশ্রয়'-এ।

তাতে রাই খুবই বিপন্ন। সে মুম্বই যাবে, না যাবে না! না গেলে তার কোনও ক্ষতি হ না তো!

## ॥ ১০ ॥

চৈতালি অথবা অতসী কারও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল কি না, তদন্তে কতটা এগু পারলেন দেবাদ্রি সান্যাল তা জিজ্ঞাসা করবে কি না ভাবছে, সে সময় টেবিলের ঝকঝ কাচের নীচে ছোট্ট চিরকুটে আর একখণ্ড কবিতা আবিষ্কার করতে শরীরের ভেতরটা কে

যেন চিড়বিড় করে উঠল গার্গীর। হস্তাক্ষর সেই সায়ন্তন ব্যানার্জির। জড়ানো লিপিতে সবুজ হাইটেক পেনে ফুটে উঠেছে দু-পঙ্‌ক্তি প্রশস্তিসূচক কাব্য :

কথায় শাণিত মেধা, দুচোখে বিদ্যুৎ,
এ হেন নারীই তো শাসনে নিখুঁত।

বারদুয়েক পড়েই গার্গীর মনে হল তাদের নতুন অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। ভাবল, তার চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে দু-পঙ্‌ক্তি কাব্যের উত্তরে চার্জশিটের গন্ধ মাখা দু-পঙ্‌ক্তি বাক্য উপহার দেবে কি না লোকটিকে। পর মুহূর্তে মনে হল, না, এখনই অতটা উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। বরং চিরকুটটা ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়াটাই উপযুক্ত জবাব। তৎক্ষণাৎ ফনোকমে বোতাম টিপে ধরল অ্যাডভ্যার্টাইজিং ম্যানেজারকে, মিঃ ব্যানার্জি, আমার টেবিলে মাঝে মধ্যে আপনার মেসেজ রাখা থাকছে। হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটল—

ফনোকমের ও-প্রান্ত থেকে সায়ন্তন ব্যানার্জির স্বর, ম্যাডাম কি তাতে খুব রুষ্ট হয়েছেন আমার ওপর?

গার্গী উষ্মা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই আবার ও-প্রান্তে মোলায়েম গলা, ম্যাডাম, কাল আপনার চেম্বারে যখন গিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে বোধহয় এক অবাঙালি ডিস্ট্রিবিউটরকে আপনি ধমকাচ্ছিলেন সময়মতো কাজ না করায়। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছিলাম আপনি বেশি জোরে কথা বলছিলেন না, অথচ কথার মধ্যে এমন আশ্চর্য উইট, তার সঙ্গে স্যাটায়ার মেশাচ্ছিলেন সুকৌশলে, বলা যায় এমন সারকাসটিক্যালি কথা বলছিলেন যে, লোকটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছিল। অথচ একজন পুরুষ এক্সিকিউটিভ হলে হয়তো চেঁচিয়ে চিৎকার করে একশা করত। তখনই হঠাৎ ওই দু-লাইন কবিতা কীভাবে যেন ভর করল মাথায়! ভাবলাম এটা আমার বসকেই উপহার দেওয়া উচিত।

গার্গী যতটা রুষ্ট হবে ভেবেছিল, সায়ন্তন ব্যানার্জির কথার ম্যারপ্যাঁচে আর মোটেই প্রকাশ করতে পারল না তার ক্রোধ। এসব প্রশস্তি সূচক বাক্য তার পছন্দ নয়, তবু শুনতে খারাপও লাগে না। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে চলে এল অফিসের কথায়। পরের প্রোডাক্টের ক্যাম্পেন স্ট্রাটেজি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করার মধ্যেই তার টেবিলে এসে পৌঁছল একটা অদ্ভুত ধরনের কার্ড। হালকা সবুজরঙের কার্ডটা, আকারে ঠিক একটি অশ্বত্থ পাতা, তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা দর্শনার্থীর নাম : আলফ্রেড ডিসুজা। নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা, এ ট্রাভেলার ইন দিস ওয়ার্ল্ড।

কার্ডটির অদ্ভুত উপস্থাপনা কিছুক্ষণ সম্মোহিত করে ফেলল গার্গীকে। পরক্ষণে সবুজ কার্ডটির উত্তরে সবুজ সঙ্কেত দিতেই তার চেম্বারে সাড়ম্বরে প্রবেশ করলেন ফাদারের চেম্বারে আলাপ হওয়া সেই বিশালাকৃতির গোয়ানিজ লোকটি।

আগের দিনের মতো ডিসুজা তাঁর থাবার মতো দুই হাতে গার্গীর ডানহাত নিয়ে করমর্দন করতেই সেদিনকার বিশ্রী করকরে অনুভূতি। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না গোয়ানিজ লোকটির এ হেন উষ্ণতা থেকে কীভাবে পরবর্তীকালে রেহাই পাওয়া যাবে। এরকম সাহেবি কেতা তার পক্ষে হজম করা বেশ দুরূহ।

আজ আলফ্রেড ডিসুজার মাথায় নীল ফেল্টের শেডঅলা টুপি। গায়ে সবুজ তোয়ালে গেঞ্জি। পরনে যথারীতি নীল জিনসের ঢোলা প্যান্ট। কাঁধে রকমারি রঙিন ছিটকাপড় কেটে তৈরি ঢাউস ব্যাগ। গার্গীর টেবিলের উল্টো দিকে কালো রেক্সিন-আঁটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসলেন ধপ করে। কাঁধের ব্যাগ থেকে বার করলেন—না. আজ আর সোনালি কাগজে মোড়া টফি নয়, একটা ছোট্ট ডিজিটাল অ্যালার্ম-ক্লক। টেবিলঘড়ির চেয়ে আকারে অনেক ছোট। সেটা গার্গীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেলন, এবার স্টেট্‌স্ থেকে আসার সময় কয়েকটা এ-ধরনের অ্যালার্ম-ক্লক এনেছি। একে ওকে উপহার দিতে দিতে এইটেই শেষ অ্যান্ড পসিব্লি ইট ওয়াজ লেফ্‌ট্ ফর ইউ। আমার সর্বশেষ বান্ধবীর জন্য ছোট্ট প্রীতি উপহার

আলফ্রেড ডিসুজা কথা বলেন ইংরেজি আর হিন্দি চমৎকারভাবে মিশেল দিয়ে। গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না মাত্র একদিন আলাপ হওয়া গোয়ানিজ লোকটি হঠাৎ তার অফিসে কেনই বা এসেছেন, কেনই বা এরকম একটা দামি ডিজিটাল অ্যালার্ম-ক্লক দিতে চাইছে তাকে। অ্যালার্ম-ক্লকটা তার নেওয়া উচিত হবে কি না সেটাও প্রশ্ন।

ডিসুজা তখন গার্গীকে বোঝাচ্ছেন, ইটস অব ইমেনস্ ইউটিলিটি, ম্যাডাম, বহুৎ বড়িয়া চিজ। ধরুন আপনি তিনটের সময় কোনও মিটিঙে যেতে চান। মিনিট পনেরো আগে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে। সেভাবেই এই ঘড়িটাকে নির্দেশ দিয়ে রাখলে ঠিক পৌনে তিনটে পিঁক পিঁক শব্দ করতে থাকবে। কিংবা ভোরের ফ্লাইট ধরতে হবে এয়ার পোর্টে। চারটে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলে ঠিক ভোর চারটের সময় বাজতে থাকবে। বাজতেই থাকবে যতক্ষণ আপনি উঠে বসে ওকে থামিয়ে দেবেন বোতাম টিপে।

গার্গী লোকটির কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি জরিপ করছিল তীক্ষ্ণ চোখে। আপাতত তার সঙ্গে কী কথা বলবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সদ্য স্টেটস থেকে ফিরলেন?

—ইয়েস, ম্যাডাম। চব্বিশ বছরে লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে পড়েছিলাম কেয়ার অব ঈশ্বর এরকম ঠিকানার উদ্দেশে। তারপর সারা পৃথিবীটাই আমার ঘরবাড়ি হয়ে গেল একদিন।

বিচিত্র চেহারার লোকটির কটা রঙের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে মাপতে মাপতে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, কীরকম?

—তা হলে তো অনেক সাতকাহন বলতে হয়, ম্যাডাম। সে একদিন বলেছিলাম তোমাদের ফাদারকে। তখন অবশ্য ও ফাদার হয়নি, বটব্যাল ছিল। বলেছিলাম, ছোটবেলায় একটা ছোট্ট গ্লোব হাতে নিয়ে ভাবতাম, এত বড় পৃথিবীটাকে কী করে একটা ছোট্ট গ্লোবের মধ্যে রাখা গেছে। পরে দেখলাম সত্যিই গোটা পৃথিবী একটা ছোট্ট গ্লোবের মতোই। আজ আজ সকালে ইস্তানবুলে তো দুদিন পরেই অস্ট্রেলিয়া। পরের দিন মায়নামারের উদ্দেশে যাত্রা। তার একদিন পরেই চলে গিয়েছি কোনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রে।

গার্গীর মাথায় ঢুকছিল না গোয়ানিজ লোকটির আন্তর্জাতিক স্তরের বক্তৃতা। এমন কে প্রফেশনে ছিলেন যার ফলে তাকে চরকির মতো ছুটতে হয়েছে পৃথিবীর একোণে-ওকোণে গার্গী কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারল না। তার প্রশ্নের উত্তরে আলফ্রেড ডিসুজা যে কাহিনি শোনান তা যেমন আশ্চর্যের তেমনিই রোমাঞ্চকর।

খুব বেশি বিদ্যে পেটে ছিল ডিসুজার তা ঠিক নয়। দিল্লির কলেজে লেখাপড়া শেষ করে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির একটা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল প্রথমে ইংল্যাণ্ড, সেখান থেকে একটা ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে ইটালি। ইটালিতে চাকরি করতে করতে তার ভাগ্যের চাকা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিল সহসা। হঠাৎই একদিন রোমের পথে তার দশাসই চেহারাটা নজরে পড়ে গেল এক ধনকুবেরের। লোকটির নাম জ্যাকেয়াস লেডাক। কানাডা নিবাস, ইটালিতে এসেছে প্রমোদভ্রমণে।

জ্যাকোয়াস লেডাকের সঙ্গে আলফ্রেড ডিসুজার আলাপ হওয়াটা তার জীবনের একটা র্নিং পয়েন্ট। বছর আঠাশ বয়সের এমন তাগড়াই চেহারার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ানাডার ধনকুবের নিয়োগ করলেন তাঁর ইকনমিক অ্যাডভাইজার হিসেবে।

এ হেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টার চাকরির উদ্দেশ্য ধনকুবেরের খরচ কমানো নয়। কী করে কা আরও বেশি খরচ করে পৃথিবীর যাবতীয় সুখের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করা যায় ারই উপায় বার করা।

জ্যাকোয়াস লেডাকের বয়স তখন বাষট্টি, তাঁর সর্বশেষ স্ত্রীর বয়স বাইশ। ইতিমধ্যে মধ্যসাগরের বুকে একটা ছোট্ট দ্বীপ কিনে ফেলেছেন হনিমুন করবেন বলে।

সেই দ্বীপের চারদিকে নানান ডিজাইনের জেটি, এক-একটা জেটিতে এক-এক ধরনের লযান নোঙর করে থাকে লেডাক-দম্পতির প্রমোদভ্রমণের জন্য। কোনও জেটিতে বাহারি মাটর লঞ্চ, কোথাও সুদৃশ্য স্টিমার, কোথাও বা জেটগতিতে ছুটে যাওয়া রঙিন স্পিডবোট, কানও জেটিতে বড় বড় জাহাজ। সেই সব বর্ণাঢ্য জাহাজে লেডাক দম্পতি কখনও রওনা ন চাঁদনি রাতে ডেকের ওপর ঢেলখেল যায় জ্যোৎস্নার রুপোরঙের চাদর। সেই চাদরে ওতপ্রোত করে অসমবয়সী দুই নারীপুরুষ ভোগ করতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ানন্দ। তাদরে জন্য দ্বীপে এসে পৌঁছয় পৃথিবীর বিভিন্ন নামীদামি হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে শ্রেষ্ঠ আহার্য। তাদের গলা ভিজোনোর জন্য পৃথিবীর সেরা সেরা বার থেকে আনা হয় বিচিত্র ার স্বাদু সব মহার্ঘ পানীয়।

কখনও দ্বীপের জীবন একঘেয়ে হলে লেডাক-দম্পতি বেরিয়ে পড়েন বিশ্বপরিক্রমায়। াপের এখানে-ওখানে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট-বড় বিমান। তারই কোনওটায় চড়ে খনও তাঁরা পৌঁছান হাওয়াই দ্বীপের কোনও সুদৃশ্য হোটেলে। কখনও জাপানের সমুদ্রতীরে কানও বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি বাংলোবাড়িতে। কখনও অস্ট্রেলিয়ার কোনও পাহাড়ি পত্যকায় রাজপ্রাসাদ-প্রতিম অট্টালিকায়।

সেই ধনকুবেরের কাছে টাকা ছিল খোলামকুচির মতো সস্তা ও এলেবেলে। এত কোটি কাটি টাকা খরচ করার মতো বয়সও আর বেশি বাকি নেই, ভোগ করার মতো সামর্থ্যও নই শরীরে। অতএব তাঁর অভীষ্ট ছিল যত দ্রুত সম্ভব পৃথিবীর যাবতীয় আরাম শুষে নাও রীরে ও মনে।

এহেন ধনকুবেরের ভোগলালসার জীবনে সামিল হয়ে আলফ্রেড ডিসুজার জীবনটাও গল আমূল বদলে। যাকে বলে রিফ্লেক্সড গ্লোরি সেরকমই রাশি রাশি অর্থের আঁচ সারাক্ষণ য়ে থাকে ডিসুজাকেও। কোটি কোটি টাকার এক কপর্দকও তার নিজস্ব নয়, কিন্তু সে দক্ষ াতে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই বেহিসেবি অর্থের পাহাড়। তার জীবনও হয়ে উঠল বিলাসবহুল। সও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আহার্য কিংবা শ্রেষ্ঠ পানীয়ের স্বাদে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল অচিরেই।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরের সঙ্গে বিলাসবহুল জাহাজে এভাবে ঘুরে বেড়ানো মুদ্রের বুকে, কিংবা ব্যক্তিগত বিমানে চড়ে বিশ্বের সেরা-সেরা বর্ণাঢ্য ল্যাণ্ডস্কেপের মানচিত্রে ঐশ্বর্যবহুল জীবন যাপন—সব কিছুই ছিল ডিসুজার কাছে অভাবনীয়, অকল্পনীয়। জ্যাকোয়াস লেডাকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তার অভিজ্ঞতাও খুব কম হল না। কিন্তু সেই সুখের জীবনের স্থায়িত্ব হল মাত্র কয়েক বছর। ষাটোর্ধ্ব ধনকুবের খুব দ্রুত অপর্যাপ্ত সুখ কুড়োতে গিয়ে পাড়ি দিলেন ধরাধামের বাইরে।

আলফ্রেড ডিসুজাও অতঃপর ফিরে এল তার আগের জীবনে। পার্থক্য হল এই যে, তার ব্যাঙ্কের চাকরিটি তখন আর নেই। কিন্তু কয়েক বছরে বিশাল অঙ্কের বেতন জমে জমে তার অ্যাকাউন্টেও তখন অনেক টাকা।

বহুক্ষণ তাঁর জীবনচরিত গার্গীর কাছে বিবৃত করে পাকা দাড়িগোঁফের ভেতর রহস্য ছড়িয়ে হাসলেন, ম্যাডাম, চরম সুখ উপভোগ করা কাকে বলে তাও যেমন জানতাম, তেমন বুঝতে শিখলাম সে-জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ হয়ে কাটাতে কেমন লাগে।

—তারপর! গার্গীও রুদ্ধশ্বাস হয়, আর চাকরি পাননি?

—হ্যাঁ, তারপর আবার ফিরে এলাম ইংলণ্ডে, যেখানে প্রথম শুরু করেছিলাম চাকরির জীবন। একটা কিছু জুটেও গেল অবশ্য। একজন অভিজ্ঞ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট একেবারে বসে থাকবে তা তো হতে পারে না। তার উপর জ্যাকোয়াস লেডাকের মতো একজন মালটি মিলিওনেয়াবের সঙ্গে আটটা বছর বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা। অতএব বৃটেনের একটা ব্যাঙ্কের অ্যাডভাইজারের চাকরি পেয়ে গেলাম।

কথাটা এমন হালকাভাবে বললেন ডিসুজা যেন ব্যাঙ্কের ক্লার্কের চাকরি

গার্গী হেসে বলল, তার মানে একলাফে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলেন ব্যাঙ্কের চাকরিতে।

–হ্যাঁ। প্রায় মগডালে। বেশ অনেকগুলো বছর নানান আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাটানোর মধ্যে একদিন আলাপ হল ইন্দ্রনীল বটব্যালের সঙ্গে। সেও ধনীর ছেলে। ছাত্র হিসেবেও ব্রিলিয়ান্ট ডক্টরেট করে কিছুদিন থাকল ওখানে। এ-প্রতিষ্ঠানে ও-প্রতিষ্ঠানে সমাজ-সংস্কার নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াল ক'বছর। ইচ্ছে করলে বড় চাকরিও করতে পারত। অথবা সারা জীবন ওখানে স্রেফ বসে খেতে পারত পায়ের ওপর পা তুলে। কিন্তু হঠাৎ মাথায় ভূত চাপতে চলে এল ইণ্ডিয়ায়। তার ইংলণ্ড থেকে চলে আসার সময় ভেবেছিলাম দ্যাট জেন্টলম্যান ইজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট হিজ কেরিয়ার। এতকাল পর ইণ্ডিয়ায় ফিরে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ হতে বুঝলাম এখানে আরও বড কেরিয়ার অপেক্ষা করে ছিল তার জন্য। কলকাতায় হেলায় পড়ে থাকা সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছে এক আশ্চর্য পৃথিবী।

গার্গী হেসে বলল, আমরাও তাই বলাবলি করতাম তখন। প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তোলার জন্য পাগলের মতো কী পরিশ্রমই না করেছেন ফাদার।

—করেছেন মানে! এখনও করছেন। আমি তো ক'মাস ধরে দেখছি, বটব্যালের জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ডই তার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ।

গার্গী লজ্জিত হয়, ঠিকই বলেছেন, মিঃ ডিসুজা। আমি তো বহুকাল আর ওখানকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উঠতে পারিনি। এতকাল পর যা দু-একদিন অল্পসময়ের জন্য গেলাম তাতেই বুঝেছি এখনও আশ্রয়ই তাঁর হৃৎপিণ্ড।

—একজ্যাক্টলি। আর বলতে কি, ম্যাডাম. আই হ্যাভ বিন ইনস্পায়ার্ড উইথ হিজ একজাম্পল। আমিও ঠিক করেছি যে ক'বছর বেঁচে থাকব, এরকমই একটা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবন কাটাব।

—ইউ মিন আশ্রয়-এর সঙ্গেই যুক্ত থাকবেন?

—নো, নো, ম্যাডাম। আমি সব সময় নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমিও একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছি। এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে সারাক্ষণ একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ চলবে।

গার্গী অবাক হয়, তাই? কীরকম?

আলফ্রেড ডিসুজা তাঁর ঢাউস ব্যাগটি থেকে এবার বার করলেন একতাড়া কাগজ। সেগুলি গার্গীর সামনে মেলে ধরে বোঝাতে শুরু করলেন তাঁর প্রকল্পের সামান্য বিবরণ। কলকাতার শহর-এলাকার একটু বাইরে পঁচিশ একরের মতো জমি বায়না করেছেন মাস খানেক আগে। সেই সঙ্গে তৈরি করেছেন তাঁর প্রকল্পের রূপরেখা। সেখানে গড়ে তুলবেন এমন সব শিল্প যার চাহিদা শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও যথেষ্ট। তবে বেশির ভাগ স্কিমই কুটির শিল্প ধরনের যেখানে কাজের অগ্রাধিকার পাবে এ দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, স্বামী-পরিত্যক্তা বিধবা মহিলারা। সারা জীবন দেশ-বিদেশের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ানোর পর আলফ্রেড ডিসুজা দেশে ফিরে এসে বুঝতে পারছেন এ-দেশের মহিলারা সত্যিই অবহেলিত। কি গ্রামে কি শহরে মহিলাদের কথা ভাবার মানুষ খুব বেশি নেই। যেন তাদের জন্মই হয়েছে রান্নাঘরে অন্তরীণ থাকা আর ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্যে। এই কারণেই ডিসুজা অন্তত দশ হাজার মহিলার কাজের সংস্থান করতে চান তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পে।

—দশ হাজার! গার্গী অবাক হল কম নয়।

—হ্যাঁ। এটাই হবে আমার জীবনের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড। ব্যাঙ্কের কাছে এই প্রকল্পের একটা কপি পেশ করেছি গত মাসে। মাত্র দশ কোটি টাকার প্রকল্প। অবশ্যই লোন হিসেবে নেব আটকোটা। তাব সঙ্গে আমার দু'কোটি দিয়ে যে প্রজেক্টটা গড়তে চাই, তা হবে এ দেশের মাটিতে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

গার্গী ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল এই বিচিত্র মানুষটিব জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের চেহাবা অনুধাবন করে। সত্যিই এ দেশে বড় কাজ করার মানুষ খুব কম। কথা বলার লোকই বেশি।

—ম্যাডাম, ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাব পরীক্ষা করে ভাবী খুশি। টাকাটা মঞ্জুরও করবেন আশ্বাস দিয়েছেন কর্মকর্তারা। তবে একটা শর্ত আরোপ করেছেন-- খুব সহজ শর্ত দিও, বলেছেন এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যে বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠন কবা হবে, তার দুই-তৃতীয়াংশ ডিরেক্টর হবেন মহিলা। আমি ইতিমধ্যে আমার নামীদামি বান্ধবীদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছি, তাঁরা সবাই সানন্দে রাজি হয়েছেন বোর্ডের ডিরেক্টর হতে। টব্যালের এক বন্ধু আগে ডি আই জি ছিলেন, এখন জয়েন্ট সি পি, তিনি পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন বোর্ডে থাকতে। তবে সেরকম মহিলা ডিরেক্টর পাওয়া শক্ত, এমন মহিলা যাঁরা তাদের কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল, আবার ব্যক্তিত্বও আছে। যাঁরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যথাযথ বক্তব্য রাখতে পারেন বোর্ডের মিটিঙে। আমি আপনার সেদিনকার অনুষ্ঠান পরিচালনা দেখে, বক্তব্য শুনে, তারপর আপনার কর্মকাণ্ডের নমুনা শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনি আমার এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। আপনার অনুমতি পেলে আই মে ইনক্লিউড ইয়োর নেম ইন দ্য লিস্ট অব ডিরেক্টরস।

গার্গী সমস্ত ঘটনা পরম্পরা একবার ঝালিয়ে নিল মগজের সূক্ষ্ম তন্তুগুলোর ভেতর। একটা শিহরনও বোধ করল এত বড় একটা প্রকল্পের শরিক হতে পারবে বলে। তবু অনেকগুলো কিন্তু এবং যদি ঘুরঘুর করতে থাকে মাথার ভেতর।

হ্যাঁ কিংবা না বলার আগেই আলফ্রেড ডিসুজা একটা কাগজ মেলে ধরলেন তার সামনে যাতে এক থেকে এগারো পর্যন্ত বিভিন্ন নাম টাইপ করা, তাদের পাশে পাশে এখনও পর্যন্ত সই করেছেন জনা সাতেক। সাতজনের মধ্যে জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার বিবেক ভরদ্বাজের

নাম ও পাশে তাঁর জটিল স্বাক্ষর। গার্গী আশ্চর্য হয়ে দেখল, তালিকার ছ'নম্বরে গা
চৌধুরির নাম টাইপ করা, পাশে স্বাক্ষরের জায়গাটা খালি।

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, আমার নাম আপনি তো আগেই লিখে ফেলেছেন দেখ

—হ্যাঁ, আলফ্রেড ডিসুজার সাদা দাড়িগোঁফের মাঝখানে মিষ্টি হাসির উদগীরণ,
সাতজন ইতিমধ্যেই সই করেছেন, তাদের নিয়ে একটা ছোট্ট মিটিং করেছি কাল। সেখানে
আপনার নাম আমি প্রস্তাব করেছি, আপনার গুণাবলি ও কর্মদক্ষতার কথা বর্ণনা করেছি। শু
সমস্বরে সবাই বলেছেন, হ্যাঁ, এরকম একজন মহিলা এই প্রতিষ্ঠানে থাকার পক্ষে অবশ
আদর্শ। এখন আপনি যদি এখানে আপনার মহামূল্য স্বাক্ষরটি দেন তো আমরা কৃতার্থ হ

গার্গী দু-এক মুহূর্ত ভাবনার জগতে টহল দিয়ে এল আলফ্রেড ডিসুজার শ্মশ্রুগুম্ফ
প্রশান্ত মুখখানার ওপর চোখ স্থির রেখে। অতঃপর হেসে বলল, আমার অবশ্যই সমর্থন আ
আপনার প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণে। তবে আমি যেহেতু একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্ট
সেক্ষেত্রে অন্য কোনও কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর হতে চাইলেও সে-সিদ্ধান্ত আমি এ
নিতে পারব না। আমাদের কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের মিটিঙে প্রস্তাবটি পেশ ক
তাদের অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন পেলেই-

-ও সিওর, সিওর। আপনাকে আজই সই করতে হবে তার কোনও মানে নেই। আপ
যে মৌখিক সমর্থন জানালেন সেটাই এই মুহূর্তে যথেষ্ট। বরং এক কাজ করি। আমা
প্রকল্পের প্যাডে আপনাকে একটা চিঠি দিই, সেই চিঠিটাই আপনি পেশ করবেন বো
মিটিঙে, কী বলেন, ম্যাডাম?

---গুড আইডিয়া, গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল।

—-তা হলে আজ উঠি, ম্যাডাম। আপনার কথায়, সাহচর্যে আমি খুবই থ্রিলড্
দুয়েক পরেই তাহলে চিঠি নিয়ে আসব।

আলফ্রেড ডিসুজাকে অফিসের নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিল গার্গী। দেখল ডিসুজা এসে
একটা ঢাউস আকারের মেরুনরঙা গাড়িতে। শুধু গাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় লোক
এলেম। এখন সায়নকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে সে এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হবে কি হ
না।

অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করার আগে তিনবার বাজিয়ে দেখতে হবে এটাই তো রী
গোয়ানিজ লোকটিকে কি বিশ্বাস করা যাবে।

## ॥ ১১ ॥

কয়েকদিন ধরেই বেশ থমথমে হয়ে আছে 'আশ্রয়'। কারও যেন মন ভাল নেই। স্কু
শেষ ঘণ্টা বাজার পরও সমুদ্রনীল একা বসেছিল টিচার্স রুমে। চুপচাপ অবশ্য বসে
সারাক্ষণই কোনও না কোনও কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে—তা স্কুলেই হোক অথবা তা
মেন্টর'স হাউসেই হোক। আজ ব্যস্ত ছিল ছাত্রছাত্রীদের রোলকলের খাতাগুলো মেরা
করতে। অতগুলো ক্লাসের খাতা সবই আপাতত আধ-ছেঁড়া চেহারায়। তাদের দেখার

কউ নেই। সেগুলোর কোনওটা আঠা দিয়ে সেঁটে, কোনওটার স্পাইনে কাগজ পেস্ট করে চেষ্টা করছিল যতটা সম্ভব ঝকঝকে করে তুলতে। মনটা ভাল রাখার এটা একটা উপায়ও।

তার সেই ব্যস্ত থাকার মুহূর্তে হঠাৎ দরজা খুলে উঁকি দিল রাই। ভীরু-ভীরু, নম্র চাউনি।

সমুদ্রনীল চমক ভেঙে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবি, রাই?

বছর ষোল-সতেরো বয়সের মেয়েটির মুখে সর্বক্ষণ নরম হয়ে লেগে থাকে এক টুকরো আলগা হাসি। তাকে দেখতে খুবই সুন্দর, তার সঙ্গে হাসির এই আলতো মাখামাখি ভারী রমণীয় করে তোলে তার উপস্থিতি। রাইয়ের পরনে এখনও স্কুলড্রেস। ঘন কফিনরঙের স্কার্টের ওপর সাদা টপ। গলায় কফিন কলার থেকে ঝুলছে একই রঙের ছোট্ট টাই। মাথার ঝাঁকড়ানো একরাশ চুল লম্বা একটা বেণী হয়ে লতিয়ে আছে পিঠে। কপালে একটা লাল টিপ। বোঝাই যাচ্ছে স্কুলের ছুটির পর দোতলায় হোস্টেলের ঘরে বইখাতা রেখে আবার নেমে এসেছে নীচে।

রাই তার ঠোঁটের কোণে আলতো হাসিটি ঝুলিয়ে রেখে ধীর পায়ে ঢুকে এল ভেতরে। কোনও কথা না বলে চুপচাপ দেখতে থাকে সমুদ্রনীলের টুকিটাকি কাজ। তার ডাগর চোখে এক ধরনের মুগ্ধতা। সমুদ্রনীল রাইয়ের দিকে একপলক নজর ছুঁয়ে আবার মন দিল কাজে। সমুদ্রনীল খেয়াল করছে, দু-একদিন পর পর রাই এভাবেই ছুটির পর তার এহেন কাজের মুহূর্তে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে। কেন যেন অস্বস্তি হয় সমুদ্রনীলের।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার পর রাই হঠাৎ বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, নীলদা?

সমুদ্রনীল অবাক চোখ না তুলেই বলল, কী?

—আপনি রোজ ভোরবেলা ওভাবে গিটার বাজান কেন?

আবারও বিস্মিত সমুদ্রনীল, এবারে চোখ তোলে, কীভাবে বাজাই?

—সব সময়ই কেমন একটা মন-কেমন-করা সুর মেশানো থাকে আপনার গিটারে। শুনতে শুনতে রোজই কেমন যেন কান্না পায়।

—তাই নাকি? সমুদ্রনীল ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার ভেতর কোথাও একরাশ দুঃখ জমে আছে।

সমুদ্রনীলের হাত এতক্ষণ দ্রুত চলাচল করছিল—একবার টুকরো করে কাটা কাগজগুলিতে, একবার রোলকলের খাতায়। রাইয়ের কথা শুনে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকাল ষোড়শী মেয়েটির মুখের দিকে। হাসির সেই আলগা চুমকিটি রাইয়ের মুখে এই মুহূর্তে যেন সেরকম ঝিকমিক করছে না। কোথাও ছুঁয়ে আছে একচিলতে দূর বিষণ্ণতা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সমুদ্রনীল বলল, ঠিক আছে, কাল থেকে আর বাজাব না।

রাই বিব্রত। দেখল তাদের নীলদার মুখে হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুটল একদল উড়ো মেঘ। দেখে লজ্জা পেয়ে বলে উঠল, আপনি রাগ করলেন, নীলদা?

—না, তুই ঠিকই বলেছিস। কতদিন আর সেই দুঃখটা এভাবে বয়ে বেড়াব বুকের ভেতর। অনেকদিন ধরে একটা দুঃখ জমে থাকতে থাকতে তার শরীরেও বোধহয় জং ধরে যায়।

বলতে বলতে আবারও নির্বাক সমুদ্রনীল। হয়তো মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় এক ছটফটে, হাস্যময়ী তরুণীর কিছুকালের লীলাখেলা। ত্রিস্তা চলে গেছে এক নিশ্চিন্ত জীবনের

খোঁজে। সেখানে ভালই আছে নিশ্চয়। শুধু তার মনে রেখে গেছে সেই অপর্যাপ্ত, ছিন্নভিন্ন ভালবাসার একটা লাশ।

রাই তাদের নীলদার দুঃখ ছুঁয়ে থাকা মুখের ওপর চোখ পেতে কী যেন খুঁজল কিছুক্ষণ তারপর বলল, আপনি বাজাবেন, নীলদা। না বাজালে বোধহয় আরও কষ্ট পাবেন।

সমুদ্রনীল কিছু বলল না। সে তখন বুঁদ হয়ে গেছে হয়তো তার সেই নিঃসীম, অনন্ত দুঃখের গভীরে।

—বরং চণ্ডালিকার ওই জায়গাটা তো বাজাতে পারেন। সেদিন নাচের সময় যেমন বাজাচ্ছিলেন, ওই যে—

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম
কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধভিক্ষু আমার—
বললেন, 'জল দাও।'

রাইয়ের কথায় কোথাও একটা অনিবার্য, অমোঘ আন্তরিকতা ছিল যা সহসা ছুঁয়ে গেল সমুদ্রনীলের ভিতর-শরীর। কয়েক মুহূর্ত তার নজর ন্যস্ত করল রাইয়ের ঝিনুকের মতো দুটো ঝকমকে চোখের ওপর. হঠাৎ হাসল একঝলক, বলল, ভাল বলেছিস তো। ঠিক আছে, কাল ভোরে ওটাই বাজাব।

রাইয়ের মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি। স্বর নরম করে বলল, সত্যি বাজাবেন?

—হ্যাঁ রে, পাগলি, ঠিক বাজাব। তুই যখন বলেছিস—

ঠিক এ সময় হঠাৎ ফাদারের খাস বেয়ারা পঞ্চানন নামের বেঁটেখাটো লোকটা মুখ বাড়াল টিচার্স রুমে। রাইয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল, তোমায় ডাকতিছে।

রাই আশ্চর্য হয়, আমাকে ডাকছে, কে?

—ফাদার।

বলে পঞ্চানন মুহূর্তে অদৃশ্য। কেন ডাকছে, কী বৃত্তান্ত সে সব খোলসা না করেই পঞ্চানন এভাবে নিষ্ক্রান্ত হতে রাইকে ভারী বিমূঢ় দেখায়। ফাদারকে কেন যেন তার খুব ভয় করে। শুধু সে-ই নয়, এই প্রতিষ্ঠানের সব ক'জন বাসিন্দাই বোধহয় ফাদারকে যেমন সমীহ করে তেমনই ভয় পায়।

তাকে ইতস্তত দেখে সমুদ্রনীল বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা।

রাইয়ের মুখটায় এখন একটু আগের সমুদ্রনীলের মুখে বসা সেই উড়ো মেঘ, কেন ডাকছেন ফাদার? মুম্বইয়ে শ্রীরাধার কাছে যেতে রাজি হইনি বলে বকবেন?

—না, নিশ্চয়ই কোনও ভাল খবর আছে। ফাদার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যা করেন সবই তো ভালর জন্যেই।

রাই ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল টিচার্স রুম থেকে। সমুদ্রনীল দেখল, সেই উড়ো মেঘটা যেন ঘিরে থাকল চলমান রাইয়ের ষোল বছরের শরীরটার চারপাশে।

'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ডেও ততক্ষণে শান্ত বিকেলটাকে মুড়ে ফেলেছে সন্ধের পাতলা াদর। তখনও সব ক'টা রোলকল রেজিস্টার মেরামত করে উঠতে পারেনি বলে দ্রুত হাত ালাচ্ছিল সমুদ্রনীল। কাজটা অর্ধেক করে ফেলে রাখলে আবার কবে হাত দিতে পারবে কে ানে। কাল হয়তো এমন একটা বিদ্‌ঘুটে কাজে তাকে জুতে দেবেন ফাদার যে, টিচার্স রুমে সার সময়ই পাবে না। চার বেলা ফ্রিতে খাওয়া আর ষোলশ টাকা—এর বিনিময়ে তাদের ানেক রকম কাজই তো করিয়ে নেন ফাদার। তবে সে সবই অবশ্য 'আশ্রয়'-এর স্বার্থে। াদার নিজেও যেমন খাটতে পারেন ভূতের মতো, তেমন তিনিও চান বাকি সবাইও হবে আশ্রয়'-এর প্রতি সমর্পিত মনপ্রাণ।

অফিস-বিল্ডিং থেকে সবুজ মাঠটা পেরিয়ে রাই যখন ফিরে এল, আঁধার জাবড়ে বসেছে ততক্ষণে। টিচার্স রুমের টিউবটা জ্বেলে দিয়েছে সমুদ্রনীল। রাই ঢুকতেই দেখল, সে াঁপাচ্ছে। দ্রুত উঠছে নামছে তার বুক। হরতন আকারের মুখটা থমথমে। চোখে এক ধরনের ানিশ্চয়তা।

—কী হয়েছে রে?

রাই কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না উত্তেজনায়। তখনও হাঁপাচ্ছে। ঘাম দেখা দিয়েছে তার সপ্তমীর চাঁদের মতো কপালে। ধারালো নাকের ডগাতেও এক বিন্দু ঘাম।

সমুদ্রনীল হাতের নড়াচড়া থামায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় রাইয়ের দিকে। কিছুক্ষণ পর ম নিয়ে রাই জানাল ফাদার তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী প্রস্তাব দিয়েছেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাইয়ের ভরণ পোষণের যাবতীয় খরচ দিতে চান যতদিন না সে বিবাহযোগ্য হয়। মন কী তার বিয়ের সব খরচও তিনি বহন করবেন, তবে একটা শর্তে। পাত্র এরকমই এক ঃস্থ যুবক যাকে তিনি বড় করে তুলছেন অন্যত্র। আর বিয়ের পর তারা দুজন সেই বৃদ্ধকে দেখাশুনো করবে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন।

—বাহ্, এটা তো একটা ভাল খবর।

খবরটা রাইয়ের কাছে ভাল ঠেকেনি। সে হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল, 'আশ্রয়'-এ আমি থাকি সেটা কি ফাদার চাইছেন না? আগের দিন বললেন শ্রীরাধার কাছে যেতে, আজ আবার অন্য প্রস্তাব।

—কেন, তোর আপত্তি কীসের?

—'আশ্রয়'-এ থাকি, নীলদা, সেটা একরকম। সেটা ফাদারের করুণা। আমার বাবা-মা খুবই গরিব বলে তুলে দিয়েছেন ফাদারের হাতে। এখানে আমার মতো আরও অনেকেই আছে। সবার সঙ্গে এক ছাদের নীচে একই ভাবে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে যে-অনুভূতি, কোনও বিশেষ একজনের দয়ায় বড় হয়ে ওঠা তার চেয়ে কষ্টের, অপমানের।

সমুদ্রনীল চোখে অনেকটা বিস্ময় মিশিয়ে তাকাল রাইয়ের দিকে। রাইয়ের সুন্দর মুখে হাসিটা মাখানো না থাকলে কীরকম মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা।

—তা তুই কী বললি?

—বললাম, ফাদার, আমি যেরকম আছি সেরকমই থাকতে চাই। আপনি এতকাল আমাকে যেভাবে রেখেছেন সে ভাবে রেখে দিলেই বর্তে যাব।

—বাহ, তোর তো বেশ সাহস আছে।

—কিন্তু ফাদার হয়তো রেগে গেলেন। এখানে তাঁর কথাই শেষ কথা। তাঁর ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে। আমি যে তাঁর কথা মান্য করতে পারলাম না, তাতে পরে যদি কোনও বিপদ হয় আমার!

সমুদ্রনীল এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারল না তখনই।

—সবচেয়ে কী মুশকিল হল জানেন, নীলদা? ফাদার যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন ঘরে আরও দু'জন উপস্থিত ছিলেন।

সমুদ্রনীল চোখ তুলল, কারা?

—একজন তুলিকাদি। অন্যজন বাইরের। তাঁকে আমি দেখেছি দু একবার ফাদারের ঘরে ঢুকতে বা বেরতে। ফাংশনের দিনও দেখেছিলাম। সাদা এক গরিলার মতো চেহারা। মাথায় লাল টুপি।

—তা হলে নিশ্চয়ই ডিসুজা নামের সেই লোকটা। ফাদারের বন্ধু।

—সেই লোকটা কীরকম ঢেউ-ঢেউ চোখ করে তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

—কিন্তু লোকটা নাকি খুব ভাল। ফাদারই একদিন বলছিলেন। সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন নাকি।

—তাতেই লোকটা ভাল হয়ে গেল!

—তা নয়। তবে একটা ঘ্যামা চাকরি করতেন শুনেছি। এখন মানুষের সেবায় ব্যাপৃত রাখতে চান নিজেকে।

—আর তুলিকাদির ভাবভঙ্গিও আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। ফাদার অখুশি হলেন কিনা তত বোঝা গেল না। শুধু বললেন তুমি আর একটা ভাল সুযোগ নষ্ট করলে। কিন্তু তুলিকাদিকে স্পষ্টতই ভারী অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল।

—কিন্তু কে তোর ভরণপোষণের ভার নিতে চাইছেন তা বললেন না ফাদার?

—না। বললেন সেটা জানা যাবে আমার বিয়ের বয়স হলে। আপাতত তার পরিচয় গোপন থাকবে।

—খুব অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? লোকটা হয়তো নিজের প্রচার চায় না। এরকম কত ভাল মানুষই তো আছে পৃথিবীতে।

—কিন্তু তুলিকাদি এমন চোখভঙ্গি করছিলেন যেন আমি খুব অন্যায় করলাম। বলুন আমি কি ঠিক করিনি?

সমুদ্রনীলকে চিন্তান্বিত দেখায়, কী জানি। আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। হয় তো তোর সিদ্ধান্তই সঠিক।

রাইয়ের মুখখানা এতক্ষণে আবার হাসি-হাসি। নীলদা যখন তার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে, তখন সে ঢেলখেল হতে পারে খুশিতে। এবার হঠাৎই তার স্বর নেমে এল নিচুগ্রামে, জানেন, নীলদা, তুলিকাদি না ওই সাদা গরিলাটার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। আমার গা তখন রি রি জ্বলছে।

সমুদ্রনীল তো জানেই তুলিকা খুব অসংযত। তার জীবনযাপনও একটু বেপরোয়া ধরনের।

রাই আরও গলা নামায়, কাল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে অফিস ঘরের পাশে। আমি একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। খুব ঝগড়া হচ্ছিল তুলিকাদির সঙ্গে আঙ্কেল তরফদারের।

—কী নিয়ে ঝগড়া? সমুদ্রনীল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত জানে, কিন্তু তার রেশ কীভাবে আছড়ে পড়েছে পরবর্তীকালে তা জানে না।

—আঙ্কেল তরফদার বলছিলেন, 'তোমাকে আমি হাতে করে তৈরি করলাম, আর তুমি কিনা আমার নামে অভিযোগ করলে ফাদারের কাছে! তোমার পাস্ট হিস্ট্রি সব আমার জানা। বি কেয়ারফুল।' তাতে তুলিকাদি কী বললেন জানেন?

—কী?

—বললেন 'আপনার প্রেজেন্ট হিস্ট্রিও আমার জানা। আর আপনার ফিউচার হিস্ট্রিও আমি লিখে দিতে পারি, তা জানেন।'

—রাই, এ তো ইতিহাস লেখার ইতিহাস। সমুদ্রনীল বলল বটে, কিন্তু রাইয়ের মুখে ঘটনাটা শুনতে ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কথাটা ঘোরানোর জন্য বলল, তোদের যে সেদিন মুঘলবংশের পতনের কারণ পড়াচ্ছিলাম তা ঠিকঠাক বুঝেছিলি?

রাই কী বুঝেছে কে জানে, বলল, নীলদা, ইতিহাস মানেই খুব গোলমেলে ব্যাপার। শুধু ক্ষমতার লড়াই। তাতে খুন, রক্তপাত, যুদ্ধ ছাড়া আর তো কিছু খুঁজে পাইনে।

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল সমুদ্রনীল, ঠিকই বলেছিস। ক্ষমতার লড়াই হল ইতিহাসের আসল উপাদান।

—স্যার, ইতিহাস না জানাই ভাল। তাতে কারও কারও সম্পর্কে একরকম ধারণা থাকে তা বদলে যায়।

সমুদ্রনীল বুঝে উঠতে পারল না কোন ইতিহাসের কথা বলছে রাই! তুলিকা কিংবা আঙ্কেল তরফদারের ইতিহাস, না মুঘলবংশের!

সমুদ্রনীল আবার কথা ঘোরায়, দূর পাগলি, ইতিহাস জানাটা খুবই জরুরি। সভ্যতা কতদূর এগিয়েছে তা একমাত্র জানা যায় ইতিহাসের মাধ্যমে। সভ্যতা কীভাবে এগিয়েছে, কত দূরে এসে পৌঁছেছে তা না জানলে সামনের দিকে এগোতে পারবে না মানুষ।

রাই হাসল, তারপর দুজন দুজনের সম্পর্কে যা বিশ্রীভাবে বললেন!

এত সব এলোমেলো কথা বলাবলির মধ্যে সমুদ্রনীলের হঠাৎ নজরে পড়ল ফাদারের খাস বেয়ারা পঞ্চানন হন্তদন্ত হয়ে কাকে যেন ডাকতে এল আবার। একটু পরেই দোতলা থেকে নেমে এল শিরিন নামের একটি মেয়ে। প্রায় রাইয়েরই বয়সী। হয়তো সামান্য কমবেশি। শিরিনকেও দেখতে বেশ ভালই। তার আর এক নাম দেখন-হাসি।

রাই তার চোখ দুটো জানলার ওপারে ছুড়ে দিয়ে দেখল শিরিন ছটফটে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবুজ লন পেরিয়ে। তার নরম পায়ের চাপে থেঁতলে যাচ্ছে কচি কচি ঘাস। একটু পরেই অন্ধকারে তাকে আর দেখা গেল না।

রাই বিড়বিড় করে বলল, ফাদার নিশ্চয় শিরিনকেই বাছলেন সেই অদৃশ্য লোকটির দত্তক হিসেবে।

সমুদ্রনীলও দেখছিল দৃশ্যটা! সেই কবে শিরিনকে তারা নিয়ে এসেছিল মুর্শিদাবাদ থেকে। ওর বাবা বছরের অর্ধেক দিন বাইরে বাইরে থাকে। কাজ করে রাজমিস্ত্রীদের জোগাড়ে হিসেবে। চার পাঁচ মাস পর পর ঘরে ফেরে। যা টাকা নিয়ে আসে তাতে ভাল করে খোরাকির জোগাড় হয় না। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই লোকটার পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সমুদ্রনীলরা তাদের মধ্যে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিল শিরিনকে। সে প্রায় বছর চারেক আগের কথা। তার বাবা তখন বীরভূম না কোথায় জোগাড়ে খাটতে গিয়েছিল। তার মা বলেছিল, বাবুদের ইস্কুলে গিয়ে থাকুক। তবু তো দুটো খেতে পরতে পারবে। লেখাপড়া শিখতে পারবে।

সেই শিরিনের ভবিষ্যৎ আরও নিশ্চিন্ত করতে নিশ্চয়ই আজ যোগ্য হাতে অর্পণ করছে ফাদার।

রাই হঠাৎ বলল, 'আশ্রয়'টা যেন কীরকম কীরকম হয়ে গেল, নীলদা।

সমুদ্রনীল চমকে উঠে বলল, কেন রে?

—সেই আগের মতো নেই। হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা সবাই কেমন সিঁটিয়ে আছে ভয়ে।

—কেন? সিঁটিয়ে আছে কেন? এখন তো প্রতি রাতে আমাদের কেউ না কেউ থাকছে এখানে।

—তা অবশ্য থাকছে। কাল রাতে তুলিকাদি ছিলেন। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আমাদের ঘরের সামনে লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটছেন তুলিকাদি। প্রত্যেক ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন সবাই ঠিকঠাক ঘুমোচ্ছে কিনা।

—তা হলে তো আরও নিশ্চিন্ত। ফাদারের কড়া হুকুম কোনও ছেলেমেয়ের যেন একতিল ক্ষতি না হয়।

—কিন্তু রূপায়ণদা পরশু রাতে ছিলেন। তিনি ওরকম ভয় দেখালেন কেন?

সমুদ্রনীল আবার চমকাল, কী ভয় দেখাল?

—বললেন, সবাই সাবধানে থাকিস রে। কে কখন গায়েব হয়ে যাবি ঠিক নেই।

সমুদ্রনীল কিছুক্ষণের জন্য বেবাক স্ট্যাচু। দু'দুটো মেয়ে হঠাৎ 'আশ্রয়' থেকে চলে যাওয়ায় সত্যিই একটা হিম আতঙ্ক রিন রিন করছে অনেকের মনে। শান্ত, সুন্দর 'আশ্রয়' হঠাৎই কেমন ভরে উঠেছে নিঃশব্দ আশঙ্কায়। হয়তো দুটো ঘটনাই নেহাতই অঘটন। চৈতালি বা অতসী দুজনেই এক ঘরে থাকত। বাইরের কারও সঙ্গে কোনও ভাবে যোগাযোগ করে ফেলেছিল নিজেরাই, তারপর মওকা পেয়ে একে একে পালিয়ে গেছে দুজনেই। যে পুলিশ ইনস্পেক্টরর তদন্ত করতে এসেছিলেন, তাঁরও আর কোনও পাত্তা নেই। রাইয়ের আশঙ্কাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে সমুদ্রনীল বলল, রূপায়ণের কথাবার্তাই ওরকম। ওর কথাকে অত গুরুত্ব না দিলেই চলে।

ততক্ষণে সন্ধে পেরিয়ে রাত গুড়িগুড়ি নেমে এসেছে 'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ডের ভেতর। এখানে-ওখানে জ্বলে উঠেছে টিউবের রূপো রং জ্যোৎস্না। অত বড় মাঠটা অবশ্য তাতেও পুরো আলোকিত হয়নি। সেই অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে একটু পরেই প্রায় নাচতে নাচতে ফিরে এল শিরিন। রাই তখন টিচার্স রুম থেকে বেরুচ্ছে। তাকে দেখেই শিরিন এক গাল হেসে বলল, তোদের আমি শিগ্‌গির গুডবাই করছি, রাই।

রাই বিস্মিত হল, সে কী! কেন?

—ফাদার ডেকেছিলেন আমাকে? বললেন যে এক ভদ্রলোক নাকি আমার বাকি জীবনের ভরণ পোষণ বহন করতে চান। এমনকী আমার বিয়ের খরচও জোগাবেন তিনি। কিন্তু তাঁর নাম এখন আমি জানতে পারব না। শুধু আমার বিয়ের পর দেখভাল করতে হবে তাঁর শেষ জীবনটা।

—তুই রাজি হলি বুঝি?

শিরিন চোখ ঝলমল করে বলল, রাজি তো হয়েইছি, আরও বলেছি যদি তিনি আমার দায়িত্ব নিতেই চান তাহলে এখন থেকেই আমি তাঁর কাছে থাকতে রাজি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। রিয়া তো শ্রীরাধার কাছে গিয়ে রাজকুমারীর মতো বাস করছে। তা হলে আমিই বা এখানে পড়ে থাকি কেন! রূপায়ণদা পরশু যেরকম বললেন তাতে কখন কীভাবে গায়েব হয়ে যাই তার ঠিক আছে! তার চেয়ে সময় থাকতে সরে গিয়ে রাজকুমারী হয়ে বড় হওয়াই তো ভাল।

শিরিন নাচতে নাচতে দোতলায় উঠে যেতে যাই হঠাৎ কাছে সরে এল সমুদ্রনীলের, ফিসফিস করে বলল, জানেন নীলদা, নিবেদিতাদির সঙ্গে সেদিন ভীষণ ঝগড়া হচ্ছিল ওঁর স্বামীর। নিবেদিতাদি বলছেন, 'এর মধ্যে তুমি মাথা গলাবে না। খবরদার।' আপনি কিছু জানেন, নীলদা!

সমুদ্রনীল মাথা নাড়ে, সে জানে না, কিছুই জানে না। শুধু জানে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না 'আশ্রয়'-এ।

## ॥ ১২ ॥

ফাদার যেদিন বাইরে কোথাও ট্যুরে যান, সমস্ত 'আশ্রয়'-এ বিনবিন করে একটা এক্সট্রা-তৎপরতা। আজ দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যেই ফাদার বেরিয়ে যাবেন হায়দ্রাবাদের ফ্লাইট ধরতে। অতএব সকাল থেকেই তাঁর ফোনাফোনি, একে-ওকে ধমকানি চলছে। একটা পঁয়তাল্লিশে প্লেন। নির্ধারিত সময়ের অনেকটা আগেই পৌঁছতে চান ফাদার। না হলে তাঁর শরীরে অ্যামিবায়োসিসের চেয়েও দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে টেনশন। টেনশনের পারদ যত ঊর্ধ্বগতি হয়, চেঁচামেচি, বকাবকির মাত্রাও হু হু করে বাড়ে। তটস্থ হয়ে থাকে গোটা 'আশ্রয়'। এরকমই তো হয়ে আসছে গত চার বছর। মাত্রাটা আরও বেড়েছে দু-দুটো কিশোরী সহসা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায়।

নিবেদিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কেন তাকে সাতসকালে ডেকে পাঠিয়েছেন ফাদার! তাঁর সামনে ইতিমধ্যেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তুলিকা আর বিশাখা। বিশাখাকে ভার দিয়েছিলেন প্লেনের টিকিট সংগ্রহের। তুলিকাকে বলেছিলেন 'কার রেন্টাল'-এ ফোন করে ওখানকার সামোসা সিংকে গাড়ির কথা বলতে। দশটা বেজে গেছে এখনও গাড়ি কেন পৌঁছাল না এই কারণে কিছুক্ষণ ধমকাধমকি করলেন তুলিকাকে। তারপর নিজেই ফোনে ধরলেন 'কার রেন্টাল'কে। ফোন করে সামোসা সিংকে ধমকানোর মাঝখানেই অবশ্য আশ্রয়'-এর গেট দিয়ে ঢুকে এল একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার। তৎক্ষণাৎ সামোসা সিংকে বকাবকি বন্ধ করে একটা থ্যাঙ্কস জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন যথাস্থানে। পরক্ষণে হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল নিবেদিতার স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবয়বটির দিকে, ভুরুতে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কেন যেন ডেকেছিলাম?

নিবেদিতা চুপ করে থাকে। ফাদার তাকে কেন তলব করেছেন তা তো তার জানার কথা নয়। ফাদার অবশ্য এরকমই, তাঁর গোল-আলুর মতো মগজটির অন্তরালে একসঙ্গে এত লক্ষ ভাবনা আবর্তিত হয় যে প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলেন ভাবনাগুলোর ল্যাজা কিংবা মুড়ো। নিবেদিতার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকার ফুরসতেই অবশ্য বক্তব্যের ল্যাজটি খুঁজে

পেলেন হঠাৎ, ও হ্যাঁ। যে জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছ, আমাদের 'আশ্রয়'-এর কর্মকর্তাদের দক্ষতার কারণে দু'দুটো মেয়ে নিপাত্তা হয়ে গেছে, তাদের আজ পর্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। প্রতিষ্ঠানের এতদিনের অর্জিত সুনাম যে একেবারে তলানিতে ত নিশ্চয়ই নতুন করে বোঝাতে হবে না তোমাকে। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার জনে কিছু একটা তো করতে হবে, তাই কি না?

ফাদারের গোল্লা চোখ দুটো জরিপ করে নিবেদিতা বুঝে উঠতে পারল না ঠিক কী বলতে চাইছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার! তাঁর কথাগুলো যে নিবেদিতাকেই ঠেস দিয়ে বলা তা বুঝতে অসুবিধে নেই। চৈতালি নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায় দিন কুড়ি অতিক্রান্ত। এই সময়কালের মধ্যে নিবেদিতাকে কতবার এর ওর মুখে নানান অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনতে হচ্ছে ও আরও বহুকাল হবে তা জেনে ও বুঝে ক্রমশ নির্বাক হয়ে যাচ্ছে। এখন ভাল করে কারও সঙ্গে কথা বলে না। শুধু একটা তুমুল ভাঙচুর চলছে মনের ভেতর। ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে।

— মনে হচ্ছে সেদিনকার মতো আর একটা অনুষ্ঠান যদি করা যেত, সেখানে কলকাতার কিছু বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ করে, সেইসঙ্গে প্রেস ও দূরদর্শনের লোকজনকে এনে দেখানো যেত আমাদের কর্মকাণ্ড, তাহলে হয়তো মানুষের ইম্প্রেশন কিছুটা বদলানো যায় এখনও। তুমি কী বলো।

নিবেদিতা জানে না কী উত্তর দেবে এর। ফাদার যা বলছেন তাতেই হ্যাঁ বলা নিয়ম এখানে।

—তুমি আর একবার 'চণ্ডালিকা'টি তৈরি করে ফেলো। আগেরবার তোমার অনুষ্ঠান দেখে ধন্য ধন্য করেছে সবাই। আরও একবার নাটকটা দেখাই সবাইকে। বুঝলে কিছু।

নিবেদিতা অবাক হল, এখন সেই অনুষ্ঠান আবার কী করে দেখাব?

—কেন! কেন! ফাদার চকিতে উত্তেজিত হন। তাঁর কথার ওপর কেউ কথা বলুক ওঁ যেমন তিনি পছন্দ করেন না, তেমনই তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিতে চাইছে একজন তত্ত্বাবধায়ক তাও বাড়াবাড়ি মনে হয় তাঁর।

—চণ্ডালিকা যাদের নিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলাম, তাদের একজন—যে একটা মেইন রোলে অভিনয় করেছিল, সেই রিয়াই তো নেই এখানে।

—রিয়া নেই তাতে কী হয়েছে। আরও পনেরো-কুড়ি গণ্ডা রিয়া তো আছে। তাদের কাউকে বেছে নিয়ে রিহার্সাল দাও।

নিবেদিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ফাদারের অসন্তুষ্ট মুখের দিকে, যে কাউকে দিয়েই তো আর ওরকম একটা মেইন রোল করানো যায় না। প্রকৃতির মায়ের ভূমিকা 'চণ্ডালিকা'য় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বেছেবুছে তবেই রিয়াকে নির্বাচন করেছিলাম। ওকে যদি সাত-দশ দিনের জন্যও এখানে নিয়ে আসেন তো মঞ্চস্থ করা যাবে নৃত্যনাট্যটা।

—রিয়াকে আবার এখানে নিয়ে আসব! ফাদারও যেন হাঁ হয়ে গেলেন নিবেদিতার প্রস্তাব শুনে, রিয়া ওরকম একটা প্যালেসিয়াস বিল্ডিঙে বাস করে। পড়ছে একটা কনভেন্ট স্কুলে। সে কি এখন আর 'আশ্রয়'-এ এসে খাপ খাওয়াতে পারবে নিজেকে! তা ছাড়া শ্রীরাধা এখন তাকে ছাড়তে চাইবেন বলে মনে হয় না। তুমি অন্য কাউকে ওই ভূমিকাটার জন্য বাছো। এখানে এত-এত মেয়ে আছে, অনেককেই তো আমার বেশ ব্রিলিয়ান্ট বলে মনে হয়। ভাল করে রিহার্সাল দিলে নিশ্চয়ই পারবে। আর বেশি কথা বাড়িয়ো না। গো, প্রিপেয়ার ইয়োর টিম।

বলতে বলতে হাতের কব্জির দিকে এক পলক নজর রেখে লাফিয়ে উঠলেন, মাই গড, সাড়ে দশটা বাজতে চলল, এর পর রওনা দিলে আর এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং টাইমের মধ্যে পৌঁছাতে পারব না। তুমি আবার ওটা কী খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ!

তুলিকা যে-খাতাটা নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে, সেটা গাড়ির লগবুক। ফাদারের নিজস্ব একটা তুঁতেরঙের মারুতি আছে। তাছাড়া 'কার-রেন্টাল' থেকে প্রায়ই গাড়ি নেওয়া হয় 'আশ্রয়'-এর নানান কাজে। দুটো গাড়িরই গতিবিধি যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা থাকে সেদিকে ফাদারের কড়া লক্ষ। গাড়ির যাতে কোনও ভাবেই অপব্যবহার না হয় সে কারণে কোন গাড়ি কখন রিপোর্ট করল, কে চড়ল তাতে, কোথায় গেল, কত কিলোমিটার ঘোরাঘুরি হল, আবার গাড়ি কখন 'আশ্রয়'-এ ফিরে এল তা পাই-টু-পাই নোট করার দায়িত্ব তুলিকার। সেই সঙ্গে আরও দায়িত্ব—যিনি গাড়িতে চড়ছেন তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে লগবুকে। আজও তাই তুলিকা সই করিয়ে নিতে চায় ফাদারের গাড়ি চড়ার হিসেবটা।

ব্যস্ততার এহেন তুঙ্গ মুহূর্তে তুলিকা লগবুক সই করাতে এসেছে দেখে তাকে ফায়ার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ফাদার। কিন্তু কী ভেবে নিজেকে নিবৃত্ত করে বললেন, তুমি এগুলো সই করানোর আর সময় খুঁজে পাও না! তুমি কি মনে করো হায়দ্রাবাদের প্লেন ফাদারের জন্যে এক মিনিটও অপেক্ষা করবে?

হালকা সবুজ রঙের ম্যাক্সিপরা তুলিকা তার সামান্য-পৃথুল শরীরটা ঝুঁকিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় ফাদারের সই করিয়ে নিতে নিতে হেসে বলল, আপনি কবে ব্যস্ত থাকেন না সেটা বলুন তো?

হু হু করে এক দঙ্গল হিজিবিজি সই লগবুকে ছিটিয়ে উঠে পড়লেন তাঁর চেয়ার থেকে। সদাব্যস্ত চোখমুখ। টেবিল থেকে একটা দোহারা ফাইল, আরও কিছু কাগজপত্র ফাইলের ওপর চাপিয়ে বগলদাবা করে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, হুঁ, তরফদার তো এখনও এসে পৌঁছাল না। ওর সঙ্গে কাল আমার কথা হয়ে গেছে আজ এখানে রাতে হল্ট করবে। আর নিবেদিতা, আজ তো তোমারই হোস্টেলে থাকার কথা। তাই না? আমি অবশ্য কাল সকালের ফ্লাইটেই ফিরে আসব। ও-কে? গুডবাই।

'কার-রেন্টালে'র গাড়িতে ফাদার দুম করে বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ওরা তিনজন। যেন একটা ঝড় গেল। মিনিট দুয়েক বোধহয় ঝড়ের ঝাপটা সামলানো ভাবে। তারপর তুলিকা মিটমিট করে হেসে বলল, উঃ, ত্বক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দূরদর্শনের এই বিজ্ঞাপনটা তেমন চোখে পড়ে না আজকাল। তবু ফাদার যতবারই এ-কাজে ও-কাজে বাইরে বেরিয়ে যান, তুলিকা কথাটা বলে থাকে প্রায়ই। আসলে ফাদার যতক্ষণ 'আশ্রয়'-এ থাকেন, সবাইকেই কাঁটা হয়ে অপেক্ষা করতে হয় কার ওপর কী হুকুম জারি হয়। ফাদার না থাকা মানে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। বামুন ঘরে গেলে সবাই লাঙ্গল তুলে একটু জিরেন নিতে পারে যে-যার মতো।

নিবেদিতার ত্বক অবশ্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচল না। তার ওপর যে-গন্ধমাদন চাপিয়ে গেলেন ফাদার, তা রূপায়িত করতে যে-পরিমাণে পরিশ্রম করতে হবে তা ভেবে আতঙ্কিত বোধ করছিল। তাও যদি আগের পরিস্থিতি থাকত! এখন সর্বত্রই যেন থম মেরে আছে একরাশ হিম আতঙ্ক। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে একশো সবুজ। না, একশো তো নয়, ছিয়ানব্বই এখন।

সেদিন সারা দুপুর ক্লাস নেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নিবেদিতা নজর রাখছিল রিয়ার সমবয়সী কিশোরীদের দিকে, যাকে 'চণ্ডালিকা'-য় প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করানো

যায়। 'চণ্ডালিকা'-র পুনর্বার মঞ্চস্থে তার মনে সায় নেই। কিন্তু টিঁকে থাকতে হলে কাজটা করতেই হবে।

সন্ধের পর নিবেদিতা মেয়েদের হোস্টেলে চলে এল রাতে থাকতে। ফাদারের হুকুম অনুযায়ী সপ্তাহে একদিন তাকে রাতে থাকতে হয় এখানে। একদিকে ভালই হয়েছে কারণ সারা সন্ধে জুড়ে যে-ক'টি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তাদের ডেকে কোনও একজনকে নির্বাচিত করা যাবে। প্রায় সবাই দূব দূর জেলার কোনও গাঁয়ের মেয়ে। প্রত্যেকেরই পারিবারিক ইতিহাসে শুধু দারিদ্র আর দারিদ্র। 'আশ্রয়'-এ আসার পর গত তিন চার বছরে তাদের অন্ন বস্ত্র আর শিক্ষার সংস্থান হলেও অনেকেরই জিবে গাঁয়ের কথ্য ভাষার আড় এখনও সম্পূর্ণ ভাঙেনি। তবু তাদেরই মধ্যে কাউকে মেজেঘষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে দর্শকদের কাছে। কাজটা কত কঠিন তা ক'দিন আগেই রিহার্স্যাল দিতে গিয়ে অনুভব করেছে রোজ। সেবার নৃত্যনাট্যটা কোনও ক্রমে উত্তীর্ণ হলেও সেটি দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ করতে গায়ে জ্বর এসে যাবে নিশ্চিত। বিশেষ করে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যখন আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ।

কিন্তু নিবেদিতার তখনও আরও অবাক হওয়া বাকি। এ ক'দিন যে-সাংঘাতিক ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেনি তা আজ পরিষ্কার হল যখন মেয়েদের হোস্টেল থেকে একে-একে ডেকে পাঠাল চন্দ্রাণী, বীথি, ঋতু, জবা ইত্যাদিদের। তাদের নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড় করিয়ে জরিপ করছিল শরীরের বিভঙ্গ কিংবা আঙুলেব মুদ্রা অথবা চোখের মণির নড়াচড়া। সে সময় হঠাৎই খেয়াল হল কিশোরীদের প্রত্যেকেরই চোখে যেন ভীতির সঞ্চার। তারা যেন নিবেদিতাকেও মাপছে মনে মনে। এ ক'দিনে নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু কানাকানি, ফিসফিসানি চলছিল, তাকেই যে অনেকে আড়ালে এত সব অঘটনের নেপথ্য নায়িকা বলে ভাবছে তা এই মুহূর্তে আরও পরিস্ফুট হল মেয়েগুলোর সিঁটিয়ে থাকা দেখে। ঋতু নামে মোটামুটি সুন্দরী যে-মেয়েটিকে নাচের যোগ্য বলে মনে হচ্ছিল, সে তো মুখের ওপর বলেই দিল, না দিদি আমি নাটকে নামব না।

নিবেদিতা বিস্মিত হল, কেন রে?

ঋতু উত্তব দিল না। হয়তো যে-কথাটি মনে মনে ভাবছে তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে বাধল তার, কিন্তু তার চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, না দিদি, আপনার কাছে নাচ শিখব না।

ঘণ্টা দুয়েক পর নিবেদিতা বুঝে গেল, সে এখন এতগুলো সবুজের কাছেও চৈতালি বা অতসী-নিখোঁজের ব্যাপাবে একজন সন্দেহভাজন।

সে-রাতে মেয়েদের হোস্টেলের কোণের একটি ঘরে বিছানায় একা শুয়ে বিন্দুমাত্র ঘুম এল না তার চোখে। আজ তার তেমনভাবে ঘুমোনোরও কথা নয় অবশ্য। মধ্যরাতে অন্তত একবার, পারলে দু'বার হোস্টেলের টানা লম্বা বারান্দায় টহল দিয়ে আসার কথা। তুলিকা নাকি তিনবার ঘুরেফেরে দেখে আসে হোস্টেলের প্রতি ঘরে ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক আছে কি না সব। আর রূপায়ণ ঠিক তার উল্টো। বলে, রাতের ঘুম ফেলে ও সব পাহারা দেওয়া আমার পোষায় না। যে যাওয়ার তাকে পাহাবা দিলেও তার ফাঁক খুঁজে ঠিক উড়ে যাবে।

এত সব ভাবাভাবির ফুরসতে রাত আরও গভীর হয়ে নেমে এল নিবেদিতার মগজে। তখন কত রাত কে জানে। হঠাৎ মনে হল বাইরের বারান্দায় কারা যেন কথা বলছে জোরে জোরে। সব কথা স্পষ্ট হচ্ছিল না। তবু কথাগুলো পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে গোটা বারান্দায়। বারান্দা থেকে উড়ে এসে ঝরে পড়ছিল তার শরীরের ওপরেও। ক্রমে কথাগুলো উচ্চকিত হল, মনে হচ্ছিল কোলাহলের ভেতর থেকে ছাপিয়ে আসছে কারও ঘরে ফেরার

খবর। যেন চৈতালি ফিরে এসেছে হঠাৎ। এসে গেছে অতসী। কোথা থেকে এল, কোথায় ছিল তারা—এইসব আলোচনা হচ্ছে বেশ উচ্চগ্রামে। ক্রমে চেঁচামেচি এত জোরে শুরু হল যে, আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না নিবেদিতার পক্ষে। চোখ মেলতেই মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন যেন। ধড়মড় করে উঠে বসতেই শুনল বাইরে সত্যিই হট্টগোল। কারা যেন চেঁচামেচি করছে খুব! কী আশ্চর্য, এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার পর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল নিবেদিতা!

হুড়মুড় করে দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখল, গোটা 'আশ্রয়' জুড়ে তোলপাড়। চারদিক আলোয় আলোময়। হোস্টেলের লম্বা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে সমস্ত সবুজ। তাদের সবার চোখেমুখে শুধু আতঙ্ক আর ভয়। তাদেরই একজনকে নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে রে, কাঞ্চন?

বছর চোদ্দ বয়স কাঞ্চনের। কাঁচা ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে আসায় তার চোখ লাল। বলল, শেফালি আর বীথিকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কী! নিবেদিতার পায়ের নীচের মাটি টলে যায়!

—হ্যাঁ। ওদের ঘরে ঋতু নামের যে আর একটা মেয়ে থাকে, সে ঘুম ভেঙে দেখে দরজা ভেজানো, আর দুটো বেডই খালি।

নিবেদিতার তখন চোখে পড়ছে অত বড় লনের এখানে-ওখানে জটলা। নির্মাল্য, বিশাখা, তিয়াসা আর সমুদ্রনীল একসঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। তুলিকা আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। গেটের দারোয়ান বিষেন সিং-এর সঙ্গে চিৎকার করে কী যেন বলছে। হাঁপাচ্ছেই বেশি।

নিবেদিতার মাথায় ঢুকছিল না কখন ঘটে গেল এত সব কাণ্ড। হুড়মুড় করে নেমে এল বারান্দা থেকে। সিঁড়ি বেয়ে সোজা লনের ওপর। নির্মাল্যদের জটলার দিকে এগোতে এগোতে শুনল তুলিকার গলা, তরফদার আঙ্কেল তোমাকে গেট খুলে দিতে বলল, আর তুমি খুলে দিলে?

বিষেন সিং কাঁপছে ঠক ঠক করে, বলছে, আমি কী করব, দিদি? আঙ্কেল সাহাব যদি বলেন, বিষেন, দরজা খোলো, বাইরে গাড়ির শব্দ কেন হল দেখব, তাহলে আমি কি গেট না খুলে পারি?

—কিন্তু আঙ্কেল তরফদার কোনদিকে গেলেন তা দেখেছ?

নিবেদিতা জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেলল নির্মাল্যদের। বিভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, তাই পাওয়া যাচ্ছে না শেফালি আর বীথিকে!

নির্মাল্য চিন্তিত মুখে বলল, হ্যাঁ। তাই তো বলল তুলিকা।

বিশাখা অবাক হয়ে বলল, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলিস?

নিবেদিতা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না সে আসলে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে বেশ অনেকটা সময় ধরেই হইচই চলছে কম্পাউণ্ডের ভেতর। আর সে কিনা এতক্ষণ বেঘোরে ঘুমোল হোস্টেলের ঘরে!

বিশাখার কথায় নিবেদিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কেবল। কথাই সরছে না তার মুখে।

গেটের কাছে যেতেই দেখা গেল, আঙ্কেল তরফদার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন হন্তদন্ত হয়ে। ফিরে আসছেন হাঁপাতে হাঁপাতে। যেন দৌড়ে ধাওয়া করেছিলেন কারও পিছু। সে

ভাবেই বললেন, এ তো রীতিমতো কনস্পিরেসি। একটা ট্যাক্সি ফ্যাক্সি পেলে নির্ঘাত ধরে ফেলতাম গ্যাংটাকে।

তুলিকা ভুরুতে কোঁচ ফেলে বলল, কাদের গ্যাং?

আঙ্কেল তরফদারের মোটা থলথলে চেহারা তখন ভীষণ উত্তেজিত, রীতিমতো ষড়যন্ত্র করে মেয়েদুটোকে নিয়ে যাওয়া হল।

—কে নিয়ে গেল আঙ্কেল? আপনার আগে থেকে ঠিক করে রাখা গ্যাং?

আঙ্কেল তরফদার স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আমার গ্যাং!

—তা নয় তো কী! আপনি বিষেন সিংকে গেটের দরজা খুলতে বললেন কেন?

—কেন বলব না? আমি মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মেন্টর'স হাউসের বারান্দা থেকে দেখলাম হঠাৎ কে বা কারা যেন গেটের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার বন্ধও হয়ে গেল পরক্ষণে আমি নেমেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে শুনি, বাইরে গাড়ির স্টার্ট।

তুলিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, তারপর!

—বিষেন সিংকে গেট খুলতে বলতেই সে তাড়াহুড়ো করে গেট খুলল। বাইরে বেরিয়ে দেখি একটা নীল অ্যাম্বাসাডার বেরিয়ে গেল হুস করে।

তুলিকা আবারও হেসে উঠল, বলল, বাহ, ভাল গল্পটা বানিয়েছেন দেখছি।

বলতে বলতে তার চোখ পড়ল নিবেদিতার দিকে, আচ্ছা, নিবেদিতা, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি। এতক্ষণ সবাইকে তো দেখলাম ছোটাছুটি করতে আর তুই হঠাৎ পটভূমি থেকে গায়েব হয়ে গেলি? ফাদার যখন কাল হায়দ্রাবাদ থেকে এসে শুনবেন আরও দুটো মেয়ে চলে গেছে 'আশ্রয়' থেকে, তখন তাঁর মুখের চেহারা কী হবে আন্দাজ করতে পারছিস! তোর যেদিন পাহারা দেওয়ার ডেট, সেদিনই কিনা—

## ॥ ১৩ ॥

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠের শুরু। এরকম একটি দাবদাহের দিন মধ্য দুপুরে কপালে আলোর টিপ লাগানো একটি সাদা অ্যাম্বাসাডার রীতিমতো গম্ভীর চালে ঢুকে পড়ল 'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ডে। গাড়িটির সামনে শাসনের তর্জনী হয়ে অল্প অল্প দুলছে ওয়ারলেসের অ্যান্টেনা। ভেতরে গগলস-চোখে ফর্সা চেহারার চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই একজন পুলিশ অফিসার, তাঁর চোখেমুখে স্পষ্টতই উৎকণ্ঠার ছাপ। তিনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার রাজ কনোজিয়া।

তাঁর অ্যাম্বাসাডারের ঠিক পেছনেই পুলিশের আর একটি জিপ। তাতে মিসিং স্কোয়াড সেলের ইন্‌স্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। 'আশ্রয়'-এর আগের দুটি কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার এখনও তাদের কাউকে উদ্ধার করা যায়নি, তার আগেই আরও দু'দুটো কিশোরী উধাও হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। ঘটনাটা নিশ্চিতই বেশ বড় খবর হয়ে যাবে কলকাতায়। আর্লি ফাস্ট আওয়ারে টেলিফোনে একটি নারীকণ্ঠ যখন জানাল দুঃসংবাদটা, দেবাদ্রি বেশ নড়ে চড়ে বসলেন। এখন মনে হচ্ছে, কোনও একটা পরিকল্পিত র‍্যাকেট কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটিতে

ঘিরে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, পর পর তিনটি ঘটনায় চারজন কিশোরীকে তুলে নিয়ে গেছে, তাতে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি যাতে অ্যারেস্ট হতে পারে কোনও সন্দেহভাজন। তেমন তথ্যপ্রমাণ হাতে না পেলে গ্রেপ্তার করবেনই বা কাকে!

কী করবেন, কী না করবেন এই ভেবে যখন দ্বিধায় টলমল, সেই মুহূর্তে ফোন এল ডি. সি. ডি. ডি. কনোজিয়া সাহেবের, হ্যালো মিঃ সান্যাল, আশ্রয় ইজ ডে বাই ডে বিকামিং ওয়ার হেডেক।

দেবাদ্রি বিভ্রান্তভাবে বলেছিলেন, এগ্‌জ্যাক্টলি, স্যার। ইনভেস্টিগেশন করে যতদূর বুঝতে কাজটা কোনও প্রফেশনাল ক্রিমিনালদের নয়। তবে যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারা ফেশনালদের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। আপনাকে খবরটা কে দিল, স্যার?

—ফাদার নিজেই কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলেন আমাকে। উনি গতকাল দুপুরের হায়দ্রাবাদ গেছেন কী একটা সেমিনার না মিটিঙে যোগ দিতে। আজ সকালের ফেরার কথা ছিল। কিন্তু মিটিং নাকি কাল সন্ধেয় হতে পারেনি ব্যাঙ্গালোরের ধি না আসতে পারায়। মিটিংটা আজ দুপুরে হবে। তাই আজ সন্ধের ফ্লাইট ধরে ফেরা উপায় নেই। উনি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগেই যাতে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে তাই আমাকে বার বার অনুরোধ করলেন। এও বললেন হয়তো 'আশ্রয়' বন্ধ করে দেবেন ঃপর।

—ফাদার খবরটা জানলেন কার কাছ থেকে, স্যার?

—তুলিকা না কী যেন নাম বললেন। ওখানকারই একজন টিচার।

দেবাদ্রি সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও ওই মহিলা ফোন করেছিলেন। বললেন, খনই যেন একবার 'আশ্রয়'-এ যাই। সমস্ত 'আশ্রয়' নাকি দারুণ প্যানিকি হয়ে আছে।

রাজ কনোজিয়া গম্ভীর ধরনের মানুষ। বর্ন অ্যাণ্ড ব্রট আপ ইন আগ্রা। মাঝারি উচ্চতার অফিসার। দেখতে প্রায় সাহেবদের মতো। জেটব্ল্যাক চুল। মোটা গোঁফ। প্রায় সময়েই গগ্‌ল্‌স পরে থাকেন। তাতে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব অবধারিতভাবে তৈরি য়ে যায় যা কোনও সৎ পুলিশ অফিসাররা সাধারণত পছন্দ করেন।

—দেন লেট'স গো ইমিডিয়েটলি।

বসের কাছ থেকে এরকম তারকাচিহ্নিত হুকুম পেতেই দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে ল এসেছেন ডেপুটি কমিশনারের গাড়ির পিছু পিছু। দুটো গাড়ি অফিস-বিল্ডিঙের সামনে বেশ সাড়া পড়ে গেল কম্পাউণ্ডের ভেতর। দুটো গাড়ি থেকে চারপাঁচজন পুলিশ ফিসার নামতে কিছু কৌতূহল, কিছু উঁকিঝুঁকি, কিছু সন্ত্রাস।

ফাদার আজ এখানে নেই বলে তাঁর চেম্বার ফাঁকা। পাশের ঘরে দুই ডেপুটি ডিরেক্টর—ঙ্কেল তরফদার ও আঙ্কেল চট্টরাজ পুলিশ অফিসারদের অভ্যর্থনায় একসঙ্গে চলে এলেন। দেবাদ্রি সান্যাল তাঁদের চেনা, কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় মাপের পুলিশ অফিসার রাজ নাজিয়াকে তাঁরা দেখেননি আগে। তাঁর গাড়ি থেকে নামা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, শেডঅলা লশি-টুপির নীচে গগল্‌স্‌-চোখের রহস্য-ছোঁয়া চাউনি দেখে এমনিতেই বেশ সম্ভ্রম হয়। দের অভ্যর্থনা জানিয়ে ফাদারের চেম্বারেই বসালেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের কারণে।

ডি. সি. ডি. ডি. কনোজিয়াসাহেব টেবিলের সামনে গিয়ে কালো রেক্সিন লাগানো একটা মি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। খুললেন তাঁর গগ্‌ল্‌সটি। গগ্‌লসের নীচে দীর্ঘায়াত চোখ ভারী বুদ্ধিদীপ্ত ও শাণিত। সেই অন্তর্ভেদী চোখ দিয়ে জরিপ করলেন প্রতিষ্ঠানের

অন্যতম দুই কর্ণধারকে। তারপর জানতে চাইলেন গতকাল রাতের আঁধারে ঘটে যাও বৃত্তান্তটির খুঁটিনাটি।

'আশ্রয়' নামের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গত তিন সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত খবরের খে পাচ্ছেন কনোজিয়াসাহেব। এরকম তো প্রায়ই হয় যে, সরকারি 'হোম' কিংবা মেয়েদে হোস্টেল থেকে তরুণীরা পালিয়ে যায় রহস্যজনকভাবে। তাদের কখনও খুঁজে আনতে হ কখনও নিজেরাই ফিরে আসে, কখনও আবার পাওয়াই যায় না। 'আশ্রয়' সম্পর্কে সেরকম একটা ধারণা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু গতকালের ঘটনাটার পর বোঝা যাচ্ছে এটা কোন সাধারণ নিখোঁজ হওয়া নয়। ভেরি ওয়েল-মোটিভেটেড অ্যাণ্ড প্রি-প্ল্যান্‌ড্।

তাঁর অপর্যাপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর রণধীর তরফদারই। থলথা চেহারার লোকটি বেশ টেনসনে আছেন। দুই কিশোরীর নিখোঁজ হওয়ার খুঁটিনাটি যথ সম্ভব বিবৃত করে বলছিলেন, স্যার, এই প্রতিষ্ঠানের একেবারে গোড়া থেকেই আমি যুক্ত। ব জেলায় ঘুরে ঘুরে ক্যাম্প করে বহু পরিশ্রমে এই সব ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করে এনে তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব বলে। দীর্ঘ চার বছর খুব সুনামের সা কাজ চালিয়ে হঠাৎ তিন সপ্তাহের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারিনি

ডি. সি ডি. ডি. হঠাৎ পাশে ঝুঁকে পড়ে ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে কিছুক্ষণ নি স্বরে কথা বললেন। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমরা আরও জোরদ তদন্ত শুরু করছি কাল থেকে। কিছু কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে ইতিমধ্যেই এসেছে। আ করছি কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারব। আপাতত কম্পাউণ্ডের বাই আমরা একটা নাইট পেট্রলের ব্যবস্থা করছি আজ থেকে। আর এখন জায়গাটা ঘুরেঘু দেখব। ওপরের মেন্টর'স হাউস, ওপাশের স্কুল আর হোস্টেল, সেই সঙ্গে ফাদারের বাংলো কম্পাউণ্ডের ভেতরের সবটাই একবার চাক্ষুষ করতে চাই।

চম্পক চট্টরাজ সাধারণত কম কথা বলেন। কাজও করেন নিঃশব্দে তাঁর টেবিলে সে বসে। আজ হঠাৎ বললেন, স্যার, হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা খুবই পেয়ে গেছে কালকের ঘটনায়।

—টেল দেম নট টু ওরি, নাইট পেট্রলের ব্যবস্থা চালু থাকবে যতদিন না অপরাধীরা ধ পড়ে। আর পারমিশান ছাড়া কেউ বাইরে যাবে না।

ডি. সি. ডি. ডি. রাজ কনোজিয়া অতঃপর ঘুরে ঘুরে দেখলেন অত বড় কম্পাউণ্ডটার এ কোণ ও-কোণ। দোতলায় মেন্টর'স হাউসে উঠে লক্ষ করলেন ও পাশে আর একটা ঘে সিঁড়ি কীভাবে গড়িয়ে গেছে পাঁচিলের দিকে। ওই সিঁড়িটা দিয়েই ক'দিন আগে আঙ্কে তরফদার রাতের বেলা নেমেছিলেন তুলিকাকে রিয়ার প্লেনের টিকিটের কথা মনে ক দিতে। সাধারণত তালা বন্ধ থাকে সিঁড়িটা। তার একটা চাবি থাকে আঙ্কেলের কাছে। ডেপু কমিশনার কী যেন ভেবে বললেন, চাবিটা একবার আনুন তো, মিঃ তরফদার। এটা দি নেমে দেখি।

আঙ্কেল তরফদার তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘর খুলে চাবিটা নিয়ে এলেন। অনেকদিনের পুর তালা। তালা খুলে নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন সিঁড়িটা দিয়ে শুধু নীচেই নামা যায় তা ন তার একটা ল্যাণ্ডিং বেঁকে গেছে একতলায় অফিসঘরের দিকে। অন্য একটা ল্যাণ্ডিং হয়েছে একটা জানলাবিহীন ঘরে। নীচে নেমে লনে পা দিয়ে রাজ কনোজিয়া সিঁড়িটা কিন্তু ভারী অদ্ভুত, ইচ্ছে করলে দু-চারজনকে ওই গুমঘরে আটক করে রাখা যায়, বলেন, মিঃ তরফদার?

মিঃ তরফদারকে বিভ্রান্ত দেখাল হঠাৎ। বললেন, কিন্তু ও-ঘরটা কখনও ব্যবহার করা ানি, স্যার।

ডেপুটি কমিশনার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, মিঃ তরফদার, সেদিন রাতে ওপাশের ব্যবহার না করে হঠাৎ এই দু-নম্বরি সিঁড়িটার তালা খুলেছিলেন কেন বলুন তো?

—দু নম্বর সিঁড়ি! আঙ্কেল তরফদারের জিবে হঠাৎ যেন জড়িয়ে গেল কথাটা। সামলে বললেন, আসলে এই সিঁড়িটাই আমার ঘরের সামনে। চট করে খুলে নীচে নেমে যাওয়া য। না হলে আমাকে অনেকটা ঘুরে যেতে হত হোস্টেলে পৌঁছাতে।

—শুধু সেই কারণে! কিন্তু আপনার তো অত তাড়া ছিল না সে-রাতে যে হঠাৎ তাড়া ড়া করে মরচে-পড়া তালা খুলে এদিক দিয়েই নামতে হবে!

আঙ্কেল তরফদার অবশ্য সে-কথার কোনও তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারলেন না। বাদ্রি সান্যাল পাশেই ছিলেন, আঙ্কেলের ভাবভঙ্গি তাঁরও মনঃপুত না-হওয়ায় বেশ কড়া াখে তাকালেন মাকু চেহারার পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটির দিকে।

পুলিশের দলটি ততক্ষণে স্কুল-বিল্ডিঙের দিকে রওনা দিয়েছে। একতলায় স্কুল, দোতলায় কদিকে মেয়েদের হোস্টেল, অন্যদিকে ছেলেদের। মেয়েদের সংখ্যাটা অবশ্য দুই-তীয়াংশ। সেদিকটায় আগে গেলেন ডেপুটি কমিশনারসাহেব। পরপর অনেকগুলো ঘর। ানওটা দশ বাই দশ, কোনওটা দশ বাই বারো, কোনওটা দশ বাই চোদ্দ। ঘরের আকার নুযায়ী দুই, তিন বা চারজন করে থাকে ছেলেমেয়েরা। যে-ঘরটায় চৈতালি আর অতসী াকত সেটাও যেমন দেখলেন, যে-ঘরটিতে শেফালি আর বীথি থাকত তাও দেখলেন টিয়ে খুঁটিয়ে।

বাজ কনোজিয়ার অফিসার হিসেবে খুব সুনাম পুলিশমহলে। কথা বলেন কম, কিন্তু নুষ্যচরিত্র চিনতে তাঁর জুড়ি নেই। আই.পি.এস হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে চাকরি পাওয়ার । কর্মজীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছে জেলায় জেলায়। খড়গপুরে এস.ডি.পিও হিসেবে জ করার সময় ওখানকার মাফিয়াদের সঙ্গে এমন টক্কর দিতেন যে, ধুরন্ধর লোকগুলো মের মতো ভয় করত রাজসাহেবকে। সেখান থেকে শুরু করে ডেপুটি কমিশনার হওয়ার বর্তী সময়ে এই আপাতশান্ত রাজ্যটির ভেতরের ভালমন্দে মেশানো চরিত্রটা দেখে লেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে।

এহেন ডি.সি.ডি.ডি-কে যেমন ভক্তি করেন দেবাদ্রি সান্যাল, তেমন ভয়ও। কথা বলেন ও কণ্ঠস্বরে, কিন্তু কথার ভেতর লকলক করতে তাকে জেদের সঙ্গে মাখোমাখো ভয়ঙ্কর জ। আজও 'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ড তন্নতন্ন চষে ফেলার পর চোখে পরে ফেললেন লো চশমাটা। পরক্ষণে দেবাদ্রি সান্যালকে বললেন, 'উই শুড নট লেট দিস ন্যাস্টি াফেয়ার কনটিনিউ। লেট আস ফাইণ্ড আউট দ্য স্ট্র্যাটেজি ইন অ্যা মিটিং টু বি হেল্ড রো অ্যাট মাই চেম্বার।' বলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন, সময় দেবাদ্রির নজরে পড়ল, পুলিশের দলের সঙ্গে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কম্পাউণ্ডের কোণে ও-কোণে, তাদের মধ্যে কখন যেন মিশে গেছেন গার্গী চৌধুরিও। গার্গীকে দেখেই বাদ্রি তাঁর বসকে বললেন, স্যার, মিট হার, সি ইজ গার্গী চৌধুরি। এর আগে বেশ কয়েকটা সে খুব সাহায্য করেছেন আমাকে। বলতে পারেন সি হ্যাজ অ্যান ইনার আই। ভেরি টেলিজেন্ট অ্যাণ্ড শার্প।

—ইজ ইট। বাজ কনোজিয়া তাঁর স্বাভাবিক ভদ্রতায় হাত জোড় করে নমস্কা জানালেন, কিন্তু গার্গী সম্পর্কে তেমন সম্ভ্রম তাঁর ভেতর উসকে উঠল কি না তা বোঝা গে না ঠিক। শুধু বললেন, উই হোপ দিস টাইম অলসো ইউ উইল হেল্প আস্—

রাজসাহেবের সাদা অ্যাম্বাসাডার ততক্ষণে তার স্টিল-অ্যান্টেনার তর্জনী উঁচিয়ে, কপালে রক্তচক্ষু মেলে বেরিয়ে গেল হুশ করে।

দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর বসকে একটি সাষ্টাঙ্গ স্যালুট উপহার দিয়ে তাকালেন গার্গীর দিকে চলুন মিসেস চৌধুরি, একসঙ্গে ফেরা যাক, যেতে যেতে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করে আপনার সঙ্গে। আপনিও নিশ্চয়ই 'আশ্রয়'-এ পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন?

—ও, তা আর বলতে! গার্গীকে খুবই চিন্তিত দেখায়। চলুন, আমিও ভাবছিলাম আপনা সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটা পোস্টমর্টেম করা দরকার।

দুই আঙ্কেল, অন্যান্য তত্ত্বাবধায়ক, কিছু ছাত্রছাত্রী, কয়েকজন কর্মচারী সবাই এতক্ষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছিল পুলিশের তদন্তের ধারা। দু'দুটো গাড়ি, এত এত পুলিশ দে সব্বাই তটস্থ। এখন গার্গীর সঙ্গে দেবাদ্রি সান্যালও বেরিয়ে যেতে একটু স্বস্তি। অথবা হয়তে স্বস্তি নয়ও, অস্বস্তির শুরু। ডেপুটি কমিশনার যেরকম গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেলেন, 'আশা কর কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যবস্থা নিতে পারব', তাতে একটা শঙ্কা ঘূর্ণি খাচ্ছে সবার মনে। চল মনে মনে টানাপোড়েন। ব্যবস্থা নিতে পারে পুলিশ, কার বিরুদ্ধে—সে সব ভাবনা গিজগি করছে আশ্রয় বাসিন্দাদের মগজে।

দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর জিপকে পিছনে অনুসরণ করতে বলে উঠে বসলেন গার্গী অ্যাম্বাসাডারের নরম আরামে, মিসেস চৌধুরি, আপনি তো 'আশ্রয়'-এর জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। এর নাড়িনক্ষত্র আপনার ভাল মতো জানা। কিছু আঁচ করতে পারছেন কেন ঘট ঘটনাগুলো। কে বা কারা ঘটাচ্ছে?

গার্গী তো এই ভাবনাটাই ভাবছে ক'দিন ধরে। কিছুক্ষণ ভাবনাটা আরও ঘুলিয়ে নি বলল, সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার আগে বরং যে-ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে একে-এ তার একটা পরিষ্কার ছবি এঁকে নেওয়া যাক, মিঃ সান্যাল।

—যেমন?

—এক, 'আশ্রয়'-এ মেয়েদের সংখ্যা বেশি হলেও অল্পবয়সী ছেলেরাও কিন্তু বাস ক তাদের এখনও পর্যন্ত কেউ নিখোঁজ হয়নি। অর্থাৎ যে বা যারা কাজটা করছে তাদের টা অল্পবয়সী মেয়েরাই।

—এগ্‌জ্যাক্টলি।

—দুই, একটি মেয়ে নিখোঁজ হল নিউমার্কেটে ফুল আনতে গিয়ে। বাকি তিনজন রা অন্ধকারে হোস্টেল থেকেই উধাও। প্রথম মেয়েটিকে যদি মনে করা যায় অপহৃত হয়ে কোনও দুর্বৃত্তের দ্বারা, পরের দুটি ঘটনায় কিন্তু তা আর বলা যাচ্ছে না। অপহরণ করা হয়ে পরিকল্পিতভাবে। এবার ভাবা যাক, সন্দেহভাজন কে বা কারা।

—ঠিকই বলেছেন, মিসেস চৌধুরি। এ ব্যাপারে যাদের ওপর প্রাথমিক সন্দেহ বর্তা তাদের একজন হলেন সিস্টার নিবেদিতা। অবশ্য তিনি একাই করছেন না ব্যাপারটা। স দোসর তাঁর প্রাক্তন স্বামী।

গার্গী দেবাদ্রি সান্যালের দিকে তাকাল, আপনার এরকম সন্দেহ হওয়ার কারণ?

—চৈতালি নিখোঁজের সময় সিস্টার নিবেদিতা অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 'আশ্রয়' থেকে বেরুবার আগে নিশ্চয় খবর দিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে। অতঃপর পটভূমিকায় নীল অ্যাম্বাসাডারের আবির্ভাব। আর দ্বিতীয় দুটি রাতের ঘটনার ঠিক এক বা দুদিন আগে বিলাস সান্যাল দেখা করতে এসেছিলেন নিবেদিতার সঙ্গে। এটা কিন্তু খুবই সিগনিফিক্যান্ট।

গার্গী একটু আশ্চর্য হল, আর ইউ শিওর?

—হ্যাঁ। আমি ভিজিটরস বুক দেখে মিলিয়ে নিয়েছি। চৈতালি নিখোঁজ হয় বাইশে এপ্রিল। অতসী উধাও হয় ঠিক তার চারদিন পর ছাব্বিশে এপ্রিল। বিলাস সান্যাল ঠিক তার দুদিন আগে—চব্বিশে এপ্রিল দেখা করেছেন নিবেদিতার সঙ্গে। তারপর বীথি আর শেফালি নিখোঁজ হল তেরোই মে। তার আগের দিন বারোই মে বিলাস সান্যাল এসেছিলেন 'আশ্রয়'-এ।

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবার, যদি নিবেদিতা সত্যিই জড়িত থাকে এ-ব্যাপারে, তাহলে আমি সত্যিই আশ্চর্য হব, মিঃ সান্যাল। নিবেদিতা ইজ অ্যা গুড সোল। আই নো হার পারসোনালি।

—সে তো তিন-চারবছর আগে চিনতেন, মিসেস চৌধুরি। তারপর অনেকগুলো ঋতু হয়ে গেছে 'আশ্রয়'-এর ছাদের ওপর দিয়ে।

—আপনার আর কাউকে সন্দেহ হয় না, মিঃ সান্যাল?

—হ্যাঁ। আঙ্কেল তরফদার ইজ অ্যা মিস্টেরিয়াস ক্যারেকটার। তাঁর গতিবিধি, মোটিভ আমাদের জানা দরকার।

—আর কাউকে?

—ফাদার অর্থাৎ ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যালের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

গার্গীকে চিন্তিত দেখায়, আপনার কি মনে হচ্ছে ফাদারই তাঁর এত দিন ধরে নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের সুনাম মাত্র কয়েকদিনেই এভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবেন?

—নাথিং ইজ ইমপসিব্‌ল, মিসেস চৌধুরি। সব রকম সম্ভাবনার দিকই খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের।

—হ্যাঁ। তবে নিঃসন্দেহ হওয়ার আগে কয়েকটা তথ্যও এ-বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে আপনাকে। এক, যে দুদিন 'আশ্রয়' থেকে মেয়েরা উধাও হয়েছে, ফাদার কোনও বারই কলকাতায় ছিলেন না। প্রথমবার ছিলেন দিল্লিতে অল ইণ্ডিয়া ডেসটিটিউটস্ কনসার্নস কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হয়ে। দ্বিতীয়বার ছিলেন হায়দ্রাবাদে তাদেরই আর একটা মিটিঙে।

দেবাদ্রি ঘাড় নাড়েন, তথ্যটা আমার মাথায় আছে।

—দুই, গত চার বছর ফাদার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এত পরিশ্রম করেছেন যে, তাঁর পক্ষে মাত্র পনের-কুড়িদিনে সেটি ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্র করা মনে হয় অসম্ভব। বিশেষ করে আমরা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি।

দেবাদ্রি চিন্তিত, আপনার তাই মনে হয়?

—তৃতীয় তথ্য হল, অপহরণের দুটি রাতেই আঙ্কেল তরফদার হল্ট করেছিলেন আশ্রয়'-এ। যে-নীল অ্যাম্বাসাডারটিতে করে মেয়েদের অপহরণ করা হচ্ছে, সেটিতে করে আমি 'আশ্রয়'-এর গেটে নামতে দেখেছি।

দেবাদ্রির মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে ওঠে, তাহলে আপাতত তিন সন্দেহভাজনেরই মোটিভ, গতিবিধি ও কার্যাবলি ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে, মিসেস চৌধুরি। এক বিলাস সান্যাল, দুই, বণবীর তরফদার, তিন. ফাদার অর্থাৎ ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যাল।

গার্গী হাসল মৃদু, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আসল কালপ্রিট অলক্ষে আমাদের আলোচনা শুনে হাসছেন মিটমিট করে।

## ॥ ১৪ ॥

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারের চমৎকার ঝকঝকে চেম্বারটিতে মিটিং চলাকালীনই ফোন এসেছিল পুলিশ কমিশনার দীপক মালব্যব. 'আশ্রয়' নিয়ে কি কিছু করতে পারলে, কনোজিয়া? ফাদার তো আমাব ফাদারের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছেন। কাল বিকেলে ফোন করেছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে, তারপব রাতে কলকাতায় ল্যাণ্ড করে এয়ারপোর্ট থেকেই শুরু করেছেন ফোনাফোনি। একটু আগে আশ্রয় থেকে আবার ফোন।

—উই আর লুকিং ই টু দা ম্যাটার, স্যার, ডি সি ডিডি-র নিস্তরঙ্গ জবাব। কোনও কিছুতেই তেমন উত্তেজিত হন না ডি সি সাহেব। জানেন তাঁদের চাকরিতে টেনসন হল একটা অঙ্গ। সেটা হাত-পা-মগজের মতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কোনও বিষয়ে বেশি টেনসন করা মানেই তা পরোক্ষে সাহায্য করে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে।

রিসিভার রেখে ডি সি-সাহেব তাকালেন তাঁর সবুজ রেক্সিন-আঁটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটির ওপাশে বসা পুলিশ-অফিসারদের দিকে। ঘুরে ফিরে তাঁব কড়া নজর অবশ্য আছড়ে পড়ছে ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের ওপর। তিন সপ্তাহেরও বেশি পার হয়ে গেছে, ডেসটিটিউটস হোস্টেল থেকে একের পর এক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে কিশোরী মেয়েরা, অথচ তাদেব কোনও পাত্তাই করা যাচ্ছে না। আজ অবশ্য দেবাদ্রি সান্যাল অনেকগুলো ক্লু তুলে ধরলেন মিটিংয়ে। সেগুলোই এ-টু-জেড আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সন্দেহভাজনদের ওপর আলাদা করে নজরদারি শুরু হবে আজ থেকে। দুই সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে দুটি টিম এই নজরদারি চালাবে পর পর কয়েকদিন। এক সপ্তাহ পরে আবার মিটিং বসবে ডি.সি সাহেবের ঘরে। কয়েকদিনের নজরদাবিতে কী কী তথ্য পাওয়া গেল, তাতে কালপ্রিটদের ধরাব ব্যাপারে এক ইঞ্চিও এগুনো গেল কি গেল না তার চুলচেরা তন্নতন্ন আলোচনা হবে মিটিংয়ে।

নজরদারির ব্যাপরে কিছু টুকিটাকি টিপস্ দিয়ে ডিসি ডিডি বললেন, বেস্ট অফ লাক, মিঃ সান্যাল।

প্রথম টিমটির নেতৃত্বে থাকলেন সাব ইন্সপেক্টর অলয় বসুরায। দেবাদ্রি তাদের টিমটিকে নিয়ে আলাদা করে বসে নির্দেশ দিলেন বিলাসী সান্যালের গতিবিধি, তার অফিস, তার পরিবার-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যপঞ্জি যেন আগামী দু দিনের মধ্যে সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো হয়।

অলয় বসুরায় কথা বলেন বেশ হিসেব করে। চেহারা ছোটখাটো হলেও তাঁর কাজের ধরন খুব গোছানো। দু দিনের মধ্যেই বিলাস সান্যাল সম্পর্কিত যে তথ্যাবলি এনে হাজির করলেন দেবাদ্রির সামনে, তা মোটামুটি চমকপ্রদ এবং অভিনবও।

বিলাস সান্যাল বছর পঁয়ত্রিশের এক ধুরন্ধর, পোড়খাওয়া, মেধাবী যুবক। চব্বিশ বছর বয়সে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন সফ্টওয়্যারের নাড়িনক্ষত্র শিখতে। ফিরে এসেছিলেন বছর চারেক পর অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করে। দক্ষিণ কলকাতায় এখন একটা চমৎকার শো-রুমের মালিক। তাতে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য কম্পিউটার বিক্রি করছেন তা এ দেশের বিশেষজ্ঞদের কাছেও যথেষ্ট সম্মোহের বিষয়। বিলাস সান্যালের চেহারাটিও ভারী চমৎকার। তেমনই তার কথা বলার আঁটোসাটো কায়দা। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও যথেষ্ট ওজস্বী।

এহেন বিজনেস ম্যাগনেটটি গত দশ বছরের মধ্যে নিজেরই বিপত্তির কারণ হয়ে উঠেছেন তাঁর কিছু আচার-আচরণ ও স্বভাবদোষে। এক, বছর ছয়েক আগে তাঁর মহার্ঘ সার্টিফিকেটগুলি ও অভিজ্ঞতার পাহাড় দেখিয়ে একটা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন একত্রিশ লাখ টাকা। উদ্দেশ্য সফ্টওয়্যারের ব্যবসার পত্তন করা ও বেশ কিছু যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান। ব্যবসা খুলেছিলেন কি না জানা যাচ্ছে না, কিন্তু কাগজেকলমে তার অস্তিত্ব বহাল। সেখানে প্রতি বছর প্রচুর লস দেখিয়ে একদিকে ফাঁকি দিচ্ছেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে, অন্যদিকে আয়কর দফতরকেও। ব্যবসায়ে ক্ষতির পরিমাণ এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, নিজেকে দেউলে হিসেবে ঘোষণা করেছেন এ-বছর। দুই, দেউলে বিলাস সান্যাল কিন্তু চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের ব্যস্ত এলাকায় খুলে বসেছেন একটা সফ্টওয়্যারের শো-রুম। তার ভেতরে ঝকঝকে চেম্বারে বসে দামি সিগারেটে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে তিনি খরিদ্দারের কাছে বর্ণনা করেন তাঁর উদ্ভাবিত কম্পিউটারগুলির গুণপনা। চেম্বার-সংলগ্ন অ্যান্টিচেম্বারে থাকে দেশি বিদেশি পানীয়ে ভর্তি সেলার। শো-রুমটির মালিকানা কিন্তু জনৈক রূপসী মহিলা ডোয়েনা সেনগুপ্তের। ডোয়েনা সেনগুপ্তের সঙ্গে বিলাস সান্যালের কী সম্পর্ক তা ঠিক আবিষ্কৃত হয়নি এখনও, কিন্তু ডোয়েনা সেনগুপ্তর একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট আছে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। সেই ফ্ল্যাটে কখনও কখনও রাত্রিবাস করেন বিলাস সান্যাল। তিন, বিলাস সান্যালের জীবনযাপনের অনেকটাই রহস্যময়। তাঁর লম্বাচওড়া চেহারা ও সুন্দর মুখশ্রীর কল্যাণে খুব সহজেই সুন্দরী মেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্য হন। তাঁকে প্রায়শ বিভিন্ন মহিলাদের সঙ্গে গাড়িতে ঘুরতে দেখা যায়। তাদের কার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক তাও এখনও পরিষ্কার নয়। তবে পরনের শার্ট-প্যান্ট বদলানোর মতো জীবনসঙ্গিনী যে বদলান তা পুলিশ আবিষ্কার করে ফেলেছে ক'দিনের নজরদারির মাধ্যমে। তাঁর বর্তমান স্ত্রীর নাম বিচিত্রিতা সান্যাল। থাকেন সল্টলেকে ছবির মতো একটি বাংলোয়। সম্ভবত এটি তাঁর চতুর্থ স্ত্রী।

এহেন বিলাস সান্যালের টেকনিকালার বায়োডাটায় বার দুই গভীরভাবে চোখ বোলালেন দেবাদ্রি। সিদ্ধান্ত নিলেন লোকটিকে একবার স্বচক্ষে দেখা দরকার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আঁচ করতে হবে 'আশ্রয়'-এর ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ আছে কি না। লোকটি কেনই বা যায় নিবেদিতার কাছে।

সিদ্ধান্ত নিতে যতটুকু দেরি করেন দেবাদ্রি, কাজে এগিয়ে যান তার চেয়েও বেশি দ্রুত। ঘড়িতে বিকেল চারটে দেখে তখনই রওনা দিলেন একরকম সাদা পোশাকে। বাহন হিসেবে জিপের পরিবর্তে একটা সাদামাটা ছোট্ট মারুতি। পুলিশের বেশে নয়, সাধারণ একজন

ক্রেতার সাজে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে গেলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের ওপর 'বেসিক ভিস্যুয়াল ম্যাজিক' নামের ঝকঝকে শো-রুমটির কাচের দরজার সামনে।

শো-রুমটির ভেতরটায় চার দেওয়ালে শুধু আয়না আর আয়না। এত আয়না থাকায় শো-রুমটা যেমন আয়তনে দেখায় অনেকখানি বড়, বৈচিত্র্যেও সত্যিই অদ্ভুত। শো-রুমের ভেতর প্রতিটি সেলসম্যান ও ক্রেতার এত অসংখ্য অবয়ব ভেতরে দৃশ্যমান হয় যে, প্রায়শ বিভ্রান্তি হয় কোন অবয়বের প্রকৃত অবস্থান ঠিক কোথায়। দেবাদ্রি সান্যাল এখানে-ওখানে জিজ্ঞাসা করতে করতে, এ-আয়নায় ও-আয়নায় ঠেক খেতে খেতে বিলাস সান্যালের চেম্বারে যখন গিয়ে পৌঁছলেন, বেশ বিভ্রান্ত লাগছে নিজেকে।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেবাদ্রি চমৎকৃত। বিলাস সান্যালকে যতখানি সুপুরুষ ও সুন্দর অনুমান করেছিলেন, লোকটি তার চেয়েও রূপবান। সিনেমার হিরো হলে দিব্যি

। দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন বছর তিরিশের এক অসম্ভব সুন্দরী মহিলার সঙ্গে নিচু গলায় আলাপনে ব্যস্ত। হঠাৎ দেবাদ্রি আয়না-লাগানো দরজা ঠেলে ঢুকতেই সচকিত হয়ে উঠলেন দুজনে। পরক্ষণে মহিলা তাঁর দামি বালুচরি শাড়ি সামলে উঠে পড়লেন চেয়ার থকে, মৃদুকণ্ঠে বললেন, তা হলে ওই কথাই রইল। ডোন্ট ডেভিয়েট ফ্রম ইয়োর ওয়ার্ডস।

মহিলা তাঁর সমৃদ্ধ শরীরে একটা ঝটকা দিয়ে পেছন ফিরলেন, বিদ্যুৎ-মাখানো চোখজোড়া দিয়ে একবার ছুঁয়ে ফেললেন দেবাদ্রির শরীর, পর মুহূর্তে হাই হিলে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন দরজা ঠেলে। দেবাদ্রি পলকের জন্য হিপনোটাইজ্‌ড। মহিলার শরীরে যেন জাদু আছে।

বিলাস সান্যাল অবশ্য ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলেন দেবাদ্রির দিকে, গ্ল্যাড টু মিট য়্যু মিঃ...

—সান্যাল, দেবাদ্রি তাঁর নামের প্রথম অংশ আপাতত চাপা দিয়ে পদবিটাই এগিয়ে দিলেন রূপবান পুরুষটির দিকে।

—ওহ্, ফাইন। দেন ইট'স সান্যাল ভার্সাস সান্যাল, বলে হো হো করে গলায় দমক ফুটিয়ে হেসে উঠলেন, হ্যাঁ, তা হলে তো আপনাকে একটু স্পেশাল খাতির করতেই হয়, বলে বেল বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে বললেন, সীতারাম যাও তো, সাহেবের জন্যে ঠাণ্ডা কিছু একটা নিয়ে এসো

সীতারাম নামের বোকাহাবা ধরনের মাঝবয়সী লোকটি মুহূর্তে অদৃশ্য হতে বিলাস সান্যাল আবার বললেন, মিঃ সান্যাল, আপনার সেবায় আমি কীভাবে লাগতে পারি?

দেবাদ্রি সান্যাল চোখ অনুবীক্ষণ করে লোকটিকে মাপছেন তখন। এরকম মেয়ে-মজানো চেহারার লোক যে সাধারণত সুবিধের হয় না তাঁর আঠারো বছরের পুলিশের চাকরির অভিজ্ঞতায় জেনেছেন। যে-সুন্দরী মহিলাটির সঙ্গে ভারী একান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন, তিনিই ডোয়েনা সেনগুপ্ত কিনা এখনও দেবাদ্রি জানেন না। সে-প্রসঙ্গ আপাতত মনে মুলতুবি রেখে চলে এলেন বিলাস সান্যালের এলেমদারি বুঝতে, আচ্ছা, মিঃ সান্যাল, সফ্‌টওয়্যারের মার্কেটে আপনার ভারী সুনাম। আপনার মস্তিষ্কটাই নাকি একটি চলমান কম্পিউটার। বিদেশে গিয়ে সেই কম্পিউটারটি আরও বৈচিত্র্যে ভরপুর করে এনেছেন। শুনলাম যে-সফ্‌টওয়্যার আপনি তৈরি করছেন তা নাকি আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এখানকার মার্কেটে! জিনিসটা একটু বুঝতে চাই।

বিলাস সান্যাল সামান্য তৃপ্তির হাসি হাসলেন, আসলে কি জানেন, মিঃ সান্যাল, সব মানুষের জীবনেই কিছু কিছু ইচ্ছে থাকে যা সুযোগ পেলেই উস্‌কে ওঠে। বলতে পারেন তার ইনবর্ন উইশেস। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ শিল্পী, লেখক বা কবি, কেউ চলচ্চিত্রকার। আবার কেউ ভালবাসেন দেশে-বিদেশে বেড়াতে, কেউ পাহাড়ে চড়তে, কেউ বা বেরিয়ে পড়তে চান সমুদ্র অভিযানে। আমি যে সফ্‌টওয়্যার তৈরি করছি তা হল মানুষের এ-ধরনের ইচ্ছা পূরণের একটা হাতিয়ার।

দেবাদ্রি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না সুদর্শন বিজনেস-ম্যাগনেটটির বক্তব্য, মানে?

—তা হলে ব্যাপারটা আপনাকে দেখতে হবে নিজের চোখে। কম্পিউটার হল একটা ম্যাজিক বক্স, যার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেন গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইন্টারনেটে ঢুকলে আপনি হাতের তেলোয় তুলে নিতে পারেন সৌরজগতের যে কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও।

বলতে বলতে বিলাস সান্যাল তাঁর টেবিলের একপাশে রাখা কম্পিউটারটি চালু করে দিলেন কী-বোর্ডে বোতাম পুশ করে। হাতের মাউস এদিক-ওদিক সরিয়ে ক্লিক করতে করতে বললেন, ধরুন আপনার এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছে হল হাওয়াইয়ান দ্বীপে—

কম্পিউটারের পর্দায় তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠল চারপাশে ঘননীল সমুদ্রে ঘেরা একটা সুবজ দ্বীপ। তার চারপাশের বালুকাবেলায় সমুদ্র বড় বড় ঢেউ হয়ে ভাঙছে একের পর এক, তার সাদা ফেনা ছিটোচ্ছে ঘন কুয়াশার মতো এক রহস্যময় আবরণ।

—আপনার ইচ্ছে হল বালুকাবেলায় একটা দোলনা খাটিয়ে তাতে দোল খেতে খেতে কিছুক্ষণ সমুদ্রের এই জলকেলি দেখা। সে-দৃশ্যে ক্লান্ত হলে আপনি দোলনা থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতে পারেন পাশেই ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো সুন্দর এই বাংলো বাড়িটায়।

কথা বলছেন বিলাস সান্যাল, আর মাউসে ক্লিক করতে করতে কখনও দুলিয়ে দিচ্ছেন একটা ছোট্ট দোলনা, পরক্ষণে বালুকাবেলায় ফুটিয়ে তুললেন একটা বাংলোবাড়ি। একটা অবয়ব সেই বাংলোবাড়িব গেটের কাছে পৌঁছতেই নিজে থেকেই খুলে গেল দরজাটা। অবয়বটি ঢুকে পড়ল মাঝখানের সাজানো ঘরটিতে। সেই ঘরে মানুষ যা যা বিলাস উপকরণ মনে মনে চায় তার সবই মজুত। সেই অবয়বটি ঘরের ভেতর ঘুরছে ফিরছে, আর যা খুশি করার আনন্দে থইথই করছে।

—আপনি এখন এ-ঘরে ও-ঘরে ঢুকে ইচ্ছেমতো যে-কোনও গান শুনতে পারেন, সিনেমা দেখতে পারেন, অথবা গল্প করতে পারেন স্বপ্নের মতো কোনও নারীর সঙ্গেও।

দেবাদ্রির কপালে একটা ভাঁজ দীর্ঘায়াত হয়। বাইরে দিনের আলো শেষ হয়ে তখন সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত।

—এই দেখুন, কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠছে অসংখ্য নারীর মুখ। প্রত্যেক মুখের পাশে পাশে তার বায়োডাটা, তার গুণাগুণ, তার কণ্ঠস্বর, তার কথা বলার ভঙ্গিমা সব বর্ণনা করা আছে। আপনি যার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন, যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবেন, মাউস নিয়ে ক্লিক করলেই সে হাজির হবে পর্দায়। আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

দেবাদ্রি আশ্চর্য হলেন, কথা বলবে?

—হ্যাঁ। এই দুটো স্পিকার দেখছেন, এর একটি আপনার জন্যে, অন্যটি কম্পিউটারের পর্দায় মেয়েটির। আপনি যেমন যেমন কথা বলবেন, দেখবেন মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। কখনও ফিরতি প্রশ্নও ছুড়ে দিতে পারে আপনাকে।

—তা কি সম্ভব?

—হ্যাঁ। সেভাবেই প্রোগ্রামিং করা আছে ভেতরে। এই দেখুন—

বলে মাউসে ক্লিক করতেই বছর সাতাশ-আঠাশের একটি মেয়ে ফুটে উঠল পর্দায়, একগাল হেসে বলল, হাউ আর ইউ, মিঃ সান্যাল?

'মিঃ সান্যাল' শুনে দেবাদ্রি রীতিমতো স্তম্ভিত। বিলাস সান্যাল তখন বললেন, ক্যারি অন মিঃ সান্যাল। কিছু একটা জিজ্ঞাস করুন ওকে। ওর নাম দোলা।

দেবাদ্রি বুঝে উঠতে পারলেন না হঠাৎ একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কী কথা তিনি বলবেন!

দেবাদ্রির এই চকিত দ্বিধা দেখে বিলাস সান্যাল হেসে বললেন, দোলা, হি ইজ ফিলিং শাই অব ইউ।

—ফিলিং শাই? পর্দায় দোলা নামের মেয়েটি এমন হইচই করে হেসে উঠল যে দেবাদ্রি বাধ্য হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপাতত এই পর্ব বন্ধ থাক। আরও কী কী ম্যাজিক আপনি দেখাতে পারেন দেখি তো।

—ধরুন, আপনি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন হিসেবে। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আরও বহু রকমের জলযান আসছে।—কোনওটা তীব্রবেগে, কোনওটা মৃদুমন্দ গতিতে, আপনাকে এগোতে হবে তাদের কাটিয়ে কাটিয়ে।

বলতে বলতে কম্পিউটারের পর্দায় প্রথমে প্রশান্ত মহাসাগর, তারপর একটি সুদৃশ্য জাহাজ। ডেকের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ। তারা আসছে এক-একরকম গতিতে। বিলাস সান্যাল তাঁর মাউসে ক্লিক করে চলেছেন, আর জাহাজটার দু'পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে পার হয়ে আসছে জলযানগুলো।

—এও এক ধরনের ভিডিও গেমস্, দেবাদ্রি সান্যাল বিড়বিড় করলেন।

—সার্টেনলি নট, বিলাস সান্যাল প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, তা হলে আপনাকে আরও নতুন কিছু দেখাই।

বিলাস সান্যাল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন তাঁর অ্যান্টি-চেম্বারে। ঘরের মধ্যে তখন দেবাদ্রি একদম একা। খেয়াল হতেই তাঁর পুলিশি-মস্তিষ্ক জেগে উঠল চকিতে। ওল্টাতে লাগলেন টেবিলের ওপর রাখা খাতা, বই, কাগজপত্রের রাশ। তার মধ্যেই সহসা উঠে এল একটা প্রমাণসাইজের অ্যালবাম। তার পৃষ্ঠা ওল্টাতেই দেবাদ্রি বিস্ময়ের তুঙ্গে। তার ভেতর অজস্র ফটোগ্রাফ। প্রতিটি ফটোই আঠারো থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীদের। সবারই বেশবাস অসম্বৃত।

দেবাদ্রি তখন উত্তেজনায় ঘামছেন। বিলাস সান্যাল এত-এত তরুণীর ফটো নিয়ে কী করেন ভাবতে গিয়ে প্রায় দিশেহারা। প্রায় একশো ফটোগ্রাফের মধ্যে 'আশ্রয়' থেকে হারানো মেয়েদের ফটোও আছে নাকি।

অ্যান্টি-চেম্বারের দরজায় খুট করে শব্দ হতেই দেবাদ্রি অ্যালবামটি রেখে দিলেন যথাস্থানে। আগে বিলাস সান্যালের কেরামতি দেখা যাক। তারপর মোক্ষম মুহূর্তে চেপে ধরতে হবে লোকটাকে।

বিলাস সান্যাল তখন কম্পিউটারের ভেতর কোনও ফ্লপি ঢোকাচ্ছেন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। তারপর হাত রাখলেন মাউসে, এবার দেখুন, মিঃ সান্যাল, আমার জাদু কীরকম সম্মোহিত করে রাখবে আপনার অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত। পর্দায় এরপর ফুটে উঠবে বিলাসিনী মেয়েদের ছবি। ইউ ক্যান এনজয় এনি অব দেম—

পর্দায় অতঃপর বিলাস সান্যাল যে-কাণ্ডটি দেখাতে চাইলেন তা কোনও বিকৃত রুচির মানুষের চিন্তাভাবনা। দেবাদ্রি লক্ষ করছিলেন বিলাস সান্যালকে এতক্ষণ যতখানি ভদ্রসভ্র, রুচিমান মানুষ বলে মনে হচ্ছিল, সন্ধে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন সাংঘাতিক বিকৃত মানসিকতার চরিত্র হিসেবে। কয়েকদিন আসে গার্গী চৌধুরিই কথায় কথায় দেবাদ্রিকে বলেছিলেন এই লোকটি নাকি দিনের বেলায় ডঃ জেকিল, রাতের বেলায় মিঃ হাইড। তার কিছুটা পরিচয় দিতে শুরু করতেই হঠাৎ দেবাদ্রি তার বিকৃত বাসনাকে থামিয়ে দিলেন ঝট করে। টেবিলের ওপর জিরোতে থাকা অ্যালবামটি খুলে ধরে বললেন, আচ্ছা, মিঃ সান্যাল, এত-এত তরুণীর ফটো আপনার কাছে কেন? কাউকেও তো ঠিক ভাল মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না?

বিলাস সান্যাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন এ হেন আকস্মিক প্রশ্নে। সচকিত হয়ে নিরিখ করলেন দেবাদ্রির চেহারা, তাঁর বাচনভঙ্গিটি। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললেন, ডু ইউ লাইক এনি অব দেম?

দেবাদ্রি তাঁর পকেট থেকে গোয়েন্দাবিভাগের পরিচয়পত্রটি বার করে দেখাতেই নিজেকে গুছিয়ে তুলতে সামান্য ফুরসত নিলেন বিলাস সান্যাল। লোকটি ভাবী এলেমদার, পরক্ষণে হেসে বললেন, এ ফটোগুলো সবই বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রজগতের উঠতি তারকাদের। বোম্বে-বাংলার অনেক চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক আমার বিশেষ চেনা। তাঁরাই চেয়ে পাঠান ফটোগ্রাফ।

—তার মানে আপনি একজন মেয়ে স্মাগলার?

বিলাস সান্যাল হো হো করে হেসে উঠে বললেন, কথাটা যদি ওভাবে বলেন, তাহলে আমার আপত্তি আছে। বলতে পারেন, ফিল্ম আর্টিস্ট সাপ্লায়ার।

দেবাদ্রি সান্যাল আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বললেন, এবার বলুন তো, মিঃ সান্যাল, আপনি ইদানীং আপনার প্রাক্তন স্ত্রী নিবেদিতার সঙ্গে বারবার দেখা করতে যাচ্ছেন কেন? হোয়াট ইজ ইয়োর ইন্টারেস্ট দেয়ার?

বিলাস সান্যাল যা বোঝার বুঝে গেলেন, কিন্তু একটুও নার্ভাস না হয়ে বললেন, সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে আসল পয়েন্ট থেকে সরে এলে তো আর পার পাবেন না, মিঃ সান্যাল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন 'আশ্রয়' থেকে কীভাবে লোপাট হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা মেয়ে।

বিলাস সান্যাল আকাশ থেকে পড়ে বললেন, আপনি কি সে-কারণে আমাকে সন্দেহ করছেন? মাই গড। সে তো কোন একজন তত্ত্বাবধায়ক জড়িত শুনলাম।

—তত্ত্বাবধায়ক! দেবাদ্রি প্রথম মুহূর্তে থমকে পরক্ষণে বললেন, তা হলে নিশ্চয় আপনার প্রাক্তন স্ত্রী নিবেদিতাই সেই তত্ত্বাবধায়ক।

—না, না। আপনি তা হলে গোটা ব্যাপারটার ভেতর এখনও ঢুকতেই পারেননি। আপনি সন্দেহ করছেন রাঘববোয়ালদের। ওদিকে একজন কুচো চিংড়ি গোপনে কাজ হাসিল করছে তা আপনাদের ভাবনারও বাইরে।

দেবাদ্রি গর্জন করে উঠে বললেন, তা হলে কে সেই কালপ্রিট। বলুন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

—বাহ্, আপনারা সব জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। এটা খুঁজে বার করা তো আপনাদের কাজ। চোখ কান খোলা রেখে ভাবুন।

দেবাদ্রি বিভ্রান্ত হয়ে বুঝতে চাইলেন, বিলাস সান্যাল কথাটা ঠিক বলছে, না কি তাঁকে ধোঁকা দিতে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে সন্দেহের তিরটা!

## ॥ ১৫ ॥

ব্রেকফাস্টের টেবিলেও আজকাল ভীষণ অন্যমনস্ক থাকে সায়ন। ক্রমশ চারপাশে একটা নিজের জগৎ তৈরি করে নিচ্ছে কাজ-পাগল মানুষটা। সেই অদ্ভুত জগতের ভেতর গার্গীর কোনও প্রবেশাধিকার নেই। গার্গীও অতএব চুপচাপ, আনমনা হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, আর ডুব দিচ্ছিল 'আশ্রয়' এ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকা রহস্যের অন্তরালে।

সায়ন তার চমৎকার বন্ধু ঠিকই, কিন্তু কেন যেন অনেক দূরের গ্রহের মানুষ। গার্গী তাকে আজকাল খুব একটা বিরক্তও করে না। তবু আজ স্তব্ধতা ভেঙে সায়নই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আশ্রয়'-এ কী একটা গোলমাল চলছিল, তার কোনও সুরাহা করতে পারলে?

গার্গী অবাক সায়নের এই আচম্বিত প্রশ্নে। 'আশ্রয়'-এর টালমাটাল পরিস্থিতি এর আগে দু-একবার সায়নকে বলেছে, কিন্তু সায়ন যেন তেমন আগ্রহভরে শোনেনি। আজ তার প্রশ্নে মনে হল একেবারে শোনেনি তা নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে তার আগ্রহ হঠাৎ চলকে উঠল কেন তা গার্গীর বোঝার অসাধ্য। হতাশ হয়ে বলল, নাহ্। সন্দেহ ঘোরাফেরা করছে কয়েকজনের ওপর, কিন্তু একবারে লাল-হাতে ধরা পড়ছে না কেউ।

—লাল-হাতে! সায়ন চমকাল গার্গীর দুর্বোধ্য ভাষার প্রয়োগে, পরক্ষণে হাসল, মানে কট্ রেডহ্যান্ডেড বলতে চাইছ!

—হ্যাঁ। আশ্রয়-এর সবাই-ই তো চেনা মানুষ। মনে হচ্ছে তাদেরই কেউ না কেউ এ ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু কে বা কারা সেই কালপ্রিট, সে-সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছানো যায়নি।

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে সায়ন চায়ের কাপে ঠোঁট ডোবাল পুনর্বার। কিছুক্ষণ ভাবনার সায়রে সাঁতার কেটে বলল, তা হলে তুমি ঠিকমতো ধ্যান দিচ্ছ না! এর আগে এত-এত জটিল কেস কী চমৎকার সমাধান করে ফেললে, আর এরকম একটা ছোট্ট জট এখনও ছাড়াতে পারলে না?

গার্গী সামান্য অপ্রতিভ হয়। আজকাল সায়ন কখনও গার্গীর এহেন এক্সট্রা কারিকুলার বিষয়ে তার চোখা নাক ঢোকায় না। ঘামানোর সময়ও বোধহয় নেই। আজ হঠাৎ সে-ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে তাকে এভাবে অভিযুক্ত করবে তা ভাবতেই পারেনি। হাসি-হাসি মুখ করে বলল, জটটা বোধহয় সামান্য নয়।

—তা হলে বলছ অসামান্য!

গার্গী হেসে বলল, আমি তো আর মিস মারপল নই যে, উল বুনতে বুনতে ঘরে বসেই সমাধান করে ফেলব জটিল সব সমস্যার! ওদিকে দেবাদ্রি সান্যালের দুটো টিম ক'দিন ধরে কলকাতার এ-মুড়ো ও-মুড়ো ছোটাছুটি করেও কোনও দিশে খুঁজে পাচ্ছে না। আমাকে কাল রাতেও টেলিফোন করে বললেন, মিসেস চৌধুরি, যতই ঢুকছি ঘটনার ভেতর, ততই ঘনীভূত হচ্ছে প্রহেলিকা।

দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে এ-ক'দিনে যা যা কথাবার্তা হয়েছে, তার এ-টু-জেড প্রায় প্রেসি করে সায়নকে শুনিয়ে গেল গার্গী। সায়ন অবশ্য মন দিয়ে শুনলও আজ। সাধারণভাবে গার্গীর প্রতি উদাসীন হলেও গার্গী কোনও ঝামেলায় পড়লে সে কিন্তু বন্ধুর মতো বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত।

গত কয়েকদিনে দেবাদ্রি আর তাঁর দুই নজরদারির টিম যে-তথ্য সংগ্রহ করেছে, গার্গীর প্রেসি অনুযায়ী তার সংক্ষিপ্তসারটি এরকম ঃ

১. নিবেদিতার প্রাক্তন স্বামী বিলাস সান্যাল ঠিক যতখানি সুপুরুষ, মেধাবী ও বাকপটু, তার চেয়েও অনেক বেশি ধুরন্ধর। লোকটা তার চেহারা ও বাগভঙ্গিমা দিয়ে যেমন খরিদ্দার পটায়, তেমনই সুন্দরী মেয়েদেরও। তাঁর জীবনযাপন পুরোটাই ঘোর রহস্যময়। কোথায় কখন কার সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কোন হোটেলে লাঞ্চ, কোন বারে ডিনার, রাতে কোথায় থাকবে ও কার সঙ্গে—সবটাই তাঁর মাথার কম্পিউটারে ভরা থাকে টায়টায়। বাইরের কারও পক্ষে তার রোজনামচা ধরাছোঁয়া প্রায় অসম্ভব। শুধু সফ্টওয়্যারই তার ব্যবসা, নাকি সে আরও গভীর সমুদ্রের মাছ, তাও এক অদ্ভুত কুজ্ঝটিকা।

২. আঙ্কেল রণধীর তরফদারের জীবনযাপনও আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালি পরিবারের গৃহকর্তার মতো সরল সাদাসাপ্টা নয়। তাঁর বাড়ি উত্তরের পুরনো কলকাতায়। সেখানে বসবাস করেন তাঁর আইনসঙ্গত স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। স্ত্রী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পুত্রকন্যারা এখনও স্কুলকলেজে। রণধীর তরফদার সেখানে রাত্রিবাস করেন না। থাকেন তাঁর বৌদির সঙ্গে কসবার ভাড়াবাড়িতে। বিধবা বৌদির বয়স এখন পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু একে প্রবল সুন্দরী, তার ওপর সারাক্ষণ বিউটিশিয়ানদের মতো সাজগোজ করে থাকেন বলে দেখায় চল্লিশের আগেপিছে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কটাও অদ্ভুত। রণধীর তাঁর বৌদিকে সম্বোধন করেন 'আপনি' বলে, আর বৌদি তার দেওরকে 'তুমি'। অবশ্য শুধু রাত্রিটাই সেখানে থাকেন রণধীর, ভোরে উঠেই চলে যান তাঁর নিজের বাড়িতে। সেখানে বাজার করা থেকে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি দায়দায়িত্ব পালন করেন গৃহকর্তার মতো। সেখানেই দুপুরে খেয়ে চলে আসেন আশ্রয়-এর চাকরিতে। সন্ধেয় 'আশ্রয়' থেকে বেরিয়ে এক-একদিন এক-একরকম পেশায় নিযুক্ত হন। সপ্তাহের দু'দিন কলেজের জন্য চারেক ছাত্রছাত্রীকে টিউশনি পড়ান। আর দু'দিন এক অবাঙালী যুবতী মহিলাকে বাংলা শেখান। অন্য দু' দিন একটা ছোট্ট টিভি-র দোকানে হিসেবের খাতাপত্তর তৈরি করে দেন। শুধুমাত্র তাঁর রবিবারের গতিবিধিই তীব্র সন্দেহজনক। একটা অ্যাম্বাসাডারে চড়ে সারা কলকাতায় বিভিন্ন বাড়িতে যান, কোথাও আধঘণ্টা, কোথাও একঘণ্টা থেকে বেরিয়ে আসেন হাসি-হাসি মুখে। সঙ্গে একটা বড় আকারের অ্যাটাচি থাকে। অ্যাটাচির ভেতর কী থাকে তা এখনও জানা যায়নি। দু-তিনটি বাড়িতে পুলিশে খোঁজখবর নিলেও জানতে পারেনি তিনি কেন যান। সবাই মুখে কুলুপ এঁটে শুধু একটা কথাই বলেছে, উনি সেলসম্যান।

৩. ফাদার সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার সবটাই 'আশ্রয়'-কে ঘিরে। তাঁর গতিবিধির আগাপাশতলা এই প্রতিষ্ঠানের জন্যই। টাকা সংগ্রহ থেকে শুরু করে আশ্রিত-আশ্রিতাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তোলায় কেন্দ্রীভূত। মাসে দু-একবার এ-ধরনের কাজে হিল্লিদিল্লি ঘুরে বেড়ানো ছাড়া সারাক্ষণই কম্পাউন্ডের ভেতর তাঁর কর্মকাণ্ড। তবে এতদিন তাঁর পরিশ্রম ছিল প্রায় নিঃস্বার্থ। ইদানীং প্রচার পেতে চাইছেন সংবাদপত্রে বা অন্যত্র।

সায়ন খুব মন দিয়ে এই তিন সন্দেহভাজনের সামাজিক অবস্থান, জীবনযাপনের ধারা ও গতিবিধি শুনে গম্ভীরমুখে রায় দিল, যারা পর্দার অন্তরালে বাস করছেন তাদের কার কী মোটিভ তা আবিষ্কার করায় মন দিচ্ছ না কেন? যাকে একেবারেই সন্দেহ করছ না, তাদের কেউ না কেউই তো সব গোয়েন্দাকাহিনীতে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত।

গার্গী হেসে উঠল সায়নের সরল বিশ্লেষণে, হ্যাঁ। এখন সেই দৃষ্টিকোণ নিয়েও ভাবতে শুরু করেছি। বিলাস সান্যাল দেবাদ্রিকে বলেছেন রাঘববোয়ালদের নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে কুচো চিংড়িদের দিকে নজর দিন। কোনও তত্ত্বাবধায়কই নাকি এসব কাজ করছেন

—হ্যাঁ। সে সম্ভাবনার কথাও তো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে।

—তা হলে তো প্রথমেই নিবেদিতার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হল আমি কিছুতেই নিবেদিতাকে অপরাধী হিসেবে ভাবতে পারছি না।

—কিন্তু এও তো হতে পারে নিবেদিতাকে ব্যবহার করছে কেউ। হয়তো নিবেদিতার অতীত জীবনে এমন কিছু ঘটনা ছিল যা ভাঙিয়ে কেউ তাকে বাধ্য করছে এ-ধরনের কাজ করতে।

—সে ক্ষেত্রে ঘুরেফিরে সন্দেহ বর্তাচ্ছে সেই বিলাস সান্যালের ওপরই। বিলাস সান্যালই এ ক'জনের মধ্যে জটিলতম চরিত্র। হতে পারে নিবেদিতাকে ব্ল্যাকমেল করছেন। কিন্তু তা হলে প্রশ্ন, বিলাস সান্যালই বা কেন ক্লু ধরিয়ে দেবেন কোনও তত্ত্বাবধায়কই এ-কাজ করছে বলে। তা হলে তো নিবেদিতার অন্তরালে তাঁকেই কালপ্রিট বলে ভাববে সবাই।

—হয়তো নিজে ভাল সাজতে চাইছেন বিলাস সান্যাল। কিংবা আড়াল করছেন নিজেকে। কিন্তু আর কোনও তত্ত্বাবধায়ক কি নেই যাকে সন্দেহ করা যায়? যার অতীত গোলমেলে ধরনের কিংবা সামনে ভালমানুষ সেজে থাকে, অথচ ভেতরে-ভেতরে অসম্ভব কুটবুদ্ধি।

সায়নের উস্কে দেওয়া ভাবনাটা গার্গী কয়েক মুহূর্ত ঘন করে চাবিয়ে নিল মগজের তন্তুতে। বারবার ঘোলালো বুদ্ধির নরম জায়গাটা, তারপর বলল, একজনকেই আমার সন্দেহ হয়। সে তুলিকা। ফাদারের আত্মীয়া বলে শুনেছি। কিন্তু ফাদারের ওপর তার প্রভাব প্রবল এবং ভাইসি ভার্সা। কথাবার্তা যেমন অসংযত, তেমনই পোশাক-আশাক। আচার-আচরণও তেমন সভ্যভব্য ধরনের নয়। কিন্তু মোটিভের কথা ভাবলে তার পক্ষে কাজটা করা অসম্ভব কেননা ফাদার তাঁর প্রতিষ্ঠান বলতে অজ্ঞান। তুলিকার ওপর অনেকখানিই নির্ভর করেন তিনি। সেই তুলিকা ফাদারের এতদিনকার গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ওভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে তা ভাবা যাচ্ছে না।

মন দিয়ে সায়ন ভাবল কথাটা, পরক্ষণে বলল, তা হলে ফাদারের সুনাম সহ্য হচ্ছে না এমন কেউ কি ওখানে আছে?

—নিবেদিতা বলেছিল, আঙ্কেল তরফদার ইজ জেলাস অব ফাদার।

সায়ন হেসে উঠে বলল, ভালই বলেছ। এ সেই চিরকালীন দু'ভায়ের রেষারেষি। জ্যাঠা কাকারা অনেক সময়ই বাবার ওপর ঈর্ষান্বিত হন। আর কেউ?

গার্গী আরও ভাবল ঘটনাগুলো। ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ বলে ওঠে, তবে রূপায়ণ সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। একটু ফিচেল-টাইপের, কিন্তু খুব ঘোড়েল। সে ফাদারকে নিয়ে অবিশ্রান্ত আজেবাজে কথা বলে। ফাদার জানেনও সে সব, কিন্তু কী কারণে তাকে ঘাঁটান না। এমনকী 'আশ্রয়'-এর সবুজদেরও ভয় পাইয়ে দিয়ে বলেছে, তোদের কে কখন গায়েব হয়ে যাবি কিছু ঠিক নেই।

সায়ন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, নাহ্। যে ফাদার সম্পর্কে এতখানি ভোকাল, তার পক্ষে এসব
াজ করা সম্ভব নয়। যে কালপ্রিট, সে থাকবে নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে, কাজটি
ববে সবার অজান্তে।

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বাট হু ইজ দ্যাট কালপ্রিট?

সায়ন চায়ের কাপ শেষ করার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও বসে ছিল আজ। তার চরিত্রের
ক্ষে যা একেবারেই বেমানান। হয়তো 'আশ্রয়' নিয়ে তার মনে একটা কৌতূহল উসকোচ্ছিল
'দিন ধরে। তাই এতক্ষণ গার্গীর সঙ্গে কাটাছেঁড়া করল টুকটাক ঘটনাগুলো। পরক্ষণেই
াবার অন্যমনস্ক। তার ভাবনায় ডুবু-ডুবু মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ গার্গী বলল,
ফিসে একটা ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে ক'দিন ধরে বলব ভাবছিলাম।

সায়ন চকিতে সিরিয়াস হয়। অফিসে আবার কী ঘটনা ঘটল যা এখনও আমার কানে
পাঁছায়নি!

—ঘটনাটা ঠিক অফিসিয়াল নয়, পার্সোনাল। হয়তো তাই পৌঁছয়নি। তোমার রিক্রুট
রা অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার, সায়ন্তন ব্যানার্জি, তিনি মাঝেমধ্যে আমার টেবিলে দু-চার
ঙ্ক্তি কবিতা উপহার পাঠাচ্ছেন।

—কবিতা! বিষয়টা সায়নের নাগালের এত বাইরে যে তাতে সে কিছুক্ষণ হতচকিত।
ামলে নিয়ে বলল, কী বিষয়ে কবিতা?

—বেশির ভাগই প্রশস্তিমূলক।

—ও, তাই। দেন হি হ্যাজ গ্রোন সাম সফ্‌ট কর্নার অন ইউ।

গার্গী ব্যাপারটা এভাবে ভাবেনি। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে সায়নের হাসি-হাসি মুখের
'কে তাকিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে কথাটার মর্মার্থ। হঠাৎ চিড়বিড় করে ওঠে তার
ভতরটা। কী এমন কারণ ঘটল যে, একটা বাইরের লোকের মনে দুর্বলতা জন্মে যাবে তার
পর! সে তো এমন কিছু সুন্দরীও নয়।

পরক্ষণে সায়ন হেসে বলল, কবিটবিদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখাই ভাল। কবিদের
'কি আবার পরনারীর প্রতি দুর্বল-টুর্বল হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে।

গার্গী হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা। কিন্তু না, মন থেকে একেবারে তাড়াতে পারলও
া। তার এতখানি বয়সের মধ্যে এমন কোনও পুরুষের দেখা পায়নি যার কিনা তার ওপর
র্বলতা জন্মেছিল কখনও। কিংবা হয়তো কেউ এসেছিল যাকে সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।
শষ পর্যন্ত তাদের কম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার কিনা—

ঘটনাটা ভারী অদ্ভুত তো!

সেদিন কী কারণে যেন একটু বেলা করেই ফ্যাক্টরিতে বেরুল সায়ন। তার একটু পরে
ার্গীও। কিছু জটিল ফাইলে সরল নির্দেশ দেওয়ার পর যখন একটু ফুরসত সেই মুহূর্তে কিছু
াস্ততা জুটে গেল তার কপালে, সঙ্গে বিস্ময় এবং টেনসন। ফোনটা এল দেবাদ্রির কাছ
থকে, খুব খারাপ খবর, ম্যাডাম। 'আশ্রয়' থেকে একটু আগেই খবর এসেছে, ওদের রাই
ামে আর একটি মেয়ে মিসিং।

গার্গী ছিটকে উঠতে চাইল, কী বলছেন কী, মিঃ সান্যাল?

—আপনি চিনতেন নাকি মেয়েটাকে?

—চিনব না মানে? আপনি তো ওদের অ্যানুয়াল ফাংশনের দিন যাননি। রাই-ই তো
'গুলিকা' নৃত্যনাট্যের মেইন রোলে অভিনয় করেছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ! দেখতেও ভারী মিষ্টি। কিন্তু কীভাবে মিসিং হল? কাল রাতে সেই একইভাবে নাকি?

—না, না। আজ সকালেই। কী কারণে নাকি কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি। আমি এখনই যাচ্ছি ওখানে। আপনি যাবেন নাকি একবার?

গার্গী কিছুক্ষণের জন্য আলুথালু হয়ে গেল নিজের ভেতর। এক মাসের ওপর হয়ে গেল 'আশ্রয়'-এ একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত সেগুলো কেন ঘটছে, কে বা কারা ঘটাচ্ছে তার কোনও তাল হদিশই করা গেল না। 'আশ্রয়'-এর সবাই, বিশেষ করে আশ্রিতা মেয়েরাই আতঙ্কে শুয়ে পড়েছে এবার। পুলিশের টিম সেখানে বারবার আনাগোনা করেও, সারা কলকাতা চুঁড়ে ফলেও কিচ্ছুটি করতে পারছে না। শুধু দৌড়োদৌড়িই সার হচ্ছে তাদের। গার্গীও বা কী করতে পারল এতদিনে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, যাচ্ছি। আপনি এগোতে থাকুন ততক্ষণে।

রতনকে গাড়ি প্রস্তুত করতে বলে সার্কুলার রোডে গার্গীর পৌঁছতে বেলা তিনটে। আকাশে সামান্য মেঘ-মেঘ। 'আশ্রয়'-এর ভেতরে তার চেয়েও পুঞ্জীভূত মেঘের দঙ্গল। পুলিশের দুটো গম্ভীর চেহারার জিপ অফিস-বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে-মেঘে আরও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের সঞ্চার করছে। যেন এখনই ঝলসে উঠবে বিদ্যুতের চোখচেরা আগুন।

ফাদারের চেম্বারেই বসে আছেন দেবাদ্রি সান্যাল ও তাঁর সহকর্মী সাব-ইন্সপেক্টর অলয় বসুরায়। তাদের একপাশে ভোম্বল মুখে উত্তররত রণধীর তরফদার। তার পাশে দাঁড়িয়ে কী কারণে যেন তড়পাচ্ছে তুলিকা। বলছে, আঙ্কেল ভালমানুষ সেজে বসে থাকলে কী হবে, হি ইজ দ্য রুট অফ অল ইভিলস্।

গার্গী সেখানে ঢুকতেই তার জন্য একটা চেয়ার খালি করে দেওয়া হল। এককালে এখানকার কর্মী ছিল বলে তার একটা আলাদা আসন পাতাই থাকে এখানে। তার ওপর তার এখনকার চাকরি, পদমর্যাদা সম্পর্কে একটা সম্ভ্রম তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অনেক চেষ্টা করেও তা এড়াতে পারেনি গার্গী।

গার্গী শুনল তুলিকা তখন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে, এরপর সত্যিই আমরা এখানে কেউই আর চাকরি করতে পারব না স্যার। ফাদার গত সাত-আট দিন ধরে ক্রমাগত বলে চলেছেন, তুলিকা, আর বোধহয় প্রতিষ্ঠানটা টিকিয়ে রাখা গেল না। কোন একটা কাগজে নাকি বেরিয়েওছে এখান থেকে মেয়েরা পালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। এর পর কী করে ছেলেমেয়েদের এখানে রাখা যাবে বলুন? আঙ্কেল সবই জানেন, সবই বোঝেন, এখন নিপাট ভালমানুষ সেজে সাফাই গাইছেন, কী করে জানব, রাই এভাবে পালিয়ে যাবে! একদম বুঝতে পারিনি তো!

আঙ্কেল তরফদার লাল টকটকে মুখে বসে আছেন মাথা নিচু করে। তুলিকার অভিযোগ শুনে বললেন, বিশ্বাস করো, রাই যখন হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'আঙ্কেল, ইমিটেশন কর্নার থেকে কটা টিপ কিনে আনব। যাব আর আসব। দশ মিনিটে হয়ে যাবে।' তার প্রার্থনা মঞ্জুর করার সময় একবারও ভাবিনি এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে!

তুলিকা আরও গলা চড়িয়ে বলল, আপনি বললেই আমরা বিশ্বাস করব যে ব্যাপারটা একেবারেই ভাবেননি! আমি যদি বলি, আপনি ইচ্ছে করেই ওকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যাতে কম্পাউণ্ডের বাইরে গেলেই আপনার গ্যাং ওকে তুলে নিতে পারে সেই নীল অ্যাম্বাসাডারে।

দেবাদ্রিকে এ সময় সামান্য উত্তেজিত দেখায়, আজও কি সেই নীল অ্যাম্বাসাডাবে করে য়ে গেছে?

কম্পাউণ্ডের বাইরে সেই নীল অ্যাম্বাসাডারটা এসে ঘোরাঘুরি করছিল কি না তা অবশ্য কউ দেখেনি। এটা তুলিকার অনুমান। দেবাদ্রির মুখ অবশ্য ভারী গম্ভীব, বললেন, মিঃ বফদার, আপনি তো জানেন, সেদিন আমরা বলে গিয়েছিলাম, খুব জরুরি না থাকলে কানও ছেলেমেয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরুবে না। আপনি তা জেনেও রাইকে বাইরে াওয়ার অনুমতি দিলেন?

দেবাদ্রির কথা শেষ হতেই তুলিকা মুখখানা লাল আঁচ করে বলল, কেন, ফাদারও তো রোজই লছেন, কেউ বাইরে যাবে না। এমনকী ভিজিটর এলেও তাকে বাইবে গার্ডস-রুমে অপেক্ষা রতে বলে স্লিপ নিয়ে আসবে। আমরা পারমিশান দিলেই তবে তিনি ঢুকবেন, না হলে নয়।

আঙ্কেল তরফদারের সিদ্ধান্তটা গার্গীর কাছেও বেশ অবিশ্বাস্য মনে হল। যেখান থেকে রপর এতগুলো মেয়ে উধাও হয়ে গেল, পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তাদের হালহদিশ নতে। প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠে গেছে চারদিকে। সেখানে হঠাৎ কটি সুন্দরী কিশোরীকে টিপ কিনতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন আঙ্কেল! এটা বিশ্বাস্য শুধু নয়, খুবই সন্দেহজনক। বিশেষ করে সন্দেহের তর্জনী যখন বাববার আঙ্কেলের কেই উদ্যত হচ্ছে।

আঙ্কেল তরফদাবের বক্তব্য, এরকম টুকটাক পাবমিশান তাঁরা বরাবরই দিয়ে থাকেন। ছলেদের তো প্রায়ই বাইরে পাঠানো হয় এটা-ওটা কাজ দিয়ে। তবে মেয়েরা কেউ সাজের জনিস কিনতে চাইলে অনুমতি দেওয়ার সময় বলে দেওয়া হয়, কেউ একা বাইরে যাবে না, -তিন জনে মিলে যাবে। ওদের ছোটখাট প্রয়োজন থাকে বলেই না ফাদার প্রত্যেককে মাসে চবিশ টাকা বরাদ্দ করেছেন। রাই যে একা বেরিয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি।

তুলিকাকে আরও উত্তেজিত দেখাচ্ছে এই কারণে যে, ফাদার সকালে উঠেই বেরিয়ে গছেন কোথায়, ফিরতে দেরি হবে। এর মধ্যে এরকম বিশ্রী ঘটনা আবারও ঘটে যেতে বাই-ই বেশ উদ্বিগ্ন। গার্গী এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ফাদারের চেম্বারের বাইরে ত্ত্বাবধায়কদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। নির্মাল্য, রূপায়ণ, অরণি, সুছন্দা। গার্গী আসলে খুঁজতে াইল নিবেদিতাকে। এত সব পুলিশি টহল ও জেরা সত্ত্বেও নিবেদিতা কেন নীচে নামেনি, ওপরে তার ঘরেই অন্তরীণ তা নীচে উপস্থিত তত্ত্বাবধায়করা কেউই বলতে চাইল না। নির্মাল্য তা নিবেদিতা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, কেননা প্রথমদিকে শুধু নিবেদিতার ওপরই খন কারও কারও সন্দেহের আঙুল ধাবিত হয়েছিল, সেই সময় জড়ানো হয়েছিল নির্মাল্যের মও। তখন নিবেদিতাই বলে দিয়েছিল নির্মাল্যকে, সত্যিই তো তোমার সঙ্গে আমার কানও ভালবাসার সম্পর্ক নেই, আমার সঙ্গে তুমি আর মিশো না।

অন্য তত্ত্বাবধায়কদের মুখও এখন ঘোর থমথমে। যতই অঘটন ঘটে চলেছে একের পর ক, 'আশ্রয়' ক্রমশ বন্ধ হওয়ার পথে এগুচ্ছে। তাতে প্রত্যেকেরই চাকরি টালমাটাল। ামান্য মাইনে যদিও, তবু এই বাজারে একেবারে ডাহা বেকার হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক আস্তে াস্তে ঘিরে ধরেছে সবাইকে।

গার্গী তখন এর ওর সঙ্গে টুকটাক কথা বলে আঁচ করতে চাইল ঘটনাটা কীভাবে ঘটে াল আজ। আঙ্কেল কেনই বা এরকম একটা পলকা সিদ্ধান্ত নিলেন—ফাদার যখন 'আশ্রয়'-এ উপস্থিত নেই। এর আগের ঘটনাগুলোও ঘটে গেছে ঠিক তখনই, যখন ফাদার বাইরে াথাও ট্যুরে গেছেন। ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত, না কাকতালীয়!

ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎই একটু করে নিরিবিলি ফুরসত খুঁজে খুঁজে নিয়ে গার্গী পলকে সেঁধিয়ে এল নিবেদিতার ঘরে। নিবেদিতা তার বিছানায় এলোথেলো হয়ে বসে। চুল উস্কখুস্ক মুখে উৎকণ্ঠা, চোখ দুটো বসা। তার সামনে একটা চেয়ারে বসে তার চেয়েও এলেমেলে সমুদ্রনীল। সমুদ্রনীল স্পষ্টতই ভারী উত্তেজিত। কিন্তু তার উত্তেজনা খুবই চাপা ধরনের গার্গীকে দেখে আরও সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, বোসো। 'আশ্রয়'-এর এখন ভীষণ দু সময়।

নিবেদিতা কীরকম অদ্ভুতভাবে হেসে গার্গীকে বলল, এবার মুখোশগুলো কীরকমভা খুলে যাচ্ছে ওদের দেখেছিস? এরা আবার আমাকে সন্দেহ করেছিল!

গার্গী তখনও একগলা ধন্দে। বুঝে উঠতে পারল না ঠিক কী বলতে চাইছে নিবেদিতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই নিবেদিতা আবার বলল, আঙ্কেল ওরকম ভালমানুষ সেজে থাকেন কিন্তু আমরা তো জানি, আসলে লোকটা কী ভীষণ গোলমেলে। আজ একেবারে ক রেডহ্যাণ্ডেড।

গার্গী নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকাল সমুদ্রনীলের দিকে, তা হলে আঙ্কেল তরফদারই এ সব ঘটাচ্ছেন?

সমুদ্রনীল অবশ্য চিন্তিত মুখে ঘাড় নাড়ল, আমি জানি না কে কেন এসব কাজ করছে তবে এটা বুঝতে পারছিলাম রাই আর খুব বেশিদিন এখানে থাকতে পারবে না।

গার্গী সমুদ্রনীলের উত্তেজিত চোখ দুটো পড়ার চেষ্টা করে, কী করে জানলে?

—তুমি তো জান না এখানকার সব ব্যাপার-স্যাপার। ফাদার প্রথমে চেয়েছিলেন রিয়া মতো রাইও চলে যাক শ্রীরাধার কাছে। রাই রাজি না হওয়ায় পরে প্রস্তাব দিয়েছিলেন জনৈ শুভানুধ্যায়ীর পালিতা কন্যা হওয়ার জন্যে। তাতেও রাই অরাজি হওয়ায় রাই আশং করেছিল তার হয়তো কোনও ক্ষতি হয়ে যাবে এর ফলে। শেষ পর্যন্ত তা হলও!

গার্গী এত সব চোরাঘূর্ণির কথা জানত না। আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু আজ রাই নিখোঁ হওয়ার কারণ কি তা হলে ফাদারই?

সমুদ্রনীল মুখটা কঠিন করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, আমি জানি না, কিছুই জানি ন তবে এর পর আরও অনেক কিছু ঘটে যাবে দেখে নিও। যারা এসব করছে তারা পার পে যাবে তা ভেবো না। ফাদার হয়তো কিছুই জানেন না। তাঁর ভালমানুষির সুযোগ নি তুলিকাই হয়তো এসব করাচ্ছে।

সমুদ্রনীলের মুখখানা পাথর হয়ে উঠল ক্রমশ। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না কেন এতা হিংস্র হয়ে উঠল সমুদ্রনীল।

## ॥ ১৬ ॥

'আশ্রয়' থেকে রাই নামের সুন্দরী কিশোরীটি অপহৃত হওয়ার পর যখন এক সপ্তাহে বেশি পার হয়ে গেল ও আজ পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচটি কিশোরীর কারও বিন্দুমাত্র হদিশ পাওয় গেল না, তখন রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল সংবাদপত্রে। ফাদার নিজেই জানিয়েছে

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে তিনি তাঁর চার বছর ধরে তিল তিল করে গড়া প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে চান। সরকারকেও অবশ্য একটা প্রস্তাব পাঠিয়ে বলেছেন, প্রতিষ্ঠানটি যদি সরকার অধিগ্রহণ করে, তাহলেও তাঁর আপত্তি নেই। ইতিমধ্যে আরও এক জটিল সমস্যায় পড়েছেন ফাদার। শিরিন নামের কিশোরী সবুজটির বাবা কোত্থেকে খবর পেয়েছেন তাঁর মেয়ে এখন আর 'আশ্রয়'-এ ফাদারের কাছে থাকে না, তাকে পালিতা কন্যা হিসেবে নিয়ে গেছে কোনও শুভানুধ্যায়ী। শিরিন এখন কোন দূর দেশে থাকে। সেসব শুনে তিনি একদিন বিকেলে আশ্রয়'-এ ফাদারের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, এখনই শিরিনকে ফিরে পেতে চান।

ফাদার সে কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে বলেছেন, সে কী কথা! শিরিন এখন দিল্লিতে একটা কনভেন্ট স্কুলে পড়ে। তার সারা জীবনের ভরণ পোষণের ভার যিনি নিয়েছেন, তিনি মস্ত বড়লোক। মেয়েটা মানুষ হচ্ছে রাজরানির মতো। এখন তো পুরনো জীবনে গিয়ে থাকতেই পারবে না।

শিরিনের বাবা নাছোড় হয়ে বলেছেন, গরিব মানুষের মেয়ে, গরিব বাড়িতে থাকতে রবে না তাই কি কখুনো হয়, বাবু? ঠিক পারবে।

ফাদার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, কিন্তু যখন তোমার বাড়ি থেকে ওকে আমরা নিয়ে আসি, স্ত্রী কিন্তু একটা কাগজে সই করে দিয়েছিলেন, তাতে লেখা আছে, আমার মেয়ের কি জীবনের ভার 'আশ্রয'-এর।

শিরিনের বাবা সেসব কথা শুনতে চাননি, বলেছেন, সেই ইঞ্জিরি কাগজে কী লেখা ছিল তা তো জানিনে, বাবু। মেয়েটারে আমারে ফেরত দ্যান। ওর মা শুনে কান্নাকাটি করছে।

ফাদার অগত্যা বলেছেন, ঠিক আছে, আগামী মাসে আমি দিল্লি যাব, আসার সময় তোমার মেয়েকে নিয়ে আসব।

পরে ফাদার বলেছেন, শিরিনকে ফেরত দিতে তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যার কাছে বড় মুখ করে মেয়েটাকে দিয়েছিলাম, তার কাছে আমার আর ইজ্জত রইল না।

ফাদারের আরও আশঙ্কা, একটা মেয়েকে যদি এ ভাবে ফেরত দিতে হয়, তাহলে যে সব মেয়ে 'আশ্রয়' থেকে মিসিং, তাদের বাবা-মা বা কোনও আত্মীয়স্বজন এসে ফেরত চাইলে কী উত্তর দেবেন তাঁদের!

গত এক সপ্তাহে 'আশ্রয'-এর এতশত খবর সংগ্রহ করার পর গার্গীও ভেসে আছে নানান চিন্তার মেঘখণ্ড হয়ে। অফিসের কাজের ফুরসতে, বাড়ির চিলতে অবসরে কেবলই ঘুরছে ফিরছে আর ভাবছে কে বা কারা সেই কালপ্রিট যে সবার চোখের সামনে দিয়েই ঘটিয়ে যাচ্ছে অপরাধগুলো।

দেবাদ্রিও নানান ধন্দে। যেখানে এক বা একাধিক মুখ ঘুরেফিরে আসছে সন্দেহের তালিকায়, সে ক্ষেত্রে কাকেই বা গ্রেফতার করবেন!

ভাবনাগুলো মগজের ভেতর পাক খাওয়াতে খাওয়াতে গার্গী সকালে বেরিয়েছিল গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে কিছু কেনাকাটি করতে। তার হাতের লম্বা ফর্দে আনাজপাতি, মাছ থেকে শুরু করে ভরে থাকে নানান স্টেশনারি আইটেমও। এ ব্যাপারে তার সাহায্যকারী হিসেবে থাকে ড্রাইভার রতন। তখনও মার্কেট পর্যন্ত যেতে পারেনি। হঠাৎই তার চোখে একটা নীল অ্যাম্বাসাডার গোলপার্কের দিক থেকে বেরিয়ে ঘুরে গেল বিজন সেতু অভিমুখে। নীল গাড়িটার দিকে দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতেই তার এক্স-রে চোখে ধরা পড়ল সেই পরিচিত নম্বরটি। চারটে চার। তৎক্ষণাৎ মনঃস্থির করে ফেলল গার্গী। সকালের আনাজপাতি শিকেয় তুলে রতনকে ছোট্ট করে বলল, ওই নীল গাড়িটাকে ফলো করো তো।

রতন এই কয়েক বছরে তার ম্যাডামকে দিব্যি চিনে ফেলেছে। তার ম্যাডাম যে আ পাঁচটা মেয়ে-বউদের মতো নয়, একটু অন্যরকম, তার শখ-আহ্লাদ যে একেবারে ভিন্ন রঙে গড়া তা তার চেয়ে আর কেই বা বেশি জানে। তক্ষুনি তার মারুতির মুখও ঘুরে গেল নী অ্যাম্বাসাডারটি থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে।

বিজন সেতু পার হয়ে জোড়া তালগাছ স্টপে এসে গাড়িটা ঢুকে পড়ল বাঁদিকের লেনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, কিছুটা ক্ষীণতনু লোকালয় পার হয়ে একটা একতলা বাড়ির সাম দাঁড়াল নীল অ্যাম্বাসাডারটা। গার্গীর অনুমানমতো গাড়ি থেকে নামলেন রণধীর তরফদার এটা কসবারই একটা প্রান্ত। তাহলে এই বাড়িটাই আঙ্কেল তরফদারের রাত্রিবাসের ঠিকানা

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়াতে হল না গার্গীকে। একটু পরেই রণধীর তরফদারের স বেরিয়ে এলেন এক সুন্দরী মহিলা। গার্গী অনুমান করল, ইনিই আঙ্কেলের সেই বউদি, য সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একরাশ কুয়াশায় ওতপ্রোত। দুজনে গাড়িতে উঠতেই গার্গীও অনুচ্চ গলা বলল, চলো, রতন।

পরবর্তী দৃশ্যে দুটো গাড়িই একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ছুটে চলতে থা ইস্টার্ন বাইপাস ধরে। ছুটির দিনে ইস্টার্ন বাইপাস বিরাজ করে একটু অন্য মেজাজে। এদি অফিসযাত্রীদের শশব্যস্ততা নেই। প্লেন ধরার তাড়াহুড়ো অন্যদিনকার মতো তুঙ্গে থাকে ন বরং গাড়িগুলো ছুটে চলে পিকনিকের মুডে। কেউ চলেছে দূরপাল্লার জার্নিতে। কেউ সল্টলেকে আত্মীয় বাড়িতে। কেউ বন্ধুকৃত্যে। গার্গী এখনও জানে না আঙ্কেলের গন্ত কোথায়! রবিবারে আঙ্কেল যে একটু অন্য ভূমিকায় থাকেন তা তার জানা হয়ে গেছে দেবা সান্যালের নজরদারি টিমের সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি থেকে।

কিন্তু সে ভূমিকার স্বরূপ এখনও পরিষ্কার নয়। গার্গীরই এখন আঙ্কেলের আসল পরি খুঁজে বার করার দায়।

আঙ্কেল তরফদার কিন্তু চলেছেন অনেকটা লম্বা পথ। উল্টোডাঙার মোড় পার হয়ে তি ততক্ষণে ভি আই পি রোডে। কোথায় যাচ্ছেন, সেটা কত দূরে তার কিছুই অবহিত না হ এভাবে অন্তহীন যেতে যেতে গার্গী কিছুটা টালমাটাল, কিছুটা দুশ্চিন্তিত। সায়ন অবশ্য ছুটি দিনে বাড়িতে থাকে না এটাই যা নিশ্চিন্তির। তাকে ফোন করে খবর দেওয়ার দায়ও নে আপাতত। কিন্তু রণধীর তরফদারই বা তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনী নিয়ে কোন অনির্দেশ্যের প চলেছেন, তাও তো জানার উপায় নেই। এমনও তো হতে পারে, তিনি এখন সঙ্গিনীসহ পা দিতে থাকবেন ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ বরাবর। হয়তো ছুটির দিনটা কাটাতে চান কোন দূরবর্তী গেস্টহাউসে। গার্গী তো আর পাগলামি করে অত দূরে পাড়ি দিতে পারবে না।

কিন্তু না, আঙ্কেল তরফদারের গন্তব্য আপাতত এয়ারপোর্ট হোটেল।

কম্পাউন্ডে তাঁর নীল অ্যাম্বাসাডার ঢুকতেই গার্গী সতর্ক হয়ে তার গাড়িতে অপেক্ষা কর লাগল একটু দূরত্ব বজায় রেখে। কী করবেন এখানে আঙ্কেল। বাইরে কোথাও যাচ্ছেন নাকি না কেউ আসবে, তাকে রিসিভ করবেন!

আঙ্কেল তরফদার তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে গড়গড় করে ঢুকে গেলেন এয়ারপোর্ট হোটেলে মস্ত লাউঞ্জে। একটা রোদচশমা পরে গার্গীও এগোলো একটু। আঙ্কেল রিসেপশনে গিয়ে এ সুবেশ যুবককে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন শরীর ঝুঁকিয়ে। কী কথা হল কে জানে। রিসেপশনি তক্ষুনি রিসিভার তুলে কারও সঙ্গে কথা বললেন কিছুক্ষণ। তার ঠিক মিনিট পাঁচেক পরে দু'জন অবাঙালি যুবক ওপর থেকে নেমে এল গোটা ছয়েক অ্যাটাচি হাতে নিয়ে। পরক্ষ

চারজনে বেরিয়ে এলেন লাউঞ্জের বাইরে। অ্যাটাচিগুলো নীল অ্যাম্বাসাডারটার ডিকিতে ঢুকিয়ে দিয়ে দুই অবাঙালি যুবক আবার অন্তরীণ হল হোটেলের ভেতর।

নীল অ্যাম্বাসাডার তার ফিরতি যাত্রা শুরু করতেই গার্গী আবার অনুসরণকারীর ভূমিকায়। সে তখনও অনুমান করে উঠতে পারছে না এই অ্যাটাচিগুলোর ভেতর কী ভরা আছে। যারা এগুলো দিল তাদের পরিচয়ই বা কী, আঙ্কেল তরফদারই বা কেন এগুলো নিয়ে চলেছেন। তবে কি মারিজুয়ানা, হেরোইন কিংবা এরকমই কোনও ভয়ঙ্কর নেশার বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এগুলোতে! না কি সেই ভয়ঙ্কর আর ডি এক্স!

রণধীর তরফদার যে ডেটলধৌত তুলসী বা বেলপাতার মতো সহজ বস্তু নন তাতে 'আশ্রয়'-এর তত্ত্বাবধায়করা অনেকেই একমত। কিন্তু তিনি কতটা কঠিন, কোন মহার্ঘ ধাতুতে তৈরি তা এখনও আবিষ্কৃত নয়। গার্গী আজ চেষ্টা করবে সেই অনাবিষ্কৃত মানুষটির খোলনলচে চিনতে।

নীল অ্যাম্বাসাডারটি একটানা হু হু করে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল পথিপার্শ্বে নতুন গজিয়ে ওঠা ঝকমকে একটা হোটেলের সামনে। বেশ চেকনাই চেহারা হোটেলটির। সামনের বিজ্ঞাপনটিও বেশ আমন্ত্রণে ভরা। গাড়ি থেকে অ্যাটাচি নামিয়ে নিয়ে আঙ্কেল ও তাঁর সঙ্গিনী সিধে ঢুকে গেলেন হোটেলের ভেতর। একটু পরেই ফিরে এলেন অ্যাটাচিবিহীন।

গার্গীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। তার ভাঁজ আরও দীর্ঘায়িত হল যখন তাকে আরও তিনবার থামতে হল এরকমই রোডসাইড হোটেলের সামনে। প্রতিবারই একটি করে অ্যাটাচি কমতে থাকে নীল অ্যাম্বাসাডার থেকে। এয়ারপোর্ট হোটেল থেকে পাওয়া অ্যাটাচিসম্ভার হঠাৎ রোডসাইড হোটেলগুলির সুদৃশ্য অভ্যন্তরে কেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা তা নিঃসন্দেহে সন্দেহের বিষয়। বোঝাই যাচ্ছে অ্যাটাচিগুলো এমন কিছু বস্তু বহন করছে যা এই সব ভুঁইফোঁড় হোটেলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কী সেই মূল্যবান বস্তু যা কোনও দূর দেশ থেকে এসে পৌঁছচ্ছে এয়ারপোর্ট হোটেলে, সেখানে থেকে আঙ্কেল তরফদার মারফত পাচার হচ্ছে এ ধরনের হোটেলে'

ছোট্ট ডায়েরিটির পৃষ্ঠায় হোটেলগুলির নাম নোট করতে করতে গার্গী সিদ্ধান্ত নিল, আজই দেবাদ্রি সান্যালকে ফোন করে জানাতে হবে ঘটনাটা। সম্ভব হলে আজ রাতেই রেইড করে উদ্ধার করতে হবে অ্যাটাচি-রহস্য।

নীল অ্যাম্বাসাডার তখন হু হু করে ছুটে চলেছে ভি আই পি রোড বরাবর। উল্টোডাঙ্গার মোড়ে পৌঁছে এবার কিন্তু আর ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে বাঁক নিলেন না আঙ্কেল। শ্যামবাজারের পথ ধরে এ-গলি ও-গলি পার হয়ে যে জায়গাটায় পৌঁছল গাড়িটি সেটা একটা নিষিদ্ধপল্লী।

গার্গী বেশ ধাক্কা খেল লাল-আলোমার্কা এলাকাটায় ঢুকে পড়তে। একবার আড়চোখে তাকালও রতনের দিকে। রতন কী ভাবছে কে জানে!

আঙ্কেল তরফদার ততক্ষণে তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেঁধিয়ে গেছেন একটা বড়মাপের তিনতলা বাড়ির ভেতর। কিন্তু গার্গী তো আর ঢুকে পড়তে পারে না সেখানে। তা ছাড়া এতক্ষণ বড় রাস্তা বরাবর আঙ্কেলকে অনুসরণ করার যে সুবিধাটা ছিল, গলির মধ্যে ঢুকে পড়ার পর গার্গীর প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হচ্ছিল আঙ্কেল না জেনে ফেলেন এতক্ষণ তাঁর পেছনে নিঃশব্দে ফলো করছিল কেউ। একটু সচেতন হলেই গার্গীকে চিনে ফেলাও সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। চিনে ফেললে একটাই অসুবিধে হত, খুবই সতর্ক হয়ে যেতেন আঙ্কেল। তাহলে তাঁর গোপন ঠেকগুলো আর জানা হত না গার্গীর।

কিন্তু আঙ্কেল তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে হঠাৎ নিষিদ্ধপল্লীতে কেন এলেন, গাড়ি থেকে বাবি অ্যাটাচি দুটো নামিয়ে কেন সেঁধিয়ে গেলেন তিনতলা বাড়িটার ভেতর, তা ভেবে গার্গী চূড়া দ্বিধায়। দেবাদ্রি সান্যালের সংগৃহীত তথ্যে রণধীর তরফদারের রবিবারের গতিবিধি সম্পর্কে মন্তব্য ছিল 'সেলস্‌ম্যান'। গার্গীও অনুমান করতে পারছে কিছু একটা জিনিস বিক্রি করে আঙ্কেল। সেটা কখনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির বাড়িতে যেমন পৌঁছে দেন, কখনং রোডসাইড হোটেলগুলিতে, আবার নিষিদ্ধপল্লীতেও। ব্যাপারটা অদ্ভুত আর আশ্চর্য।

শ্যামপুকুর থানা এলাকায় এ হেন নিষিদ্ধ পল্লীর ভেতর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইল না গার্গী। নীল অ্যাম্বাসাডার থেকে ছ'টা অ্যাটাচিই যখন আঙ্কেল একে একে পাচার কে ফেললেন, এর পর তাঁর বাড়ি ফেরাটাই একমাত্র কাজ। আজ দিনটা নিশ্চয়ই কসবা 'সেকেণ্ড হোম'-এই কাটাবেন রণধীর তরফদার।

সে-ভাবনায় অতঃপর গেবো দিয়ে গার্গী রওনা দিল তাদের ফ্ল্যাটে। বেলা প্রায় মধ দুপুরের দিকে। আজকাল প্রায়ই লাঞ্চ স্কিপ করছে গার্গী। আজ তার মার্কেটিং করাও হল ন দুপুরের খাওয়াতেও ইতি। অতএব ফ্ল্যাটে ফিরে কিছুক্ষণ জিরেন নিয়ে ফোনে ধরল দেবাি সান্যালকে, মিঃ সান্যাল, ক'দিন আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। এনি ডেভেলপমেন্ট

দেবাদ্রি সান্যালের গলায় বেশ খুশির উল্লাস, ওহ, মিসেস চৌধুরি, আপনার কথা খু ভাবছিলাম।

—সে কী, কেন? হঠাৎ আমার কথা।

—আসলে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যে যা আপনার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার ছিল।

—যেমন?

—যেমন, এক, সেদিন বিলাস সান্যালের শো-রুমে আমি হানা দেওয়ার পর তার আ কোনও পাত্তা নেই। সম্ভবত বুঝে ফেলেছে তার সব জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে।

—তাই নাকি? শো-রুম বন্ধ?

—না, এখন তাঁর জায়গায় বসছেন বিলাস সান্যালের সুন্দরী বান্ধবী ডোয়েনা সেনগুপ্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি এড়িয়ে গেলেন বিলাস সান্যালের খবর রাখেন না বলে।

—সে কী!

—হ্যাঁ। যখন বললাম আপনি যদি তাঁর ঠিকানা না জানান, তাহলে কিন্তু আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। তাতে মহিলা খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, বিশ্বাস করুন ওর হোয়ার অ্যাবাউটস্ জানা খুব কঠিন। প্রতি মুহূর্তেই ওর শিডিউল বদলে যায়।

—হুঁ, আর?

—দুই, রাই একদিন ফোন করেছিল সিস্টার নিবেদিতাকে।

গার্গী চমকে উঠে বলল, তাই নাকি! কোথা থেকে?

—ফোন করে বলেছে কয়েকজন লোক তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে একটা ছোট্ট ঘরে।

—তাহলে টেলিফোন করল কী করে?

—যে-লোকগুলো তাকে আটক করে রেখেছে, তারা ওকে সেই ঘরে রেখে যাওয়া সময় ভুল করে একটা সেলুলার ফোন ফেলে যায়। রাই সেটা পেতেই ফোনটা করেছে।

—কোথায় আছে তা জানতে পেরেছে?

—না। তবে যারা তাকে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই অবাঙালি। কথা বলছিল হিন্দিতে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের কোনও শহর হলেও হতে পারে।

গার্গী হতবাক হয়ে গেল, শুধু লোকগুলোর কথা শুনে কোথায় বন্দি হয়ে আছে তা বোঝা যায় নাকি?

—হয়তো সবটাই ওর অনুমান।

—কীভাবে কিডন্যাপ করেছে ওকে তা কিছু বলেছে?

—একটা নীল অ্যাম্বাসাডার নাকি দাঁড়িয়েছিল 'আশ্রয়'-এর গেটের বাইরে। রাই বেরিয়ে কয়েক পা যেতে না যেতেই অ্যাম্বাসাডারটা ওর গা ঘেঁষে চলতে থাকে। রাই কিছু বোঝার আগেই—

গার্গীর নিঃশ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসে। একটা নীল অ্যাম্বাসাডারের পেছনে সে সারাটা সকাল ধাওয়া করে বহু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে এল। আবার রাইকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে সেই নীল অ্যাম্বাসাডারেই। তাও তাকে 'আশ্রয়'-এর বাইরে যাওয়ার পারমিশান করে দিয়েছেন যে আঙ্কেল, তিনিই কিনা চড়েন সেই অ্যাম্বাসাডারে!

সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ গোলমেলে মনে হল গার্গীর। আঙ্কেল রণধীর তরফদারের গোলগাল চেহারা আর তাঁর গাবলুপানা মুখাবয়ব দেখে কিছুই কিন্তু অনুমান করা যায় না। এত সব কাণ্ড যে পর পর ঘটে যাচ্ছে তার মূলে যদি আঙ্কেল হন, তাহলে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই।

—ওকে কী উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ করেছে তা কি কিছু আঁচ করতে পেরেছে রাই?

—না। সে সব কিছুই বলতে পারেনি।

—শুধু নিবেদিতাই জানে কথাগুলো?

—হ্যাঁ। ওঁর কাছেই তো ফোন করেছিল রাই।

গার্গী কিছুক্ষণ ভাবনাটা নিজের মনে তোলপাড় করে পরবর্তী প্রসঙ্গে ঢোকে, আর কোনও নতুন ঘটনা?

—তিন, সমুদ্রনীল একদিন তুমুল ঝগড়া করেছে তুলিকার সঙ্গে, বলেছে, তোমাদের জন্যেই রাইকে এভাবে যেতে হল। ফাদাব যদি বারবার রাইকে 'আশ্রয়'-এর বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা না বলতেন, তাহলে হয়তো রাইকে যেতে হত না।

—সমুদ্রনীল কিন্তু সচরাচর রাগে না। ও খুব শান্ত ছেলে।

—কিন্তু শান্ত ছেলে যদি রেগে যায়, তাহলে ভীষণ একটা কিছু করে বসে তারা।

—তবু ওর এতখানি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি সান্যাল হাসলেন টেলিফোনের ওপ্রান্তে, আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, দে ওয়্যার ইন লাভ।

গার্গী চমকে উঠে বলল, সে কী! সমুদ্রনীল তো ত্রিস্তা নামের একটা মেয়েকে ভালবাসত!

—সে তো কবেই কেটে গেছে। এ ব্যাপারটা খুব সাম্প্রতিক কালের।

সমুদ্রনীলের সেদিনকার হিংস্র মুখখানা মুহূর্তে ভেসে উঠল গার্গীর মগজে। একবার ত্রিস্তার কাছে আঘাত পাওয়ার পর হয়তো রাইয়ের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকবে। সেই রাইও হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যেতে সমুদ্রনীল এখন খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো।

—হুঁ, আর কিছু?

—না। আপাতত এইটুকুই।

—তাহলে আমি একটা নতুন ডেভেলপমেন্টের কথা বলি, মিঃ সান্যাল।

বলে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে, তা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে গার্গী বলল, এইসব ভুঁইফোঁড় হোটেলগুলোয় কেন আঙ্কেল তরফদার গিয়েছিলেন, কী পাচার করে এলেন এভাবে ঘুরে ঘুরে, সেটা এখনই জানা দরকার। হয়তো কোনও একটা যোগসূত্র পেলেও পাওয়া যেতে পারে যা শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবে এই রহস্যের উন্মোচনে।

—নো প্রোবলেম, ম্যাডাম। আজ রাতেই হোটেলগুলো রেইড করাচ্ছি বড়কর্তাদের বলে।

পরদিন সকালেই গার্গী জানতে পেরে গেল দেবাদ্রি সান্যালের উদ্যোগের ফলাফল। আঙ্কেল তরফদার যে-যে হোটেলগুলিতে গিয়েছিলেন, তাদের কোনও কোনওটা রাতের গভীরে রূপান্তরিত হয় পতিতালয়ে। রেইডের ফলে ধরা পড়ল বহু সংখ্যায় যুবক-যুবতী যাদের অধিকাংশই ভদ্রঘরের। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপাও হল সে খবর।

গার্গী সে খবরে যত না চমকিত হল, তার চেয়েও বিস্মিত হল আঙ্কেল তরফদারের ভূমিকায়। নিষিদ্ধপল্লীর সঙ্গে তাঁর এত মাখামাখি কীসের! যে মেয়েদের ধরা হল হোটেলগুলো থেকে তার মধ্যে 'আশ্রয়'-এর নিষ্পাপ কিশোরীরা নেই তো!

## ॥ ১৭ ॥

বিলাস সান্যাল, না কি রণধীর তরফদার, কে বেশি সন্দেহভাজন তা নিয়ে একটা জটিল ভাবনায় যখন আবর্তিত হচ্ছে গার্গী, সেই সঙ্গে অফিসের টেবিলে বসে চেষ্টা করছে ফাইলে মনঃসংযোগের, সে সময় তার চেম্বারে আবার সেই বিশ্ব পথিকের আবির্ভাব। গার্গীর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না আলফ্রেড ডিসুজার সঙ্গে পুনর্বার মুখোমুখি হওয়ার, কিন্তু কিছু কিছু লোক এমনই নাছোড়বান্দা থাকে যে, এড়াতে চাইলেও এড়ানো যায় না। লোকটা আজও ঘরে ঢুকল সাদা দাড়িগোঁফের আড়ালে একরাশ হাসির সম্ভার নিয়ে। তবে এ-হাসিতে পিত্তি জ্বলে না, স্নিগ্ধ কৌতুকের সঞ্চার হয় মনে। বাধ্য হয়ে গার্গীও হাসল, অনিচ্ছের হাসি।

লোকটা যাতে তার থাবার মতো হাতে গার্গীর নরম হাতটা না নিতে পারে সে-কারণে গার্গী তার এক হাতে কলম অন্য হাতে একটা ফাইল তুলে নিয়ে হাতজোড় করার ভঙ্গি করে বলল, গুড মর্নিং, মিঃ ডিসুজা।

—ওহ্, ইয়েস, ভেরি গুড মর্নিং, বলে ডিসুজা তাঁর কাঁধের রঙচঙে ব্যাগটা সামলে বসে পড়লেন সামনের রেক্সিন-আঁটা চেয়ারে। তৎপর তার কটা রঙের চোখ গার্গীর মুখে বিদ্ধ করে বললেন, সাতসকালেই বিরক্ত করতে এলাম আমার নতুন বান্ধবীকে।

গার্গী সতর্ক হল। লোকটা কথার জাগলারি বেশ ভালই জানে। আগেরবার আলফ্রেড ডিসুজা যে-প্রস্তাবটি নিয়ে এসেছিল তার কাছে, সেটাই আবার পেশ করবে নিশ্চিত। বারো কোটি টাকার যে-প্রকল্পে দশ হাজার মহিলার কর্মসংস্থান হবে, তাতে গার্গী একজন ডিরেক্টর হিসেবে থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে এ ক'দিনে কম চিন্তাভাবনা করেনি। একবার

জিজ্ঞাসাও করেছিল সায়নের কাছে। সায়ন অল্প হেসে বলেছিল, এই সামান্য সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ক্ষমতা প্যারাডাইজ প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আছে এটাই আশা করব।

তাতেই অবশ্য যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল গার্গী। সেই কথাটাই এখন খুব মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিতে হবে গোয়ানিজ লোকটিকে। হয়তো অবাক হবে, হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, কিন্তু গভীর কোনও গাড্ডায় তার স্লিপারসুদ্ধ পা দুটো ডোবানোর আগে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদে।

আলফ্রেড ডিসুজা অবশ্য তাঁর প্রকল্প নিয়ে আলোচনার ধারেকাছে গেলেন না। বিদেশি সিগারেটের একটা চকচকে প্যাকেট বার করে তার থেকে বার করলেন সুগন্ধী সিগারেট, নিজে একটা ঠোঁটে গুঁজে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন গার্গীর দিকে। গার্গী বিব্রত হয়ে বলল, নো, থ্যাঙ্কস্।

—ডোন্ট স্মোক! ডিসুজা সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করে প্যাকেটটা তাঁর জিনসের প্যান্টের ঢোলা পকেটে ভরে বললেন, ড্রিঙ্ক করেন নিশ্চয়ই।

গার্গী ঘাড় নাড়ল, নো। আই ডোন্ট লাইক আদাবস অলসো ড্রিঙ্ক।

—ইজ ইট! আলফ্রেড ডিসুজার বিস্ময় বোধহয় ঊর্ধ্বগতি হল, ইউ আর অ্যা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব সাচ অ্যা ফ্লারিশিং কম্পানি। কত পার্টিতে যেতে হয়, কত সেমিনারে যোগ দিতে হয়, বাইরে যেতে হয় নানান আমন্ত্রণে, আর বলছেন ড্রিঙ্ক করেন না! আপনার হাজব্যান্ড নিশ্চয় করেন।

—নাইদার মি নর মাই হাজব্যান্ড।

—ইজ ইট! তা হলে বলব, ম্যাডাম, আপনারা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সুখ থেকে বঞ্চিত করছেন নিজেদের। শুধু উষ্ণ পানীয় তৈরি করার জন্য বিদেশে কত লক্ষ লক্ষ লোক সারাক্ষণ গবেষণা করে চলেছে তার ফিরিস্তি শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বহু মানুষ নিয়োজিত শুধু এই ভাবনায় যে, কী করে উষ্ণ পানীয়ের স্বাদ আরও ভাল করা যায়, তার প্রতিক্রিয়া কীভাবে আরও মনোরম আমেজ এনে দেবে খদ্দেরের শরীরে, কী পদ্ধতিতে তার বৈচিত্র্য বাড়ানো যায় আরও। আপনি জানেন, আঠারো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ঝরনার জল থেকে এক ধরনের চমৎকার মদ তৈরি করা হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়?

তা জেনে গার্গীর কী সুবিধে তা বোধহয় ডিসুজার ভাবার দরকার নেই। তিনি তখন মহা উৎসাহে দেশবিদেশের নানা ধরনের পানীয় নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা মুখে মুখে তৈরি করতে ব্যস্ত। কনিয়াক নামের একটি ফরাসি ব্রান্ডি খেলে শরীরে ও মনে কী অম্লমধুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিংবা চিলির ভারমুথ অথবা ক্যালিফোর্নিয়ার আলমাভিভা নামের ওয়াইন কীভাবে দশ বা পনেরো বছরেরও বেশি সংরক্ষিত রেখে তাতে মজুত করা হয় এক স্বর্গীয় স্বাদ, তার বিস্তৃত বর্ণনা শুরু করতেই গার্গী তাঁকে থামিয়ে ঢুকতে চাইল প্রসঙ্গান্তরে, হোয়াট অ্যাবাউট ফাদার? ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

ফাদারের প্রসঙ্গ উঠতেই ডিসুজার এতক্ষণের হাসি-হাসি মুখের মেঘের উপস্থিতি, ওহ্ দ্যাট ফেলো ইজ রিয়্যালি ইল্-লাক্‌ড্।

গার্গী খুব সাবধানে খোঁচাতে চাইল গোয়ানিজ লোকটিকে। লোকটির আচার-আচরণ, চাউনি, কথাবার্তা খুবই রহস্যজনক। যদি কিছু বেফাঁস মন্তব্য বার করা যায় ফাদার সম্পর্কে। নিরীহ মুখে বলল, সত্যিই। আপনি তো ওঁকে বহুদিন ধরে চেনেন।

—হ্যাঁ। তা কম দিন তো হল না বটব্যাল ইংলণ্ড ছেড়েছে! তার আগে চার বছর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা। বলতে গেলে আমিই ছিলাম ওর ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড।

গার্গী আরও সতর্ক হল তার পরবর্তী প্রশ্নাবলী তৈরি করতে। ফাদার সম্পর্কে তারা, মানে তত্ত্বাবধায়করা খুব বেশি জানত না তখন। তাঁর সম্পর্কে বহু তন্নিষ্ঠ আলোচনা হত নিজেদের মধ্যে, কিন্তু লোকটার আদত পরিচয় কখনও খুঁজে বার করতে পারেনি। 'আশ্রয়'-এর ভেতর তাঁর ছোট্ট, সুন্দর, ছবিপ্রতিম বাংলোটিতে একাই থাকেন। কেন একা এই প্রশ্নের উত্তর তন্নতন্ন খুঁজেছে বহুবার, কিন্তু জানা সম্ভব হয়নি, কারণ ফাদার এতটাই রাশভারী, এতটা দূরত্ব বজায় রাখেন অন্যদের থেকে যে, তাঁকে সাহস করে কেউ জিজ্ঞাসা করবে তাও অসম্ভব ছিল। একমাত্র তুলিকাই যা যাওয়া-আসা করত ফাদারের বাংলোয়। তাও প্রতিবার ফিরে এসে বলত, লোকটা যেন একটা বাঘ।

সেই বাঘটিকে আবিষ্কার করার আপাতত একটাই উপায়—আলফ্রেড ডিসুজা। গার্গী সামান্য হেসে বলল, তার মানে ফাদারের সঙ্গে আপনার বে-শ ঘনিষ্ঠতা ছিল সে সময়?

—তা একটু ছিল, ডিসুজা তার সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙের কারিকুরি করতে করতে বললেন, তখন থেকেই তো দেখছি, ওর ভাগ্য চিরকালই বিপ্রতীপ। বিয়ে করবে-না করবে-না করেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে একটা করে ফেলল।

গার্গীর মুখ থেকে বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরিয়ে এল তার অজান্তে, ও, তাই নাকি? বিয়ে করেছিলেন তা হলে?

—হ্যাঁ। এ দেশেরই মেয়ে। সম্ভবত মারাঠি। ডিভোর্সি, কিন্তু এত চনমনে যে কয়েক দিনের মধ্যেই মন জয় করে ফেলল বটব্যালের। দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল পার্টিতে, রেস্তোরাঁয়, পার্কে, রাস্তায় সর্বত্র। আমি অবশ্য ওকে বারণ করেছিলাম মেয়েটির সঙ্গে না মিশতে।

গার্গীর ভাবনায় কোঁচ পড়ে, কেন?

—কারণ মেয়েটির চালচলন, কথাবার্তা আমার ভাল লাগত না। মনে হয়েছিল এ-মেয়ে ঘরে থাকার মেয়ে নয়। সবসময় উড়ু-উড়ু, স্লিপারি, বোহেমিয়ান টাইপের।

—তারপর?

—বটব্যাল আমার কথা না শুনে বিয়ে করে ফেলল মেয়েটিকে। প্রায় হঠাৎই। কিন্তু বিয়েটা টিকল না। বোধহয় এক বছরও থাকেনি বটব্যালের সঙ্গে। তার আগেই কেটে পড়ল আর একজনের খপ্পরে পড়ে।

গার্গী কিছুক্ষণ ব্যাপারটার ভেতর আনমনে দোল খেল। ফাদারের জীবনের এই অনাবিষ্কৃত অধ্যায়টি জানা হল বটে, কিন্তু তাতে বোধহয় কিছু কাজের কাজ হল না। ফাদারের মনে যে এরকম একটা বিশ্রী ক্ষত আছে, তা কেউই জানে না এখানে। হয়তো তুলিকা তাঁর আত্মীয়া হয়েও জানে না। জানলে আলোচনার মধ্যে কখনও না কখনও তুলিকা বলতই।

—জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল বটব্যাল। বলত, কী হবে আর বেঁচে থেকে। তারপর একদিন দুম করে চলে এল ইণ্ডিয়ায়। তখনও জানতাম না সে এমন একটা মহান পরিকল্পনা মনে মনে ভেঁজে ফেলেছে। কিন্তু ভাগ্য ওর সহায় নেই। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে এমন সব অঘটন ঘটে গেল যে ওর এতদিনকার পরিশ্রম, নিষ্ঠা, পরিকল্পনা সব ব্যর্থ।

গার্গী ঘাড় নাড়ল অন্যমনস্কভাবে, ফাদার খুব ভেঙে পড়েছেন, তাই না?

—হি ওয়াজ উইপিং লাইক এনিথিং। কাল বলছিল, ডিসুজা, এভাবে কেউ স্যাবোটাজ করতে পারে তা আমার কল্পনায়ও ছিল না।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ডিসুজার দিকে, উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পাবছেন কে বা কারা এসব করছে?

—একেবারে পারছে না তা নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটছে তাঁর অনুপস্থিতিতে। বটব্যাল কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই হাতেনাতে ধরতে পারত।

বলতে বলতে সাদা দাড়িগোঁফওলা মানুষটার বোধহয় খেয়াল হল, গার্গীর মূল্যবান সময়ের অনেকখানি অপচয় করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। এতক্ষণের ফাদার-চর্চা ছেড়ে এবারে কাজের কথায় এলেন, ইয়েস ম্যাডাম, যে-কথাটা বলার জন্য এত দূর আসা, তা হল আমার সেই প্রকল্পের জন্য আপনার কাছে যে অনুরোধ সেদিন রেখে গিয়েছিলাম—

গার্গী তৎক্ষণাৎ বলতে যাচ্ছিল, স্যরি, ডিসুজা, আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না, কারণ—

কিন্তু গার্গীকে তার অক্ষমতার কথা জানানোর সুযোগ না দিয়েই আলফ্রেড ডিসুজা হাসি-হাসি মুখে বললেন, আমি জানি, ম্যাডাম, আপনার পক্ষে আমার প্রকল্পের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের একজন মেম্বার হওয়া কতখানি অসুবিধের। সেদিন আপনার মুখ দেখেই অনুমান করেছিলাম ব্যাপারটা। তাই আপনাকে একেবারেই বিব্রত করতে চাই না। আমার আরও অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাত, প্রতিষ্ঠিত। তাদের কাছ থেকে অনুমতিপত্র ও স্বাক্ষর নিয়ে আমি ইতিমধ্যেই আমার প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছি যথাস্থানে। হয়তো শিগগিরই মঞ্জুর হয়ে আসবে প্রস্তাবটি। তবে হ্যাঁ, প্রজেক্ট যখন চালু হয়ে যাবে, তার উদ্বোধনের দিন আপনার উপস্থিতি অবশ্যই চাই। আপনি রাজি থাকলে অনুষ্ঠান পরিচালনার ভারও নিতে হবে আপনাকে।

বলে আর বসলেন না আলফ্রেড ডিসুজা নামের রহস্যময় মানুষটি। গার্গীকে ভীষণভাবে বোকা বানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুখের হাসি-হাসি ভাবটা বজায় রেখে। পেছন ফেরার আগে কাঁধের ঢাউস ব্যাগটা থেকে বার করলেন সোনালি চকচকে কাগজে মোড়া একটা চকোলেট। গার্গীর দিকে সেটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আশা করি এই অনুরোধটা আপনি ফেলবেন না।

লোকটার কথার স্বরে এমন একটা জাদু ওতপ্রোত ছিল যে, চকোলেটটা না নিয়ে উপায় ছিল না গার্গীর। আলফ্রেড তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গীর মুখ থেকে একটাই শব্দ বেরিয়ে এল, স্ট্রেঞ্জ!

বহুক্ষণ সে আর মনঃসংযোগই করতে পারল না তার অফিসের কাজে।

সম্বিত ফিরল টেলিকমের পিঁক পিঁক পিঁক আওয়াজে। ওপর থেকে সায়ন্তন ব্যানার্জির স্বর, ম্যাডাম, আপনি কি ফ্রি আছেন?

গার্গীর ভুরুতে ভাঁজ, কেন, মিঃ ব্যানার্জি?

—আপনি 'শ্রীবৃদ্ধি' নামের যে অ্যাডভার্টাইজিং কম্পানি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন, তা নিয়ে একটু আলোচনা করতাম।

গার্গীর মনে পড়ল সে এরকম একটা কথা বলেছিল তাদের অ্যাডভার্টাজিং ম্যানেজারকে। বলল, হুঁ, আসতে পারেন।

সায়ন্তন ব্যানার্জির চেহারাটা সাদামাঠা। দেখে ঠিক মনে হয় না উনি কবিতা-টবিতা লিখতে পারেন। কিন্তু ক'দিন আগে একটা সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা

কবিতার নীচে সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা দেখে কৌতূহলী হয়ে চোখ বুলিয়েছিল গার্গী। নিছক প্রেমের কবিতা। দু-চার লাইন পড়ে মনে হয়েছিল বুঝিবা গার্গীকে উদ্দেশ করেই কবিতাটা লেখা। গার্গী বেশ মজাই পেয়েছিল তখন, কিন্তু এখন অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সামনে সেটা প্রকাশ করা চলবে না।

—ম্যাডাম, 'শ্রীবৃদ্ধি' সম্পর্কে এ-কম্পানিতে ও-কম্পানিতে টেলিফোন করে যা খবর পেলাম তাতে ওদের রেপুটেশন বেশ ভালই। আমি ওদের কম্পানিতে খবর দিয়েছিলাম কিছু লে-আউট পাঠানোর জন্য। এই দেখুন, ওদের কাজ।

গার্গী কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে রঙিন লে-আউটগুলো দেখল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের নতুন সাবানগুলো বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে চমৎকার সব ক্যাপশন দিয়ে। সায়ন্তন ব্যানার্জি প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা, তার ক্যাপশন সবই তাঁর। গার্গী লে-আউটগুলো ও.কে. করে দিতেই সায়ন্তন ব্যানার্জি 'থ্যাঙ্কু ম্যাডাম' বলে তার চেম্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত। তিনি চলে যাওয়ার পর গার্গী কিছুক্ষণ ভাবল লোকটি সম্পর্কে। তিনি কেন যে গার্গীকে নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করলেন কে জানে।

গার্গীর ভাবনা অবশ্য বেশিক্ষণ সে-ভাবনায় কেন্দ্রীভূত রইল না। তার সমস্ত মগজ জুড়ে তখন 'আশ্রয়'। আলফ্রেড ডিসুজার কথা শুনে মনে হল সত্যিই ভেঙে পড়েছেন ফাদার বিকেলের দিকে গিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে কিনা তাও ভাবল কয়েক মুহূর্ত। এত-এত ঘটনা ঘটে গেল আশ্রয়-এ, তার হাজার দু' হাজার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে ফাদারকে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল এ-পর্যন্ত তাঁকে বহুবার জেরা করেছেন, কিন্তু তেমন কোনও ক্লু খুঁজে পাননি যাতে নিখোঁজ মেয়েদের সম্পর্কে সামান্য কোনও আভাসও পাওয়া যায়। গার্গী অবশ্য এখনও কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি তাঁকে। করেনি এই কারণেই যে ফাদার এককালে তারই বস্ ছিলেন। একটা দূরত্ব এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে। গার্গী তার নতুন ভূমিকায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তিনিও খুব স্বচ্ছন্দ হবেন না নিশ্চিত। তবু গার্গী আজ অথবা কাল একবার খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করবে সব কিছু। সম্ভব হলে আজ বিকেলেই—

মনে হওয়া মাত্র গার্গী তার পি. এ পিয়ালি রায়কে বলল 'আশ্রয়'-এ লাইনটা দিতে পিয়ালি খুবই দক্ষ যে-কোনও আদেশ পালন করতে। তৎক্ষণাৎ 'আশ্রয়' ধরতেই ফাদারকে পাওয়া গেল তাঁর চেম্বারে, ফাদার, আমি গার্গী বলছি—

—গার্গী, হুঁ, বলো—

ফাদারের কণ্ঠস্বর কেমন জড়ানো, ভাঙা ভাঙা। বোঝাই যাচ্ছে একদম কাহিল হয়ে পড়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের শনি বক্রী হয়ে যাওয়ায়।

—ফাদার, আপনি যদি ফ্রি থাকেন তো আপনার সঙ্গে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম।

—আমার সঙ্গে? ফাদার অবাক হলেন কয়েক মুহূর্ত, ও, তা আসতে পার একদিন।

—যদি আপনি অনুমতি করেন তবে আজই।

—আজই! না, না, আজ কী করে হবে? আমি তো একটু পরেই দিল্লি যাচ্ছি।

—দিল্লি?

—হ্যাঁ। শিরিনকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। তাঁকে আলফ্রেড ডিসুজার কাছে দেওয়া হয়েছিল দত্তক হিসেবে। ডিসুজা তাঁকে দিল্লিতে একটা কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলে রেখে

পড়াচ্ছেন। তার একটা ব্রিলিয়ান্ট ভবিষ্যৎ তৈরি হত। কিন্তু শিরিনের বাবা-মায়ের তা পছন্দ হল না। তাদের বলেছি, কালকের মধ্যেই শিরিনকে কনভেন্ট স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরব। পরশুর মধ্যেই তুলে দেব ওর বাবার হাতে।

—ও, গার্গী দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেলিফোনের এ-প্রান্তে, ঠিক আছে, আপনি ফিরে আসার পর তা হলে কথা বলা যাবে।

—হ্যাঁ, আমি পরশু সকালেই ফিরব।

কী মনে হতে গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আলফ্রেড ডিসুজাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। না হলে কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শিরিনকে আমার হাতে দেবেনই বা কেন? এখন আমি তো শিরিনের কেউ নই। ডিসুজাই ওর ফাদার।

—তা বটে। গার্গী ফোনটা রেখে দিল হতাশ হয়ে। সে যখন যেটা করবে ভাবে তা তক্ষুনি না করতে পারলে কেমন অস্থির বোধ করে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরতে একটু রাত করে ফেলল গার্গী। সন্ধের পর আজ সামান্য একটু হাওয়া থাকাতে সারাদিনের তীব্র গুমোটের থেকে একটু স্বস্তি। এসপ্লানেড ইস্ট থেকে বেরিয়ে তার গাড়ি ঢুকল পার্কস্ট্রিটের পথে। ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে সোজা ল্যান্সডাউনে ঢুকতে গিয়ে কিছুক্ষণের জ্যাম। এই পথটায় জ্যামজট হয়ে প্রতিদিন অনেকক্ষণ সময় অপচয়। জট ছাড়িয়ে ডানদিকে ঘুরতেই দেখল বাসস্টপে তুলিকা দাঁড়িয়ে।

'একটু দাঁড়াও তো, রতন' বলতেই গাড়ি গিয়ে থামল তুলিকার থেকে কিছুটা দূরত্বে। গার্গী গাড়ি থেকে নেমে তুলিকাকে পাকড়াও করল, কী রে, কোথায় এসেছিলি?

তুলিকার পরনে হালকা সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ। তাতে ওর স্বাস্থ্যবতী শরীর কেমন বেঢপ দেখায়। তবু তুলিকা এই পোশাকটাতেই বোধহয় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। গার্গীকে দেখে হাসল, আর বলিসনে। ফাদার ট্যুরে যাওয়ার সময় এত-এত কাজ চাপিয়ে যান আমার ঘাড়ে।

—ফাদার চলে গেলেন নাকি?

—হ্যাঁ। এই তো একটু আগে বেরলেন। যাওয়ার সময় আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বললেন, যে-দোকান থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এক্সসাইজ খাতা যায়, তারা এখনও এ-মাসের কোটা পাঠায়নি। তুমি বলে এসো কাল সকালেই যেন পাঁচশো খাতা দিয়ে আসে।

বলে এক মুহূর্ত থামল তুলিকা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আশ্রয়'-এর সবুজেরা এখন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। তাদের লেখাপড়া করার মতো মনের অবস্থাই নেই। ওদিকে ফাদারের এক্সসাইজ খাতার কথা ভেবে ঘুম নেই। পাগল আর কাকে বলে!

গার্গী হাসল, পাগল বলিস নে, বল কাজপাগল। চল, তোকে 'আশ্রয়'-এ নামিয়ে দিয়ে যাই।

তুলিকা খুশি হয়ে উঠে পড়ল গার্গীর পাশে, বলল, 'আশ্রয়' বোধহয় আর থাকবে না, গার্গী। ওদিকে রাইয়ের গাঁ থেকে লোক এসেছে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চায়।

—কী সর্বনাশ। কী হবে এখন?

—সমুদ্রনীল আমার সঙ্গে ঝগড়া করল। বলল, তোমার ফাদার রাইয়ের দিকে অত নজর দিয়েছে বলেই ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আচ্ছা, তুই বল, গার্গী, ফাদার তো ওর ভালই চেয়েছিলেন। তখন বাইরে যেতে রাজি হলে তো এই কাণ্ডটা ঘটত না! এখন সমুদ্রনীল

বলছে ফাদারের দোষ। ফাদারের সঙ্গে কেউ তো ঝগড়া করতে পারে না। সবাই আমার সঙ্গে করে। আজ আবার রাতে আমার খুব দুশ্চিন্তা।

—কেন? গার্গী ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

—রাতে ফাদার না থাকলে আঙ্কেল তরফদারকে হল্ট করতে হয় 'আশ্রয়'-এ। আমাব তো সন্দেহ ওঁকেই। ফাদার দু'দিন থাকবেন না। আজ অথবা কাল যে কোনও দিন হয়তো ওঁর কালো হাত আবার কাউকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। তবে এবার আমিও সতর্ক থাকছি। সেরকম কিছু ঘটতে দেখলে কিছুতেই ছাড়ব না।

গার্গী 'আশ্রয়'-এর গেটে তুলিকাকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় জানানোর মুহূর্তেও জানত না, আজই তার জীবনের শেষ রাত। তুলিকা গাড়ি থেকে নামর সময় তাঁর কাঁধের ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিল। সেটা ফেরত দেওয়া গেল না। কারণ পরদিন সকালে দেবাদ্রি সান্যালের ফোন পেয়ে জানতে পারল, আগের রাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে তুলিকা। তার মেন্টর'স হাউসের ঘরেই।

## ॥ ১৮ ॥

পরদিন সকালে দেবাদ্রির কাছ থেকে এরকম একটি বীভৎস খবর পাবে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি গার্গী। 'আশ্রয়'-কে ঘিরে একটা ঘোরতর চক্রান্ত চলছে। কোনও একটা ধুরন্ধর র‍্যাকেট যে কাজ করছে সেখানকার কিশোরীদের উধাও করে দিতে, তা গ্রীষ্মের ভোরের মতোই পরিষ্কার। কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ তুলিকা নামের তত্ত্বাবধায়কটি খুন হয়ে যাবে তা ভাবনারও অতীত। বিশেষ করে যার ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন ফাদার।

তুলিকার জীবনযাবন বরাবরই একটু বেপরোয়া ধরনের। বেহিসেবি, উচ্ছৃঙ্খল তার স্বভাব। ফাদারের সোসিও ইকোনমি রিসার্চ আকাদেমি গঠনের প্রথম দিকেও সে মাঝে মধ্যে সন্ধে রাতে বেরিয়ে যেত মেন্টর'স হাউস থেকে, ফিরত অনেক রাতে। এমনও হয়েছে হয়তো ফিরলও না সেদিন। পরদিন ভোরে ফিরে এসে দমাদ্দম বকুনি খেয়েছে ফাদারের কাছে। তার পরও অবশ্য আবার ঘটত তার এভাবে রাতে না-ফেরা। বলত, 'আমার জীবনটা তো আমারই, তাই না?' তবু তার সঙ্গে অনেকগুলো কর্মব্যস্ত মাস একসঙ্গে কাটানোর ফলে তার ওপর একটা মায়া তো পড়েই ছিল গার্গীর। তা ছাড়া মাত্র কাল সন্ধেয় তুলিকাকে ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল সে। ফেরার পথে তুলিকা বলেও ছিল, 'আশ্রয়'টা দিন দিনই বাস করার অযোগ্য জায়গা হয়ে পড়ছে রে।

গার্গী তখনও ভাবেনি, তুলিকা সত্যিই আর থাকবে না 'আশ্রয়'-এ।

দেবাদ্রি সান্যালের কাছ থেকে টেলিফোনটা পাওয়ার পরই গার্গী ঠিক করে ফেলল এখনই তাকে একবার যেতে হবে ওখানে।

সায়ন যথারীতি সকালের চা খেয়ে শেভ করে ঢুকে গিয়েছিল স্নানঘরে। বেরিয়ে এসে দেবাদ্রি সান্যালের টেলিফোন-বৃত্তান্ত শুনে বিস্ময়ের একটা জোরালো অভিব্যক্তি জুড়ে দিল, স্ট্রেঞ্জ!

তারপর বিড়বিড় করে বলল, তাহলে জটটা সত্যিই জটিলতর।

সমস্যাটা যে সামান্য নয় এ-বিষয়ে মস্ত একটা শংসাপত্র বিতরণ করে সায়ন বেরিয়ে গেল ফ্যাক্টরির দিকে। তার নিজস্ব গণ্ডির বাইরেও যে আরও গভীরতর জট থাকতে পারে তা বোধহয় এত দিন বিশ্বাস হত না সায়নের। গার্গীর গোয়েন্দাগিরি নিছকই সৌখিন বিলাসিতা হয়তো এটাই ভাবত মনে মনে। আজ অন্তত এটুকু স্বীকার করল 'আশ্রয়' এখন প্রবল সঙ্কটে।

রতনের গাড়িতে উঠে গার্গী যখন অকুস্থলে পৌঁছতে পারল, বেলা দশটার মতো। কম্পাউণ্ডের ভেতর ইতিমধ্যেই শাসনের তর্জনীর মতো পুলিশের দু'খানা জিপ ও একটি সাদা অ্যাম্বাসাডার। এতদিন 'আশ্রয়' একরকম ভীতি ও আতঙ্কে থমথমে ছিল, আজ সর্বত্রই বিরাজ করছে একটা ভয়ঙ্কর, স্থির নৈঃশব্দ্য।

ভিড়টা মেন্টর'স হাউসের বারান্দায়ই বেশি। দোতলায় উঠে যে লম্বা বারান্দাটা সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের মতো একলা একা জিরেন নেয় সারাদিন, আজ সেখানে উপচে পড়ছে ভিড়। ভিড়টা অবশ্য থেমে আছে পুলিশের কেটে দেওয়া একটা গণ্ডির এপাশে। সেখানে দাঁড়িয়ে দু'জন রাইফেলধারী কনস্টেবল। তার ওপাশেই তুলিকা-তিয়াসাদের ঘর। দরজার কাছে জরিপ-রত পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল।

গার্গী এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল অন্য তত্ত্বাবধায়করা কে কোথায় আছে। তিয়াসা তো কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখ। মেয়েটা স্বভাবে খুবই নরম সরম। তুলিকার ওপর সব ব্যাপারেই নির্ভর করে চলত। তারই তো সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগবে এই সাংঘাতিক ঘটনায়।

সমুদ্রনীল দাঁড়িয়ে আছে একা একপাশে ভাবলেশহীন—বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে। অন্যদিকে নির্মাল্য কী যেন কথোপকথন করছে নিবেদিতার সঙ্গে। মাঝে অনেকদিন নিবেদিতা এড়িয়ে থাকছিল নির্মাল্যকে। হয়তো নির্মাল্যকে জড়িয়ে তার সম্পর্কে কিছু অনৈতিক অভিযোগ উঠছিল বলেই। কিন্তু আজ এমন একটা বিশ্রী ধাক্কায় টলে উঠেছে সমস্ত 'আশ্রয়' যে এখন নিবেদিতা বাধ্য হচ্ছে নির্মাল্যর সঙ্গে কথা বলতে।

দুই ডেপুটি ডিরেক্টর রণধীর তরফদার আর চম্পক চট্টরাজ পাশাপাশি মুখ চুন করে দেখছেন পুলিশের কার্যকলাপ। তাদের কাছেই বিশাখা চোখ বিস্ফারিত করে।

হোস্টেলের বেশ কয়েকজন সবুজও উঁকিঝুঁকি মারছে এদিক-ওদিক থেকে। তাদের সবার চোখেই প্রবল ভয়, ত্রাস। সাত-আট বছরের একটা বালকের চোখে কান্নাও। 'আশ্রয়'-এর অন্য কর্মচারীরাও মুখে আতঙ্ক মেখে লক্ষ করছে ঘটনার পরম্পরা।

এহেন রুদ্ধশ্বাস পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না কার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা জানা যাবে ঠিকঠাক। কিন্তু কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করার আগেই তার উপস্থিতি নজরে পড়ে গেল দেবাদ্রি সান্যালের, আরে, মিসেস চৌধুরি যে। আসুন, একবার এদিকে।

গার্গী ঠিক এরকমই একটি আহ্বানের আশা করছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে দুই কনস্টেবলের গণ্ডি পেরিয়ে সোজা পৌঁছে গেল যে-ঘরটিতে তুলিকার বীভৎসভাবে খুন হওয়া দেহটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। বিছানা ও ঘরের মেঝেয় রক্তের বন্যা। খুব একটা প্রশস্ত নয় ঘরটা। পাশাপাশি দুটি খাটের একটি খালি, অন্যটিতে তুলিকার মেরুন ম্যাক্সি পরা পৃথুল শরীর। ঘরের বাকি দৃশ্য সব যেমনটি ছিল তেমনই। শুধু তফাতের মধ্যে এখন সেখানে উর্দি পরা জনা চারেক পুলিশ অফিসার খুব ব্যস্ত। সেইসঙ্গে দুজন সাদা পোশাকেরও—তাদের মধ্যে একটি বছর সাতাশ-আঠাশের তরুণী। পরনে ঘন বট্‌ল্-গ্রিন রঙের সালোয়ার-কামিজ। হাতে কেমিক্যাল গুঁড়ো।

তরুণীটির দ্রুত চলাফেরা ও কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ফরেনসিকের টেকনিসিয়ান। সম্ভবত ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এক্সপার্ট। বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো ছড়াচ্ছেন এখানে-ওখানে, ঝুঁকে পড়ে দেখছেন তীক্ষ্ণ চোখে, কী যেন নোটও করছেন একটা সাদা প্যাডে। ছবিও তুলে নিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। সাদা পোশাকের অন্য লোকটি একজন ক্যামেরাম্যান। তিনি তুলিকার অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকার ভঙ্গিমাটি তাঁর ফিল্মের পাতায় ধরে রাখছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে।

গার্গী একঝলক তাকিয়ে দেখল তুলিকার প্রাণহীন দেহটা। এমনিতে দেখলে তেমন কিছু অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে না তার ওভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায়। শুধু তার মাথার তালুতে একটা গভীর ক্ষত। সম্ভবত কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে তুলিকার।

দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখার পর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গার্গীর বুক থেকে। এই তুলিকার সঙ্গে সে এখানে তো বটেই, জেলায় ট্যুরে গিয়েও অনেকগুলো দিন গল্পসল্প করে কাটিয়েছে। জীবনযাপনে তার যেরকমই অস্বাভাবিকতা থাকুক না কেন, সে খুব হুল্লোড়বাজ মেয়ে, জমিয়ে গল্প করতে ভারী ওস্তাদ।

দৃশ্যটা আরও আপ্লুত করল গার্গীকে এই কারণে যে, অতঃপর 'আশ্রয়'-এর ভবিষ্যৎ বোধহয় আরও অনেকটাই অনিশ্চিত, অনিবার্যভাবেই।

জনা চারেক পুলিশ অফিসার মৃতদেহটা তন্নতন্ন পর্যবেক্ষণ করে আলোচনা করছিলেন পরস্পরের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে মাঝারি উচ্চতার, শ্যামবর্ণ, গম্ভীর একজন তরুণ অফিসার সিরিয়াস মুখভঙ্গি করে কিছু লিখছিলেন তাঁর হাতের নোটবইটিতে। তাঁকে দেখিয়ে দেবাদ্রি গার্গীকে বললেন, ইনি হোমিসাইড ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি। এখন থেকে 'আশ্রয়'-এর ইনভেস্টিগেশন ইনিই করবেন। আমি আপাতত সাইডলাইনে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, সে কী! কেন?

ব্যাপারটা গার্গীর কাছে খোলসা করলেন দেবাদ্রি সান্যাল, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ। তাদের মধ্যে আছে মিসিং স্কোয়াড, হোমিসাইড, অ্যান্টি রাউডি, চিটিং ইত্যাদি। এতদিন 'আশ্রয়'-এর মেয়েরা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণে কেসটা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মিসিং স্কোয়াড ব্রাঞ্চেই। কিন্তু এখন এখানে একটা খুন হয়ে যাওয়ায় তদন্তের ভার হোমিসাইড ব্রাঞ্চের। মি. চ্যাটার্জি হোমিসাইডের ইন্সপেক্টর। এখন তারই দায়িত্ব চার্জশিট দেওয়া। তবে ওভারঅল চার্জ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারেরই।

গার্গী সরকারি অফিসের শ্রমবিভাগের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে বলল, তাই বলে উধাও হয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজার বিষয়টা নিশ্চয়ই সাইডলাইনে ফেলে দেবেন না আপনারা।

—না, না, তা দিচ্ছি না। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে রহস্যের শিকড় অনেক গভীরে।

গার্গী সায় দিয়ে বলল, না হলে একটি তাজা মেয়েকে খামোখা খুন হতে হবে কেন!

দেবাদ্রি চিন্তিতভাবে বলল, আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য লাগছে।

গার্গী চোখ তোলে, কোনটা আশ্চর্য লাগছে?

—তুলিকার খুন হয়ে যাওয়াটা। আমার কাছে এই মহিলার গতিবিধি খুব সন্দেহজনক ঠেকছিল গত কয়েকদিন। সেই তিনিই কিনা—

—এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে অনেকের গতিবিধিই তো সন্দেহজনক। কিন্তু খুন হল কী করে? শুধু মাথায় আঘাত লাগার কারণে?

—না। যতদূর মনে হচ্ছে প্রথমে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চের ঘায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তুলিকা। তারপর তার পায়ের একটা শিরা কেটে দেওয়া হয় ছুরি বা ব্লেড দিয়ে।

গার্গী শিউরে উঠল হত্যার নৃশংসতা অনুমান করে।

দেবাদ্রি আবার বললেন, মনে হচ্ছে অজ্ঞান অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে তুলিকার।

—পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দিয়েই যে তুলিকার মাথায় মারা হয়েছে তা কী করে জানা গেল?

—ওই তো বিছানার ওপাশে মেঝের ওপর টর্চটা পড়ে আছে। তার কাচও ভাঙা। একেবারে সদ্য ভাঙা—কারণ কাচের টুকরোগুলোও ছড়িয়ে আছে বিছানায়, মেঝেতে।

চোখে দুশ্চিন্তা মাখিয়ে গার্গী বলল, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। তুলিকার ওপাশের খাটে তো তিয়াসা থাকে। সে কিছু জানে না এ-ব্যাপারে?

—তিয়াসা কাল রাতে মেয়েদের হোস্টেলে শুয়েছিল শিডিউল অনুযায়ী। সপ্তাহে একদিন তার তো ওই বিল্ডিঙে শোওয়ার কথা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল তুলিকাকে যেই খুন করে থাকুক, সে জানত তুলিকা গত রাতে একাই থাকবে এ-ঘরে। হঠাৎ কী ভেবে বলল, তাহলে তো পাঁচে ব্যাটারির টর্চে হত্যাকারীর হাতের ছাপ থাকার কথা।

—হ্যাঁ। সেটাই তো আশা করছি আমরা। আমাদের ফরেনসিকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট শ্রান্তমল্লিকা খুবই দক্ষ টেকনিসিয়ান। ওই দেখুন, দরজায়-জানলায়, মানে কাঠের জিনিসগুলোর ওপর লোহাচুরের সঙ্গে কালো গ্রাফাইট পাউডার মিশিয়ে ছড়িয়েছে। আর কাচ বা ধাতুর ওপর ছিটিয়েছে একধরনের নন-ম্যাগনেটিক পাউডার। পটভূমির রং অনুসারে পাউডারের রংও বদলে দিতে হয় যাতে ছাপগুলো পরিষ্কার ফুটে উঠতে পারে। ও তো বিদেশ থেকে শিখে এসেছে এসব।

—কী নাম বললেন ফরেনসিক এক্সপার্টের?

—শ্রান্তমল্লিকা।

—শ্রান্তমল্লিকা কী? মানে সারনেম?

দেবাদ্রি হাসলেন, সেটা ও কারও কাছে বলে না। বিয়ের পর ও চেয়েছিল ওর আগের পদবি বজায় রাখতে। কিন্তু ওর স্বামী রাজি হননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পদবিই ব্যবহার করবে তাঁর স্ত্রী, আমাদের সমাজে যেরকমটি হয়ে থাকে। দুজনে দু'মত হওয়াতে শেষে রাগমাগ করে কোনও পদবিই আর নামের শেষে লেখে না ও। এখন শুধুই শ্রান্তমল্লিকা।

গার্গী কিছুক্ষণ মগজে ঘুলিয়ে নিল ব্যাপারটা। তারপর হেসে বলল, আইডিয়াটা মন্দ নয়। যাই হোক, টর্চের গায়ে কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধার করতে পারবেন নিশ্চয়ই আপনাদের শ্রান্তমল্লিকা।

—লেট আস হোপ সো।

গার্গীর চোখ তখনও আলটপকা ঘুরছে সারা ঘরে। তেমন ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই কোনওখানে। সম্ভবত হত্যাকারী তুলিকার চেনা। অনেক রাতে দরজায় শব্দ পেতে খুলে দিয়েছিল ছিটকিনি। তখনও বোধহয় সে অনুমান করতে পারেনি তাকে সে রাতে খুন হতে হবে এভাবে।

গার্গীর চোখচারণা খুব একটা জলাঞ্জলি গেল তা নয়। খাটের পায়ার কাছে কী একটা পড়ে থাকতে দেখে পট করে তুলে নিল নিচু হয়ে। সবার অলক্ষ্যেই। একঝলক দেখেও নিল বস্তুটা। একটা লোহার নখ। তৎক্ষণাৎ তার হাতের ব্যাগের মধ্যে চালান করে ফেলল পড়ে পাওয়া জিনিসটা। লোহার নখ কেন এখানে পড়ে তা পরে ভাবা যাবে।

হোমিসাইড ব্রাঞ্চের পুলিশ ইন্সপেক্টর ততক্ষণে তাঁর তদন্ত শেষ করে বললেন, ডেডবডিটা পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে ঘরটা আপাতত সিল করে দিচ্ছি, সান্যালদা।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই গার্গীর সঙ্গে দ্যুতিমান চ্যাটার্জির আলাপ করিয়ে দিয়ে দেবাদ্রি বললেন, সি মে বি অব ইমেন্স্ হেল্প টু ইয়োর ইনভেস্টিগেশন, চ্যাটার্জি। সি হ্যাজ অ্যা থার্ড আই।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি এর আগে দেখেননি গার্গীকে, তবু কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়ে বললেন, অফ কোর্স। শুনলাম সান্যালদা খুব হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এখানকার ব্যাপার স্যাপার বুঝতে। এখন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। জানতে হবে কী পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল এখান থেকে। এখন তার জের হিসেবে মার্ডারই বা কেন করা হল একজন টিচারকে, যে টিচার নাকি এখানকার ডিরেক্টরের একেবারে ডান হাত। চলুন, আমরা কোথাও একটু বসি। যারা কাল এখানে ছিলেন তারা কেউ কোনও আভাস দিতে পারেন কি না, রাতে কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না, সে সব বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক খুনের মোটিভ বুঝতে।

ফাদারের চেম্বারটিতেই যথারীতি বসলেন পুলিশ অফিসাররা। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। দুই কনস্টেবল তখন কিছুটা ব্যস্ত বাইরের ভিড় সামলাতে। ফাদার নেই বলেই তাঁর ঘরের সামনে এতখানি ভিড়। হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা অনেকেই এসে উঁকিঝুঁকি মারছে ঘরের ভেতর। গার্গী ভাবছিল আঙ্কেল তরফদার কিংবা আঙ্কেল চট্টরাজ অথবা কোনও তত্ত্বাবধায়ককে বলবে ছেলেমেয়েদের হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে। আশ্চর্য, এই বীভৎস ঘটনায় সবাই এমনই বেবাক হয়ে গেছে যে, সবুজদের শাসন করার লোকও আজ যেন নেই।

ফাদারের চেম্বারে বসতে না বসতেই দু দুটো ফ্যাক্সবার্তা এসে পৌঁছল ফ্যাক্সযন্ত্র মারফত। মি. চ্যাটার্জি নিজেই রিসিভ করলেন ফ্যাক্সদুটো। ফাদারই পাঠিয়েছেন বার্তাদুটি দিল্লি থেকে। কাল রাতে দিল্লি পৌঁছে আজ সকালেই 'আশ্রয়' নিয়ে তাঁর নানান ভাবনা প্রকাশিত করেছেন ফ্যাক্সবার্তায়। একটি পাঠিয়েছেন রণধীর তরফদারের নামে। তাতে লেখা, 'আগামী কালই আমার ফেরার কথা ছিল, কিন্তু ফেরা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ শিরিন যে-কনভেন্ট স্কুলে পড়ে, সেখানকার কয়েকজন স্টুডেন্টকে নিয়ে চার পাঁচজন টিচার সিমলা গেছেন স্টাডিট্যুরে। শিরিনও তাদের টিমে আছে। হয়তো পরশু বা তার পরের দিনই ফিরবে। এত দূরে এসে শিরিনকে না নিয়ে ফেরার কোনও মানে হয় না। বিশেষ করে ওর বাবা-মা যখন ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার অনুপস্থিতিতে আপনিই তো 'আশ্রয়'-এর চার্জে থাকেন বরাবর। আমার ফিরতে যদি পাঁচ-সাত দিন দেরি হয়, এ ক'দিন 'আশ্রয়'-এর সবুজদের দেখভাল করার দায়িত্ব আপনার। দেখবেন, আর কোনও সবুজ যেন নিখোঁজ না হয়ে যায় ইতিমধ্যে। যদি ইতিমধ্যে টাকার দরকার হয়, তুলিকাকে বলবেন, ও যেখান থেকে হোক ব্যবস্থা করে দেবে। ইতি—ফাদার।'

দ্বিতীয় ফ্যাক্সবার্তাটি লেখা তুলিকার উদ্দেশে। এটি আকারে ছোট। সংক্ষিপ্ত বার্তায় লেখা আছে, 'কার রেন্টাল'-এ বলা ছিল আগামী কাল সকালে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে। কিন্তু কাল ফেরা সম্ভব হচ্ছে না। কেন তা আঙ্কেল তরফদারের ফ্যাক্সে লেখা আছে। তুমি 'কার রেন্টাল'-এ জানিয়ে দিও কাল যেন গাড়ি না পাঠায়। কবে পাঠাতে হবে তা পরে ফোন করে জানিয়ে দেব।

তুলিকাকে লেখা ফ্যাক্সবার্তাটি পড়ে গার্গীর বুকের ভেতর আরও একটি দীর্ঘশ্বাস। ফাদার এখনও জানেন না তার বিশ্বস্ত অনুচরটি আর জীবিত নেই। জানার সুযোগও নেই কারণ ফাদার ট্যুরে গেলে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র থাকত একমাত্র তুলিকারই। তুলিকাই জানত তাঁর ঠিকানা, গতিবিধি। 'আশ্রয়'-এ কোনও অঘটন ঘটলে তুলিকা তৎক্ষণাৎ ফোন করে বিস্তৃত তথ্য জানিয়ে দিত ফোনে। আজ সে-ই যখন নেই, ফাদারকে জানাবে কে।

দ্বিতীয় ফ্যাক্সে একটা টেলিফোন-নম্বর দেওয়া আছে। দিল্লির একটা ফ্যাক্স-নম্বরও লেখা আছে নীচের দিকে। সেটা আক্কেল তরফদারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গার্গী বলল, আক্কেল, ফাদারকে ঘটনাটা জানিয়ে দিন এক্ষুনি। খবর পাওয়ামাত্র এখনই যেন ফিরে আসেন কলকাতায়।

আক্কেল তরফদার কাগজটা নিয়েই কোথাও যাচ্ছিলেন হন্তদন্ত হয়ে। তাকে পেছন থেকে ডেকে দ্যুতিমান চ্যাটার্জি বললেন, এখন কেউ যেন কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবেন না, আমার দু'জন কনস্টেবলকে গেটের কাছে পোস্টিং করে দিচ্ছি। আপাতত বাইরের কেউও যেন ভেতরে না ঢোকেন। আর যারা কাল মেন্টর'স হাউসে রাত্রিবাস করেছেন তাদের একটা তালিকা দিন। একে-একে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। সেই তালিকার বাইরেও কাউকে-কাউকে হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার হতে পারে। যেমন গেটের দারোয়ান বিষেণ সিং বা কাল রাতে মেয়েদের হোস্টেলে ছিলেন যে-তত্ত্বাবধায়ক সেই তিয়াসা নামের মেয়েটিকেও। হ্যাঁ, আর একটা সিজার-লিস্ট করেছি। জিনিসগুলো পাওয়া গেছে কিছু তুলিকার বালিশের তলা থেকে, কিছু তার খাটের পাশে যে ড্রেসিং টেবিলটা আছে তার ড্রয়ার থেকে। তার একটা কপিতে আপনাকে সই করতে হবে। অন্য কপিটা আপনাকেই দিয়ে যাব।

সিজার-লিস্টে সই করতে বলায় ভারী বিপন্ন দেখাল আক্কেল তরফদারকে। কিন্তু পুলিশের কথার ওপর কথা চলে না। মোটা থলথলে শরীর নিয়ে এসে কাঁপা-কাঁপা হাতে সই করলেন নাতিবৃহৎ তালিকাটিকে। তাতে এক পলক নজর ছুঁয়ে গার্গী যা পড়ল তা এরকম ঃ

১. বিভিন্ন ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লেখা একটা ছোট্ট পকেট-ডায়েরি।

২. তুলিকা ও তার প্রিয়জনদের ফটোসহ একটা অ্যালবাম।

৩ খবরের কাগজের কিছু কাটিং।

৪. 'আশ্রয়' সম্পর্কিত করেসপণ্ডেন্সসহ দুটি ফাইল।

৫. কয়েকটি লটারির টিকিট।

৬. 'লা মিনুয়িত রেইনে' নামের দুটি স্ট্রিপ যাতে আছে একধরনের কনট্রাসেপ্টিভ ট্যাবলেট।

৭. কয়েকটি এয়ারমেল খাম।

৮. একটি পাঁচ ব্যাটারির টর্চ।

তালিকাটিতে চোখ বোলানো শেষ হতে না হতেই ওপর থেকে নেমে এলেন সেই প্রৌঢ় ফটোগ্রাফারটি ও শ্রান্তমল্লিকা নামের ফরেনসিক টেকনিসিয়ান। শ্রান্তমল্লিকার হাতে সাদা রুমাল দিয়ে আলতো করে ধরা সেই পাঁচ ব্যাটারির টর্চটি যার আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়েছিল তুলিকা।

টর্চটা বেশ পুরনো। কিন্তু সেটি বেশ চেনা-চেনা মনে হল গার্গীর। হঠাৎই তার মনে পড়ে গেল এরকমই একটা বৃহৎ টর্চ জেলায় ট্যুরে বেরুবার সময় সদাসর্বদা নিবেদিতার কিটব্যাগে থাকত। এটা কি সেই টর্চটাই! টর্চটার পেছনের আংটাটা ভাঙা ছিল। কী আশ্চর্য, এই টর্চটার পেছনের আংটাটাও তো ভাঙা!

## ॥ ১৯ ॥

তুলিকা নামের তরুণী তত্ত্বাবধায়কটি হঠাৎই খুন হয়ে যাওয়ায় 'আশ্রয়'-কে ঘিরে যে-থমথমে আবহ তৈরি হয়েছিল তা এখন অথৈ সংকটে। পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি খুবই সিরিয়াস ধরনের। অফিসের কম্পাউণ্ডের ভেতর যে-চরিত্রটিকেই সামনে পাচ্ছেন তাকেই একবার মেপে নিচ্ছেন মনে মনে। ইতিমধ্যে দেবাদ্রি সান্যালের কাছে এ-তাবৎ বয়ে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে শুনে নিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ, একেবারে ফুটনোটসহ। এখন শুরু করবেন জিজ্ঞাসাবাদ—নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

ফাদারের অনুপস্থিতিতে যিনি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকেন সেই রণধীর তরফদারকে দিয়েই শুরু করলেন মুখপাত। পঞ্চাশোর্ধ্ব, গোলগাল চেহারার মানুষটির বোম্বাই আমের মতো মুখাবয়বটি আপাতত আমসি। রোদে না তেতেপুড়েই। রোদ নেই বটে, কিন্তু অন্তর্দাহ তো আছে।

—আচ্ছা, মিঃ তরফদার, আপনি তো গত রাতে এখানেই হল্ট করেছিলেন? ফাদারের অনুপস্থিতিতে এরকম করেই থাকেন শুনলাম, সে ক্ষেত্রে কাল রাতে যা ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে আপনার পক্ষে অবশ্যই কিছু আঁচ পাওয়া সম্ভব।

—আঁচ! রণধীর তরফদারকে বিব্রত দেখাল।

—মানে, আপনি কাল রাতে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনেছিলেন কি না, কারও কিছু আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছিল কি না, খুনটা কেন হল সে সম্পর্কে আপনার কিছু মনে হয় কি না, কাউকে সন্দেহ করেন কি না—

রণধীর তরফদার ঘাড় নাড়লেন, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ঘটনাটা। স্যাড, ভেরি স্যাড।

—ব্যস, এইটুকু? আর কিছুই বলার নেই আপনার?

রণধীর তরফদার একটু ইতস্তত করে বললেন, ওর জীবনযাপন একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল, অনেকের সঙ্গে অনেকরকম সম্পর্ক ছিল বলে শুনেছি।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি আগ্রহ দেখালেন, কী রকম সম্পর্ক? কাদের সঙ্গে?

রণধীর তরফদার মুখ খুলতে চাইলেন না, সব ঘটনা তো আমার নজরে আসে না। এ-ও বলে শুনতে পাই। ও নাকি মাঝেমধ্যে রাতে ঘরে ফেরে না!

—শোনা কথায় কোনও এভিডেন্স হয় না। আপনি নিজে কিছু দেখেছেন কি না বা তেমন কোনও সম্পর্কের কথা আপনি জানেন কি না যা আদালতে প্রমাণযোগ্য।

—না, না, আমি সেরকম কিছু দেখিনি, আমি তো রাতে এখানে থাকিই না।

—আচ্ছা, মিঃ তরফদার, একটা কথা এখানে সবাই বলাবলি করছে যে, ফাদার যখনই অনুপস্থিত থাকছেন, তখনই ঘটে যাচ্ছে এক-একটা অনভিপ্রেত ঘটনা। কিংবা প্রকারান্তরে বলা যায়, যে-যে রাতে আপনি এখানে হল্ট করছেন, সেদিনই ঘটনাগুলো ঘটছে। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?

রণধীর তরফদার কপাল চাপড়ে বললেন, এ সবই আমার ব্যাড লাক, গ্রহের ফের।

—উহুঁ, শুধু ভাগ্যের দোহাই দিয়ে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইলে হবে না। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু খুলে বলুন এ-ব্যাপারে।

রণধীর তরফদার অসহায়ের মতো মুখ করে বললেন, ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।

—আচ্ছা, এ-কথাটা কি সত্যি যে, ক'দিন আগে তুলিকা রায়ের সঙ্গে আপনার খুব কথা কাটাকাটি হয়?

—হয়েছিল। কিন্তু সেই কথা কাটাকাটি এমন একটা পর্যায়ে ওঠেনি যার ফলে তাকে খুন করব আমি।

—এমনও তো হতে পারে আপনার কোনও গোপন ব্যবসায়ের কথা তুলিকা রায় জেনে ফেলেছিলেন, সেটা পাঁচ কান হলে আপনার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়ে যেত, তাই তুলিকাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন?

রণধীর তরফদার চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, যে-ব্যবসাই আমি করে থাকি না কেন, সেটা তুলিকার জানার কথা নয়। জানলেও আমার খুব একটা ক্ষতি হবে তা নয়।

—আপনি কীসের ব্যবসা করেন, মিঃ তরফদার।

—সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—এতটাই ব্যক্তিগত যে পাঁচজনের সামনে তা প্রকাশ করা যাবে না!

—না করাই তো ভাল।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ পরখ করলেন রণধীর তরফদারের অভিব্যক্তি, তারপর দুম করে বললেন, আমি যদি বলি, একটি নারী পাচারকারী চক্রের সঙ্গে আপনি যুক্ত। সেটা তুলিকা রায় জেনে ফেলেছিলেন বলেই—

—সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। ভাবার ওপর তো কোনও লাইসেন্স নেই।

এবার রণধীর একটু চটেছেন বলে মনে হল দ্যুতিমানের। তক্ষুনি প্রসঙ্গ বদলে বলল, আচ্ছা, এই পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা কার আপনি জানেন।

—হ্যাঁ। মনে তো হচ্ছে ওটা নিবেদিতার। কী করে তুলিকার ঘরে এল তা বলতে পারব না। সেটা নিবেদিতাই বলতে পারবে।

—ঠিক আছে, নিবেদিতা সান্যালকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

রণধীর তরফদার বেরিয়ে যাওয়ার পর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ভাবলেন লোকটার বক্তব্য, কথনভঙ্গি ও মোটিভ নিয়ে। তাঁর পাশে বসে থাকা সাব-ইন্সপেক্টর চঞ্চল প্রহরাজের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় লোকটি তত কুটিল নয়। কিন্তু আমার ধারণা এক নম্বরের ঘোড়েল। লোকটা প্রতি রবিবার কীসের ব্যবসা করে সেটা কিন্তু আমাদের জানতেই হবে।

—ইউ উইল নো ইট বাই দিস উইক, স্যার, চঞ্চল প্রহরাজ বেশ জোর দিয়ে বললেন কথাটা।

—থ্যাঙ্কু, প্রহরাজ।

তাঁর কথা শেষ না হতেই নিবেদিতার আবির্ভাব। খুবই ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে নিবেদিতা সান্যালকে। দ্যুতিমান চ্যাটার্জি যুবতীটিকে বার দুই মেপে নিলেন তাঁর হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে। নিবেদিতা তাদের সামনের চেয়ারে বসতে না বসতেই দ্যুতিমান তাঁর তূণের তির ছুড়ে দিলেন শব্দভেদীর মতো, মিসেস সান্যাল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন 'আশ্রয়'-এ পরপর যে-দুর্ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, সেগুলি ঘটানোর পেছনে আপনারই হাত আছে বলে সন্দেহ করছেন অনেকেই।

নিবেদিতা একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, সে তো প্রথম থেকেই আমি পুলিশের ও এখানকার অনেকের চোখেই সন্দেহভাজন। এমনকী এখানকার সবুজেরাও তাই ভাবে।

—হ্যাঁ। সন্দেহটা এখন আরও জোরদার হয়েছে, কারণ যে-পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা দিয়ে তুলিকা রায়ের মাথায় আঘাত করা হয়েছে সেটা আপনারই।

নিবেদিতা উদাস ভঙ্গিতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, সন্দেহ হওয়াটা অমূলক নয়। কিন্তু তুলিকা কাল বিকেলেই টর্চটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল বলেছিল তিয়াসা রাতে মেন্টর'স হাউসে থাকবে না। ও একাই থাকবে। একটা টর্চ সঙ্গে থাকলে সাহস বাড়ে।

—কিন্তু মহিলা তো শুনেছি খুব সাহসী ছিলেন, প্রায়ই নাকি অনেক রাতে বাইরে থেকে একা ফিরতেন?

নিবেদিতা চুপ করে রইল।

—আচ্ছা, মিসেস সান্যাল, আমার সিনিয়র কলিগ দেবাদ্রি সান্যাল অনেকদিন আগে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আপনার প্রাক্তন স্বামী বিলাস সান্যাল কেন মাঝেমধ্যে দেখা করতে আসেন। সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু আপনি দেননি।

—এখনও দিচ্ছি না।

—তাই! কিন্তু এখন কি বলবেন কাল বিকেলে হঠাৎ কেন আপনাকে ফোন করেছিলেন বিলাস সান্যাল!

নিবেদিতা চমকে উঠে বলল, সে খবরও কি আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে এর মধ্যে'

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যা জানতে চাইছি তার উত্তর দিন।

—সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে 'আশ্রয়'-এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক আছে কি নেই সেটা আমরা বুঝব। উত্তরটা আমাদের চাই।

—তাহলে সে প্রশ্নটা বরং বিলাস সান্যালকেই আপনারা করুন।

—তিনি কোথায় আছেন সেটা এই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারছি না। সম্ভবত তিনি অ্যাবস্কণ্ডিং।

—অ্যাবস্কণ্ডিং। তাহলে তিনি আমাকে ফোন করলেন কী করে!

—নিশ্চয়ই আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে। তাঁর শোরুমে একদিন ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিলেন ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। তারপর থেকেই তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত পুলিশের ভয়ে পালিয়েছেন কোথাও। একমাত্র আপনিই জানতে পারেন তিনি এখন কোথায় শেল্টার নিয়েছেন।

নিবেদিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি জানি না তিনি কোথায়। টেলিফোন করে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। আমি রাজি থাকলে তিনি হয়তো আমাকে কোনও ঠিকানা দিতেন আলোচনা করতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি রাজি হইনি।

খুব হতাশ দেখাল দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে। বললেন, আমরা তাঁর শোরুম, বাড়ি—দু জায়গাতেই পুলিশ পোস্টিং করে দিয়েছি, পালিয়ে আর কদ্দিন থাকবেন! কিন্তু কী জরুরি আলোচনা তা কি বলেছিলেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিবেদিতা বলল, না।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি আরও কিছুক্ষণ নিরিখ করলেন নিবেদিতাকে, আপনি কিন্তু কিছু চেপে যেতে চাইছেন, মিসেস সান্যাল। কিছু জরুরি তথ্য চাপতে চাইলে শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আপনার বিরুদ্ধেই যাবে। আপনি আমাদের সহযোগিতা করুন।

নিবেদিতা ভাবলেশহীন মুখে বলল, আমিও চাই এইসব অনৈতিক কাজ যে বা যারা করে চলেছে তারা ধরা পড়ুক। তাদের শাস্তি হোক।

—তাই নাকি! তা যদি হয় তাহলে আপনার উচিত সব কথা খুলে বলা, দ্যুতিমান চ্যাটার্জি চাইছেন নিবেদিতা সান্যাল নামক তত্ত্বাবধায়কটির সঠিক চরিত্র বুঝে উঠতে, তাহলে এবার বলুন তো, বিলাস সান্যালের সঙ্গে আপনি জড়িয়ে পড়লেন কীভাবে? আপনার সঙ্গে কীভাবে বিয়েটা হল?

—সেটা কি জানা খুবই জরুরি? অন্তত 'আশ্রয়'-এর দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বার করতে?

—মে বি। মে নট বি। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে জানতে, বিষয়টা খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক অজানা তথ্য এমনভাবে বেরিয়ে আসে যা হয়তো একটা ভাইটাল ক্লু হয়ে দাঁড়ায় মামলার চার্জশিট দিতে।

নিবেদিতা ঘাড় নেড়ে অসহায়ের মতো বলল, আমি সত্যিই ওঁকে চিনতাম না। এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিলাম। সেখানেই আলাপ হয় ওঁর সঙ্গে। শুনলাম, সদ্য ফিরেছেন ইংল্যাণ্ড থেকে। ভেরি ব্রাইট কেরিয়ার। আলাপ হওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একান্ত হলেন আমার সঙ্গে। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রস্তাব দেব?' আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, 'কী প্রস্তাব?' তাতে আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে দেখে আমি শরাহত। বলতে পারেন একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছি। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমরা দু'জনে বিয়ে করে ফেলতে পারি।

—তাতেই আপনি রাজি হয়ে গেলেন?

—না, প্রথমে রাজি হইনি। বাড়িতে এসে মাকে বলেছিলাম কথাটা। মা বললেন 'তোর যদি পছন্দ হয়ে থাকে, আর ছেলেটা যদি ভাল হয় তাহলে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।' মায়েরও খুব পছন্দ হয়েছিল ওঁকে দেখে, ওঁর সঙ্গে কথা বলে। বিলেত-ফেরত ছেলে, তার ওপর সুপুরুষ চেহারা, পছন্দ না হওয়ারও কোনও কারণ ছিল না।

—কিন্তু খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না তার পূর্ব ইতিহাস কী?

—কলকাতায় নেওয়া হয়েছিল, তেমন আপত্তিজনক পাওযা যায়নি কিছু।

—কিন্তু বিলেতে গিয়ে তিনি কী করেছিলেন তা জানতে চাননি?

—জানার সুযোগ ছিল না। সময়ও পাওয়া যায়নি, কারণ বিয়ের জন্য উনি খুব চাপ দিচ্ছিলেন।

—পরে কি আপনি জানতে পেরেছিলেন যে, উনি বিলেতে থাকতে একবার বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে করার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী উধাও হয়ে যান। কেউ বলে বিলাস সান্যালই কোনও কারণে হাওয়া করে দেন। সেই মহিলার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি তা জানেন?

নিবেদিতা চুপ করে থাকে একই রকম ভাবলেশহীন মুখে।

—কাল রাতে আপনি কোনও শব্দ শোনেননি? কোনও অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে এরকম মনে হয়নি? আপনি তো মাঝেমধ্যে রাতে ঘুরে বেড়ান বারান্দায়!

নিবেদিতা হঠাৎ ভারী অবাক করে দিয়ে বলল, হ্যাঁ। কিছু একটা শব্দ হয়েছিল বারান্দার ওপাশে।

—কোন পাশে?

—যেদিকটায় আঙ্কেল তরফদারের ঘর।

—কী শব্দ শুনেছিলেন?

—মনে হচ্ছিল ওপাশের তালা-লাগানো দরজাটা কেউ খুলছে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে উত্তেজিত হতে দেখা যায় খুব কম। কিন্তু তাঁর স্থির অভিব্যক্তিতেও যেন চিড় ধরল, তারপর? আপনি ওঠেননি বিছানা থেকে?

—হুঁ, উঠেছিলাম।

—দেখতে যাননি অস্বাভাবিক শব্দটার উৎস কোথায়?

—গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল কেউ যেন দরজাটা একটু আগে খুলেছিল। কিন্তু দরজাটা লক করা দেখে আর কাউকে বলিনি কিছু।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি চোখ বুজে কিছু ভাবলেন নিশ্চয়ই। পরক্ষণে সাব-ইনস্পেক্টর চঞ্চল প্রহারাজকে বললেন, আপনি চট করে একবার দেখে আসুন তো, ওপাশের দরজাটায় তালা লাগানো আছে কিনা।

চঞ্চল প্রহরাজ তখনই বেরিয়ে যাওয়ায় দ্যুতিমান চ্যাটার্জি এক মুহূর্ত অস্বস্তিতে। পরক্ষণেই নিজেও উঠে দাঁড়ালেন কী ভেবে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, অদূরে সমুদ্রনীল নামের একজন তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়িয়ে। তাকে হাত নেড়ে ডাকলেন। সমুদ্রনীল কাছে আসতেই বললেন, আসুন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

সমুদ্রনীলকে নিয়ে এসে বসালেন সামনের চেয়ারটিতে। অতঃপর একটু স্বস্তি। তাঁদের চাকরিতে একটা নিয়ম আছে কোনও মহিলাকে একা ইন্টারোগেট না করতে। যে-কোনও আর একজনকে সামনে রাখা উচিত। না হলে সেই মহিলা পরে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনলে তার মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সেই মহিলা যদি মামলার সন্দেহভাজন হন, তাহলে তো জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তৃতীয় ব্যক্তিকে সামনে রাখাই উচিত।

সমুদ্রনীলের চেহারাটা হঠাৎ নজর কাড়ার মতো। তার দীর্ঘায়ত দু-চোখে একটা স্বপ্নের আভাস। যখন তাকায় মনে হয় সামনে কেউ নেই। যখন কথা বলে মনে হয় ঠিক কাউকে উদ্দেশ করে বলছে না। যেন নিজের সঙ্গেই তার কথা বলা।

নিবেদিতাকে হঠাৎই ছুটি দিয়ে দ্যুতিমান চ্যাটার্জি পড়লেন সমুদ্রনীলকে নিয়ে। আগের দু'জনই এই মামলার সন্দেহভাজন, কিন্তু সমুদ্রনীল নয়। তবু ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা যাক কোনও নতুন ক্লু পাওয়া যায় কি না।

—আপনি তো এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত আছেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে এত উলটপালট কাণ্ড ঘটে গেল, এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? বিশেষ কারও হাত আছে কিনা এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু ভেবেছেন?

সমুদ্রনীল ঘাড় নাড়ল, না।

—না মানে? কারও ওপর কোনও সন্দেহ হয় কি না আপনার?

সমুদ্রনীল তাকিয়ে রইল বিষণ্ণ ভঙ্গিতে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি ঝুঁকে পড়লেন সমুদ্রনীলের দিকে, কিছু বলছেন না কেন? আপনারা সবাই যদি ঘটনাটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে কালপ্রিট কোনও দিনই ধরা পড়বে না। ধরা না পড়লে এর পর আরও দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে। আরও মেয়ে নিখোঁজ হবে। আরও খুন হওয়া বিচিত্র নয়।

সমুদ্রনীল হঠাৎ হেসে উঠে বলল, কোনও দিন দেখবেন আমিও খুন হয়ে গেছি। এভাবেই রক্ত মেখে শুয়ে আছি বিছানায়।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি চকিতে শক্ত হয়ে গেলেন, আবারও ঝুঁকে পড়ে বললেন, কেন এ কথা আপনার মনে হচ্ছে? আপনি কি বুঝতে পারছেন কে বা কারা এর পেছনে আছে?

সমুদ্রনীল কিছু বলল না।

—আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার ওপরও অ্যাটেম্পট্ হতে পারে?

সমুদ্রনীল ঘাড় নেড়ে বলল, আমি জানি না। কিছুই জানি না। আমার হিসেবের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। আমার তো মনে হচ্ছিল তুলিকাই হয়তো বাইয়েব অন্তর্ধানের পেছনে আছে। এখন তুলিকাই খুন হয়ে গেল।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি একটু একটু করে খোঁচাতে শুরু করলেন সমুদ্রনীলকে, হিসেবটা তাহলে নতুনভাবে শুরু করুন না! তুলিকাকে কে বা কারা খুন করতে পারে। তুলিকাকে খুন করার পেছনে কী মোটিভ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সমুদ্রনীল। কিছুক্ষণ চোখ উদাস করে ভাবল কিছু। নিজের মনে এলোমেলো হল কিছু অতলান্তিক ভাবনায়। তারপর বলল, তুলিকা হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হত কোথাও। বাইরের কারও সঙ্গে মেলামেশা ছিল। কার বা কাদের সঙ্গে মিশত তা বলত না। জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিত। কখনও বলত, 'বুঝলে বেটোফেন, শুধু গিটার বাজিয়েই কাটিয়ে দিলে জীবনটা। জীবনের কালো দিকটা চিনলে না।' জিজ্ঞাসা করতাম, 'তুমি কতটা চিনেছ?' বলত, 'এক জীবনের পক্ষে অনেকখানি।'

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি উত্তেজনা দমন করে বললেন, সেই কালো জীবন সম্পর্কে তুলিকা রায় কখনও কিছু বলেননি?

—না, তবে মনে হত এমন কারও খপ্পরে পড়েছে যে ওকে নিংড়ে নিচ্ছে। ও আর নিজের বশে ছিল না।

—ফাদার জানতেন তুলিকা রায়ের এই গোপন জীবনের কথা?

—নিশ্চয়ই জানতেন না সবটা। তবে প্রায়ই বকাবকি করতেন ওকে। সবার সামনেই বলতেন, প্রত্যেক মানুষেরই উচিত খেয়ালখুশির লাগামটা সময়মতো টেনে ধরা। নইলে পরে পস্তাতে হয়।

—আর কিছু ইনফরমেশন দিতে পারেন?

—ফাদার যখন 'আশ্রয়'-এ থাকতেন না, সেসময় তুলিকা কাউকে ফোন করত। খুব নিচু গলায় কথা বলত কারও সঙ্গে। বহুক্ষণ ধরে। আমি একদিন ইয়ার্কি করে বলেছিলাম, 'কার সঙ্গে কথা বলছ মিস? ফিয়াঁসের সঙ্গে?' ও উত্তর দিয়েছিল, যদি বলেই থাকি, তাতে তোমার কী? আমার জীবনটা তো আমারই, তাই না?

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি আরও কিছু বলার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন সাব-ইনস্পেকটর চঞ্চল প্রহরাজ, মুখেচোখে উত্তেজনার ফুলকি, স্যার, একবার ওপরে চলুন তো। ওপাশের সিঁড়ির তালাটা খোলা। মনে হচ্ছে কেউ কাল রাতে সত্যিই দরজাটা খুলেছিল। দরজার লকটা এমন যে দুদিক দিয়েই খোলা যায়।

—সে কি! দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে এতক্ষণে একটু চঞ্চল দেখাল। চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। চঞ্চল প্রহরাজকে নিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেন। আঙ্কেল রণধীর তরফদারের ঘরের সামনে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। নীচে নামার আগেই সিঁড়ির বাঁকে একটা দরজা। সেই দরজার তালাটা আপাত দৃষ্টিতে বন্ধ মনে হলেও আসলে খোলা। অর্থাৎ ওপর থেকে কেউ নীচে নেমেছিল রাতের বেলা।

কী আশ্চর্য, সকাল থেকে বারান্দায় এত ভিড়, কিন্তু কেউই লক্ষ করেনি এই অস্বাভাবি ঘটনাটা!

কিন্তু দরজার তালা খুললই বা কে! চাবি তো থাকে রণধীর তরফদারের কাছে!

## ॥ ২০ ॥

তুলিকা-খুনের ব্যাপারে পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি যখন তোলপাড় করছে 'আশ্রয়', বারবার জিজ্ঞাসা করছেন রণধীর তরফদারকে, 'হঠাৎ এদিক দিয়ে নীচে নাম দরজার তালা খোলা হল কেন', আর আক্কেল তরফদার 'আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝা পারছি না' বলে ভাল সাজার চেষ্টা করছেন, সেসময় গার্গী ওপরের ঘরে তিয়াসার সঙ্গে ক বলছিল নিচু গলায়।

তিয়াসা প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। সে বরাবরই খুব নম্র, লাজু স্বভাবের। কথা সে এতই কম বলে যে, বলে না বললেই চলে। কিন্তু গার্গী তার এককালে বান্ধবী। গার্গী যখন এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিল, তিয়াসার সঙ্গে ভালই সম্পর্ক ছিল তা আসলে গার্গীর স্বভাব অনুযায়ী সে খুব দ্রুত অন্যকে আপন করে নিতে পারে। আজও পুরনো ঘনিষ্ঠতা ঝালিয়ে নিতে নিতে উদ্ধার করতে চাইছিল কোনও গোপন টানাপোড়ে

তিয়াসা এই ঘটনায় এতখানি ভেঙে পড়েছে যে, কেবলই তার চোখ ফেটে জল আসা গার্গী তাকে এ-কথা সে-কথা বলে ভোলাতে চাইছিল। আলোচনা করছিল পুরনো দিনে স্মৃতিচিত্র। কিন্তু ভোলাতে তো সে এখানে আসেনি। তার প্রয়োজন কিছু গূঢ় ও জটি সংকেত পাওয়া যা তুলিকা-হত্যার কারণ উদঘাটিত করতে সাহায্য করবে।

আসলে তুলিকা কখনও কারও কাছে প্রকাশ করত না তার অতীত জীবনের কাথা। কী করে 'আশ্রয়'-এ এল, তার বাড়িই বা কোথায়, কেই বা আছে তার সংসারে তা কিছুতে প্রকাশ করেনি কখনও। গার্গীদের শুধু মনে হত তার আগের জীবনে এমন কিছু গর্হিত আঁধ আছে যা সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে বাকি সবাইকার কাছে। আছে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন যার ফলে তার এখনকার জীবনেও ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খলতা।

কী ছিল তার সেই অতীত জীবন তা গার্গী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করল তিয়াসার ক থেকে। বোধহয় একমাত্র তিয়াসাই জানে তুলিকার সেই ফেলে আসা জীবনপঞ্জি।

কলেজ-কিশোরী তুলিকা ছিল বেশ বড়লোকের মেয়ে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও যা তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে সে কারণে তার পিতৃদেব চেয়েছিলেন নাচে-গানেও অনন্যা হ উঠুক তাঁর কন্যাটি। তুলিকাকে নাচ শেখাতে আসতেন নাচে পারদর্শী এক মধ্যবয়স্কা মহিল আর গান শেখাতেন এক প্রৌঢ় নামী গায়ক। কলেজ জীবনের মাঝপথে যখন, হঠাৎ একদি কলেজ থেকে আর বাড়ি ফিরল না তুলিকা। তার বাবা গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার প থানা, হাসপাতাল, মর্গ কিছুই টুঁ মারতে বাকি রাখেননি। শুধু সেদিনই নয়, আরও তিনদিনের মধ্যেও যখন এল না, তার বাবা খোঁজ নিয়ে জানলেন, গানের প্রৌঢ় শিক্ষকটি নিপাত্তা। মেয়ের আর খোঁজ করেননি তুলিকার বাবা। হাত ধুয়ে ফেলার মতো নিশ্চিন্ত হ

বলেছিলেন, মেয়ের কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনওরকম নাক গলাতে গেলেই বলত, 'বাবা, আমার জীবনটা তো আমারই, তাই না?' অতএব এখন থেকে ওর জীবনটা ওরই। আমার আর ভাবার কোনও দায় নেই এর পর।

তুলিকা কিন্তু ফিরেছিল মাস ছয়েক পর, একাই। সেই গানের টিচারের কোনও হদিশ সে জানে না। তুলিকার বাবা কিন্তু মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাননি। বলেছিলেন, ওর জীবনটা ওই বুঝে নিক। আমার কোনও বোঝার ব্যাপার নেই আর।

সেসময় ফাদারের সঙ্গে দেখা হয় তার। ফাদার তাকে শুধু বিপদমুক্তই করেননি, তার বাকি জীবনের ভারও নিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে। ইদানীং তো তুলিকার ওপর অনেকখানি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন 'আশ্রয়'-এর দেখভাল করারও।

সেই তুলিকা খুন হয়ে যাওয়ায় ফাদার যেমন ঘোর সংকটের আবর্তে, তেমনই 'আশ্রয়'ও।

ফাদার হয়তো এতক্ষণে পেয়ে গেছেন এই ভীষণ দুঃসংবাদের শেল। তারপর তাঁর মনের অবস্থা কী, কী ভাবে ফিরবেন এই দীর্ঘ পথ তা ভেবে অস্থির হচ্ছিল গার্গী।

—আচ্ছা তিয়াসা, তুই তো তুলিকার খুব কাছের মানুষ, এক ঘরে এত দিন কাটালি পাশাপাশি চৌকিতে শুয়ে, তোর কি মনে হয় তুলিকার জীবনে এমন কিছু গোপন ব্যাপার ছিল যে-কারণে খুন হতে হল তাকে?

তিয়াসা এতক্ষণ কান্না-ভেজানো গলায় কথা বলছিল। হঠাৎ একটু শক্ত হয়ে বলল, আমার একজনকে সন্দেহ হয়।

—হয়! গার্গী চমকে উঠল, কাকে ?

—সমুদ্রনীল।

—সমুদ্রনীল। হঠাৎ এত-এত লোক চারপাশে থাকতে একটা নিরীহ, গুডি-গুডি চেহারার ছেলেকে টার্গেট করলি?

—ও মোটেই গুডি-গুডি বয় নয়। ওর রাগ তো দেখিসনি তোরা। খুব সামান্য কারণে একদিন হাতঘড়িটা মাটিতে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারপর কতদিন ঘড়ি না পরেই দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

—কিন্তু সমুদ্রনীল হঠাৎ এত বড় একটা অপরাধ করতে যাবে কেন?

—আসলে রাই হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় ভীষণ তেতে ছিল সমুদ্রনীল। এর আগে আর একটা মেয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘ ঘোরাঘুরির পর কানপুরে গিয়ে আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সেই যন্ত্রণাটা দীর্ঘকাল ওকে পুড়িয়েছে। রাই নামের মেয়েটি হঠাৎই ওর প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় ত্রিস্তাকে হারানোর দুঃখটা ভুলতে শুরু করেছিল সবে। সেসময় আবার রাইকে হারানোয় কয়েকদিন পাগলের মতো আচরণ করছিল।

গার্গী কৌতূহলী হয়, কীরকম?

—একদিন আমাদের ঘরে এসে তুলিকাকে বলল, 'রাই নিখোঁজ হওয়ার জন্য তোমরাই দায়ী।' তাতে তুলিকা খুব রেগে গিয়েছিল, বলেছিল, 'ফাদার চাইছেন প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে কোনও না কোনও ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বিশেষ করে যে-সব মেয়েদের বয়স সতেরো-আঠারোর কাছাকাছি, তাদের যদি এখনই যোগ্য হাতে অর্পণ করা যায়, তাহলে তাদেরই মঙ্গল। এত-এত মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা তো সহজ ব্যাপার নয়।'

—সমুদ্রনীল কি খুব ভেঙ্গে পড়েছিল?

—হ্যাঁ। ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল খুব বিপর্যস্ত ভেতরে ভেতরে।

—সমুদ্রনীলের আর কোনও আচরণ কি চোখে পড়েছে যা দেখে মনে হয়েছে ও এরকম একটা ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

তিয়াসা চুপ করে থাকে। তারপর তার বালিশের তলা থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করে এগিয়ে দেয় গার্গীর দিকে। সবুজ মলাটের নোটবইটার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নানান আবেগের স্বগতোক্তি। সেগুলো দেখিয়ে তিয়াসা বলল, এগুলো পড়ে দেখ। পড়লেই বুঝতে পারবি, ওকে দেখতে অমন শান্তশিষ্ট মনে হলেও ভেতরে-ভেতরে ও ভীষণ ভয়ঙ্কর।

গার্গী দু-এক পৃষ্ঠা বলল, কোথায় পেলি এটা?

—ভোরে মেণ্টর'স হাউসে হইচই শুনে আমি যখন মেয়েদের হোস্টেল থেকে ছুটে এলাম, দেখি সবাই তুলিকার ডেডবডিটা হুমড়ি খেয়ে দেখতে ব্যস্ত। সব দেখেশুনে থর থর করে তখন কাঁপছিলাম। শরীরটা টলছিল, গা-হাত-পা অবশ। তাড়াতাড়ি সমুদ্রনীলের ঘরে ঢুকে পড়ি। ওদের ঘরে তখন কেউ ছিল না। নির্মাল্য আর সমুদ্রনীল দু'জনেই তুলিকাকে দেখতে গেছে। তখনই চোখে পড়ল সমুদ্রনীলের খাটের ওপর এই ডায়েরিটা। আমার তখন চোখ ফেটে জল আসছে। অনেকক্ষণ কাঁদলাম একা-একা। তারপর একসময় ডায়েরিটা টেনে নিয়ে পড়তে থাকি। পড়তে পড়তে মনে হল তা হলে সমুদ্রনীলই—

গার্গী হঠাৎ বলল, আমি ডায়েরিটা পরে পড়ব। একটু মন দিয়ে পড়তে হবে কী আসলে এ ক'দিন ভাবছিল সমুদ্রনীল। এটা আপাতত আমার কাছেই থাক, তিয়াসা।

বলতে বলতে তার কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল ডায়েরিটা। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই অনুভব করেছে এ ক'দিন খুবই টানাপোড়েনে ব্যাপৃত ছিল সমুদ্রনীল। ভাঙচুর চলছিল তার সত্তার ভেতর। হঠাৎ একটা ঝড়ে যেন তছনছ হয়ে গেছে তার জীবন, তার ভালবাসা, তার অস্তিত্ব। কী জানি কালো অক্ষরগুলো একান্তে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলে হয়তো কোনও ক্লু বেরিয়েও আসতে পারে। পরক্ষণে প্রসঙ্গ বদলে চলে এল আঙ্কেল বিষয়ে কিছু আলোচনায়।

—আচ্ছা তিয়াসা, আঙ্কেলকে তোর কী রকম মনে হয়?

তিয়াসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, মুখ নিচু করে কী যেন ভাবে, তারপর বলল, তুই বোধহয় জানিস, এর আগে একদিন আঙ্কেল হন্ট করেছিলেন মেন্টর'স হাউসে। সেই রাতে তুলিকা ছিল মেয়েদের হোস্টেলে। আমি এখানে একা। উনি মাঝরাতে কড়া নেড়ে ডেকে তুলেছিলেন আমাকে। কেন ডেকেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। উনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা সবারই মনে হয়েছিল ভারী অবাস্তব। সে রাতেও কিন্তু উনি ওঁর ঘরের সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে তালা খুলে নেমে গিয়েছিলেন লনের দিকে। কালও, কী আশ্চর্য, তুলিকা একা ছিল ঘরে। এমনও হতে পারে উনি কালও তুলিকার দরজায় একইভাবে কড়া নেড়েছিলেন। তারপর—

গার্গী খুবই জরুরিভাবে নাড়াচাড়া করল তিয়াসার কথাগুলো। অনেকগুলো ঘটনা এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, এতগুলো দুর্ঘটনার পেছনে কার কী মোটিভ তা খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। তবু প্রতিটি কথাই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তিয়াসার সঙ্গে কথা বলাবলির ফুরসতে হঠাৎই খবর পাওয়া গেল, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন সাব-ইন্সপেক্টর মেন্টর'স হাউসে এসে আঙ্কেল তরফদারের ঘরের

সামনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখে গেছেন, সিঁড়ির দরজার তালাটা খোলা। সবাই বলাবলি করছে, তালাটা তো বন্ধই থাকে বরাবর। হঠাৎ কে খুলল কাল রাতে। চাবি তো থাকে আঙ্কেল তরফদারের কাছে। তিনি ছাড়া আর কে-ই বা খুলবে ওই দরজা।

সংবাদটা খুবই ধন্দে ফেলল গার্গীকে। একরাশ দোলাচলে আবর্তিত হয়ে ভাবল, তুলিকা খুন হওয়ার পেছনে অন্তত দু'জনের মোটিভ ও কার্যকলাপ এই মুহূর্তে চোখের সামনে। রণধীর তরফদার যদি নারীপাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন, আর তুলিকা তাতে বাদ সেধে থাকে, তাহলে তুলিকাকে সরিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। 'আশ্রয়'-এ ঘটে যাওয়া পর পর ঘটনাবলীর প্রত্যেকটিতেই রণধীর তরফদের উপস্থিতি সন্দেহজনক। তাঁর জীবনযাপন, ব্যবসায়ের ধরন সবই গোলমেলে, অন্ধকারে ঢাকা। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম থেকেই তো একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন।

কিন্তু কার মোটিভ এখানে বড়। সমুদ্রনীলের, না রণধীর তরফদারের। না কি আরও কেউ জড়িত আছে যে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে এই অকর্মকাণ্ডের!

হঠাৎ বাইরে দুই নারীপুরুষের কলহ দৃষ্টি আকর্ষণ করল গার্গীর। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে রীতিমতো গলার শিরা ফুলিয়ে চোটপাট করছে বিশাখা। তার সামনে অপরাধী-অপরাধী মুখ করে অন্য ডেপুটি ডিরেক্টর—চম্পক চট্টরাজ। বিশাখা সাধারণত কম কথা বলে, কিন্তু জাঁহাবাজ ঝগড়ুটে বলে তার খ্যাতি আছে এ-চত্বরে। তার ঝগড়া করার কারণ বহুবিধ। মশারি টাঙানোর দড়ি খুঁজে না পেলেও সে যেমন ঝগড়া করে রুমমেটের সঙ্গে, তেমনই খাওয়ার টেবিলে মাছের পিস ছোট সাইজের হলেও সে ঝগড়ায় সামিল হয়। আজ হাত মুখ নেড়ে বলছিল, আপনারাই তুলিকার এই পরিণতির জন্য দায়ী। অন্য সব ব্রাদার-সিস্টারদের সামান্য অপরাধেও আপনারা শাসন করেন, কারও পান থেকে চুন খসার উপায় থাকে না, নিবেদিতা রাতে বারান্দায় জেগে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখলেও তাকে শাসন করেন আপনারা, অথচ তুলিকার জীবনযাপন বেয়াড়া হলেও আপনারা মুখ বুজে থাকতেন।

চম্পক চট্টরাজ গম্ভীর মানুষ, বললেন, ফাদারকে অনেকবার বলা হয়েছে ওর নামে।

—ফাদারের আত্মীয়া বলে হয়তো ফাদার কিছু বলতে পারেন না ওকে। কিন্তু আপনারা তো শাসন করতে পারতেন। আপনারা কিছু বললে কি ফাদার আপনাদের চাকরি খেয়ে নিতেন? এত চাকরির ভয় আপনাদের?

চম্পক চট্টরাজ মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু একজন তত্ত্বাবধায়কের কাছে ওভাবে তিরস্কৃত হওয়াটাকে ঠিক হজম করতে পারছেন না। তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। বিশাখা তার সহকর্মীদের ওপর প্রায়শ চেঁচামেচি করে। সবুজদের শাসন করার সময়ও সে খড়গহস্ত। কিন্তু ওপরওয়ালাদের সমঝে চলে বরাবর। আজ তার এহেন বিস্ফোরণ একটা কারণেই। তার বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাবা নেই। দাদা-বউদির সঙ্গে একেবারেই বনে না। তাই বাড়ি ছেড়ে এরকম একটা চাকরি নিয়ে পড়ে আছে 'আশ্রয়'-এ। এখন সে চাকরিটা চলে গেলে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। সেটা তার পক্ষে একেবারেই দুঃসহ। তাই হায়ার্কির ব্যাপারটাও মাথায় রাখছে না আজ।

গার্গী তখনই তার চোখা নাকটা গলিয়ে দিল দু'জনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা এলোঝড়ের মধ্যে। বিশাখাকে ধরে নিয়ে এল এদিকে, এই, তুই এখন মাথা গরম করিস নে। দেখছিস তো, কী সব ঝামেলা চলছে, তার মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ আরও বিশ্রী করে ফেলছে আবহাওয়াটা।

বিশাখা তখনও ফুঁসছে, আর আবহাওয়া! দুই ডেপুটি ডিরেক্টর হয়েছে দুই ধামাধরা। ফাদার হ্যাঁ বললে হ্যাঁ বলেন, না বললে না। যত শাসন আর বিধিনিষেধ সব আমাদের ওপর। তুলিকা সব শাসনের ঊর্ধ্বে। কোথায় কার সঙ্গে মিশত, কী করত সেখানে, তার খবর কেউ রাখত না। ফাদারেরও ওর বেলায় সাত খুন মাপ। একজন তত্ত্বাবধায়ক একটার পর একটা অপরাধ করে যাবে, তাকে যদি প্রথমেই বাধা না দেওয়া হয়, তখন একসময় তার এই পরিণতি তো হবেই।

গার্গী তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আরও নিরাপদ অন্তরালে। দেখা যাক, বিশাখার কাছ থেকে কিছু টেনে বার করা যায় কিনা। একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এতগুলো চরিত্র, তারা এই দুর্ঘটনাগুলোকে কে কী চোখে দেখছে, কার মনে কী ধারণার জন্ম হয়েছে তা এক-এক করে বাজিয়ে দেখতে হবে। বিশাখার কথাগুলোর মধ্যে কী এক গূঢ় সঙ্কেত লুকিয়ে আছে যেন। জিজ্ঞাসা করল, তোর কী মনে হয়? তুলিকা এত সব ব্যাপারের মধ্যে কী ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ ছিল?

মুহূর্তে বিশাখা সাবধান হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চিৎকার করে কথা বলায় সম্বিতও হারিয়ে ফেলেছিল যেন। গার্গী যেইমাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার কানে সেঁধিয়ে দিল, অমনি কেমন আতঙ্কিত দেখাল তাকে, বলল, তা আমি কী করে জানব?

—তা হলে তুই অত চেঁচাচ্ছিলি কেন?

বিশাখা হঠাৎ চুপ করে যায়। বলে, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। পরে বলব।

—কেন, এখনই বল্ না, গার্গী তাকে একটু চাপ দেয়। বিশাখা এখন বেশ টেনসনের মধ্যে আছে। সঙ্কটের মধ্যে বাস করলে এমন অনেক কথা পেট থেকে বার করা যায় যা স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে চাইবে না কেউ, বলল, তুলিকা কাদের সঙ্গে মিশছিল ইদানীং? তুই কিছু জানিস?

বিশাখা ঘাড় নাড়ল, না।

—তাদের সম্পর্কে তোর কোনও ধারণা হয়নি এত দিনে?

বিশাখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তারা যারাই হোক, খুব ভাল লোক নয়।

—তা হলে ওদের সঙ্গে তুলিকা মিশত কেন?

—কী জানি কেন মিশত। হয়তো না মিশে উপায় ছিল না।

গার্গী বুঝে উঠতে চাইল তুলিকার জীবনযাপনের খুঁটিনাটি। এমনও হতে পারে প্রথমে তাদের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগত। জীবনযাপনে কিছু এলোমেলো বলেই ভাল লাগাটা ছিল তুলিকার কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিল জায়গাটা খুব সহজ নয়, একটা গভীর গাড্ডা।

ভাবনাটা কিছুক্ষণ লোফালুফি করার পর সহসা গার্গীর মনে একটা নতুন ভাবনা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কয়েকদিন আগে বিলাস সান্যাল দেবাদ্রিকে বলেছিলেন, মেয়েগুলো নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পেছনে আছে একজন তত্ত্বাবধায়ক। কোনও রাঘব বোয়াল নয়, একটা কুচো চিংড়িই ঘটাচ্ছে এত সব কাণ্ড। তাহলে তুলিকাই কি কোনও গ্যাঙের চাপে পড়ে এ সব করাচ্ছিল। এখন বেঁকে বসায় খুন হয়ে যেতে হল তাকে! কিন্তু এরকম ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে কী করে বাইরের লোক ঢুকে খুন করবে তাকে! প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কম্পাউণ্ডের ভেতরের কারও পক্ষেই এ-কাজ করা সম্ভবপর। কিন্তু কে সেই খুনি! কেনই বা খুন করল তুলিকাকে। যদি কেউ তাকে ব্ল্যাকমেল করেই থাকে, তাহলে ফাদারকে এতদিন ঘটনাটা

ানায়নি কেন তুলিকা। ফাদার যেদিন অনুপস্থিত থাকেন, সেদিনই কিন্তু ঘটে যাচ্ছিল ংখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো। আবার ফাদারের অনুপস্থিতির দিনেই খুন হল সে!

সমস্ত ঘটনাগুলো যতবার গার্গী ভাবছে, কেবলই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কানওটার সঙ্গে কোনওটা জোড়া লাগানো যাচ্ছে না। যেন এটাও হয়, ওটাও হয়। অথবা যন কোনওটাই হয় না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সম্ভাবনার কথা ঝিলিক দেয় হঠাৎ-হঠাৎ। বা মনও হতে পারে তারা এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আসল সত্য দূরে দাঁড়িয়ে ঃশব্দে মজা দেখছে এতগুলো মানুষ ঘোল খাচ্ছে দেখে।

সেদিন পুলিশি-জেরায় নাজেহাল 'আশ্রয়'-এর মানুষদের ছেড়ে ঘরে ফিরতে খুব মায়াই চ্ছিল গার্গীর। এ ক'দিন বারবার কম্পাউণ্ডের এ-কোণে ও-কোণে, এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরতে রতে তার কাছে ফিরে আসছিল পুরনো দিনগুলোর খণ্ডস্মৃতি। 'আশ্রয়' ক্রমশ আপন হয়ে ঠেছিল তার। এ ক'বছর ভুলে থাকা প্রতিষ্ঠানটা তাকে যেন নিঃশব্দে বলছিল, কেন ছেড়ে লে গিয়েছিলে আমাদের! দেখো তো, কী ঝঞ্ঝাটে পড়েছি আমরা।

মনে মনে গার্গী নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল, একটু সবুর করো। এ রহস্যের উন্মোচন শগগিরই হবে। অপরাধী গ্রেপ্তার হলেই আর কোনও ভয় থাকবে না।

আবারও একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে ফিরতে ফিরতে নিজেই একটা কুজ্ঝটিকা হয়ে গেল ার্গী। তাব মাথায় এখন শুধু ভাবনার গাঢ় কুয়াশা। রাশি রাশি কুয়াশা ঠেলে এখন এগুতে বে তাকে।

সেই কুয়াশা আরও ঘন হল যখন রাতে একান্তে খুলে বসল সমুদ্রনীলের সবুজ লাটঅলা নোটবইটা। তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নানান বিপ্রতীপ স্বগতোক্তির ভিড় ঃ

'...ওকে কখনও মনে হয় মরুদ্যান, কখনও সমুদ্রতীরের একটা লাইট হাউস। যেন ামাকে বান দেখাবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে টান টান।'

'...কেন যে মাঝেমধ্যে ওকে এত দুবোধ্য ঠেকে! নাকি এভাবে আড়াল করে রাখাই াবীর স্বভাব। নারী তো কবিতাই। একটু আড়াল থাকলেই বেশি সুন্দর লাগে।'

'...আজ মনে হচ্ছিল ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমাকে। লণ্ডভণ্ড কবে দেবে আমার সমস্ত জীবনযাপন। দিশেহারা হয়ে পড়ি ওর পাগলামিতে।

এক-একটা পৃষ্ঠা পড়ছে, আর গার্গী থামছে একটু করে। আবার অনেকগুলো পৃষ্ঠা ফাঁকা। কছুই লেখা হয়নি কেন যেন। তারপর আবার।

'...ও বলে গিয়েছিল একটা স্বর্গ অর্ডার দিয়ে গেছে কুমোরটুলিতে। ফিরে এসে স্বর্গটা ডেলিভারি নেবে কুমোরটুলি থেকে। সেইসঙ্গে আমাকেও নেবে। তারপর ফিরে যাবে ওর নিজের ডেরায়। হয়তো স্বর্গটা এখনও তৈরি হয়নি। তাই ও-ও আসছে না।'

'...ফেরার পথ দীর্ঘ হয় জানতাম। তাই বলে এ—ত দীর্ঘ। না কি পথটাই বেঁকে গেছে ন্যদিকে!'

'...হয়তো আর কখনও ফিরবে না ও। শুধু শুধু পথ চেয়ে বসে থাকা। কে যেন বলেছিল, ী অন্য নাম বিশ্বাসঘাতিনী। ঠিক বলেছিল।'

গার্গী নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে চলেছে পৃষ্ঠাগুলো। পড়তে পড়তে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার, কটি তরুণী কথা রাখেনি বলে সমগ্র নারীজাতির ওপর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উপচে পড়েছে মুদ্রনীলের ক্রোধ। সে ক্রোধ কখনও অশ্রুতে ভেজা, কখনও জ্বলে উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। বার অনেকগুলো পৃষ্ঠা ফাঁকা। তারপর।

'...ও কেন যে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন বুঝি না। অপ: তাকিয়ে থেকে দেখে আমার কাজ, আর আমাকে কষ্ট দেয়। ও জানে না, আমি এখন ব কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

'...মেয়েগুলো নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক আর আমি মজা দেখছি। যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।'

'...বুঝতে পারছি একদিন ও-ও যাবে। যাবার জন্যই তো ওরা আসে। থাকার জন্য : শুধু আমার কষ্টটা খুঁচিয়ে তুলল আবার। আগেরজনকে তো ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।'

'...যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। রাইকে কোথাও পাঠাবার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। আমি হতে দেব না।'

'...যাও রাই, তুমিও হারিয়ে যাও। তোমরা তো হারাবার জন্যই জন্মেছ!'

একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় এসে চমকে গেল গার্গী। এতক্ষণ উপলব্ধি করছিল এক প্রত্যাখ প্রেমিকের ভেতরটা কীরকম ফুটছে টগবগ করে। হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। এমনকী রাই উপস্থিতিও সে ভাল মনে গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু শেষ লাইনে এসে এ সব কী লি সমুদ্রনীল!

'...আমি যে আর একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চাই তা উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটা করতে পারছিল না। ওকে চরম শাস্তি দিলেই তবে আমার হাড় জুড়োত!'

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, চরম শাস্তি বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে সমুদ্রনী তুলিকাকে খুন করা!

## ॥ ২১ ॥

ফাদার দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল 'আশ্রয়' সবগুলোই বেশ টনক নড়িয়ে দিল গার্গীর। প্রথম ঘটনা রীতিমতো আলোড়ন জাগি ওদের কম্পাউণ্ডে। তুলিকা খুন হওয়ার পর ভীষণ একটা অনিরাপত্তা বিজবিজ করছিল স মধ্যে। বিশেষ করে সবুজ মেয়েরা তো ছটফট করছিল যার-যার ঘরে ফিরে যাওয়ার জ ফাদার বলেছেন, তিনিও তাই ভাবছেন। কিন্তু সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন য তাঁরা এতগুলো দুঃস্থ ছেলেমেয়ের ভার নেন। তার উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব সরকার যদি নিতে অপারগ হন, তাহলেই সবুজদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের বা ঠিকানায়।

সরকারি সিদ্ধান্ত যতদিন না আসে, ফাদার নিজেই একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন যা অনেকে মনে হয়েছে বেশ আশ্চর্যের। এর আগে নিয়ম করেছিলেন প্রতি রাতে পালা করে এক তত্ত্বাবধায়ক থাকবে মেয়েদের হোস্টেলের পাহারায়। সে-ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এক হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ করলেন। তিনি পাকাপাকি থাকবেন মেয়েদের হোস্টে তদারকিতে। তাতে 'আশ্রয়'-এর প্রশাসনেও রদবদল ঘটল। এতদিন হোস্টেলের দৈন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর চম্পক চট্টরাজ। সবুজদের খাওয়া-দাও

পোশাক, থাকা ইত্যাদি সব কিছুর দায়িত্বে থেকে আঙ্কেল চট্টরাজ বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন সবুজদের মধ্যে। এখন থেকে সেই দায়িত্ব অনেকখানি বেঁটে দেওয়া হল হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। যিনি নতুন এলেন, তাঁর নাম শতভিষা রায়। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশের যুবতীটি বয়সের তুলনায় খুবই গম্ভীর। প্রথম দিন থেকেই এমন সব নিয়মবিধি প্রবর্তন করলেন যে, সবুজেরা আশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে কাঁটা হয়ে রইল ভয়ে। এ-কথাও জানাজানি হল, নতুন হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নাকি খুবই কড়া ধাঁচের। শুধু সবুজদেরই নয়, 'আশ্রয়'-এর কোনও কর্মী, এমনকী তত্ত্বাবধায়করাও যদি হেরফের করে কোনও নিয়মনীতির, তাদেরও ছেড়ে কথা বলবেন না শতভিষা রায়।

ফাদার অবশ্য বললেন তিনি ইচ্ছে করেই একজন কড়া সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বহাল করলেন যাতে নতুন করে আর কোনও অঘটন না ঘটে এখানে। অনেকদিন ধরেই তাঁর মনে হচ্ছিল 'আশ্রয়'-এর প্রশাসনে বড্ড ঢিলেমি দেখা দিয়েছে। তিনি একা সব দিক সামাল দিতে পারছেন না। দুই আঙ্কেলকে বহুবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও কেউই রাতে থাকতে পারছেন না 'আশ্রয়'-এ। এতগুলো সবুজের নিরাপত্তা সত্যিই বিঘ্নিত হওয়ার কথা। সে-কারণেই একজন জাঁদরেল মহিলাকে নিয়োগ করলেন যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা আর না ঘটে। ফাদারের যুক্তি অবশ্য অগ্রাহ্য করাও গেল না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা 'আশ্রয়'-এর বাসিন্দাদের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগজনক ঠেকলেও গার্গী যেন আশাই করেছিল এরকমটা। সমুদ্রনীল একদিন ফাদারের চেম্বারে ঢুকে একটুকরো চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বলেছে, গুডবাই ফাদার, আপনি আমার দুঃসময়ে এই চাকরিটা দিয়েছিলেন বলে চার বছর বেশ নিশ্চিন্তে কাটিয়েছি। কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নই কেউ। এই চিরকুটটা হল আমার ইস্তফাপত্র।

ফাদার অবাক হয়ে বলেছেন, তোমার দুঃসময়ে উপকার করেছিলাম বলে এখন আমার দুঃসময়ে তুমি ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

সমুদ্রনীল বলেছে, কোনও উপায় নেই, ফাদার। এখন যা অবস্থা তাতে আমিও যে কোনও দিন খুন হয়ে যেতে পারি।

ফাদার জিজ্ঞাসা করেছেন, তা এখন কোথায় যাবে! কোথাও নতুন চাকরি পেয়েছ?

—নাহ্। তবে খোঁজে থাকছি। যদি কোথাও মাথা গোঁজার একটা জায়গা পেয়ে যাই—

সমুদ্রনীল 'আশ্রয়' ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে বাকি তত্ত্বাবধায়করা পই পই করে অনুরোধ করেছিল, 'যেয়ো না, বেটোফেন।' সমুদ্রনীল শোনেনি। সবুজেরাও তাদের প্রিয় নীলদাকে বিদায় দিতে চায়নি। যে ছোট্ট বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল হোস্টেলের নীচের প্রেয়াররুমে, তাতে ভাষণ দিতে উঠে সমুদ্রনীল কেঁদে ফেলেছে। তাকে সবাই এত ভালবাসে দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলেছে আমি তো যেতে চাইনি। এরা বাধ্য করেছে যেতে।

এরা বলতে কাদের বোঝাল তা আর খোলসা করে বলেনি সমুদ্রনীল। কেউ জানতেও চায়নি কেননা 'আশ্রয়'-এর সবকিছুই এখন ভারী উদ্বেগজনক।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে সমুদ্রনীল চলে যাওয়ার দিন দুই পর। রাই আবার 'আশ্রয়'-এ ফোন করে তার নীলদাকে খুঁজেছিল। সমুদ্রনীল চাকরি ছেড়ে চলে গেছে শুনে রাইয়ের কী কান্না। তারপর তিয়াসাকে লাইনে পেয়ে জানিয়েছে ভারী কষ্টে আছে সে। অপহৃত হওয়ার পরদিন থেকেই একটা ছোট্ট ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তাকে। এত দিন পর তার চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্য কোথাও। গাড়িতে একরাত্রির পথ। এখন যে-জায়গাটায় সে

আছে তার খুব কাছেই সমুদ্র। জায়গাটা বাংলার বাইরে। এর বেশি আর কিছুই বল
পারেনি। এবারও একটা মোবাইল ফোন হাতের কাছে পেয়ে গোপনে ফোন করছে যদি কে
এসে উদ্ধার করে। কিন্তু কোথায় তাকে রাখা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি।
লোকগুলোর মুখে কথা চালাচালি শুনে সে এও অনুমান করছে তাকে হয়তো চালান ক
দেওয়া হবে আরবদেশের কোথাও।

ঘটনাগুলো একটার পর একটা কানে আসছে গার্গীর, আর ভেবে উতল হচ্ছে—কে
ঘটনাটার সঙ্গে কোনটা লিঙ্ক করবে। একদিকে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে উধাও হয়ে গেল, ওদি
একটি জলজ্যান্ত তরুণী খুন হল। কোনও একটা বড় র‍্যাকেট কাজ করছে নিশ্চয়ই—যা
'আশ্রয়'-কে তছনছ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এর পর আরও কী ঘটবে, কিংবা ঘটার আ
অপরাধী ধরা পড়বে কি না পুলিশের জালে তা এখনও পরিষ্কার নয়। সমস্ত ঘটনা নিজে
মনে বার বার বিশ্লেষণ করেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না গার্গী। যেন এক
বিশাল জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে একা, একদম একা, পাশে কেউ নেই, অথচ দৃ
কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না। কোথায় পৌঁছবে তার কোনও ঠিক নেই। চিহ্নমাত্র
কোনও একটা ছোট্ট দ্বীপেরও।

এ সব ক্ষেত্রে সে কিছুটা আলোচনা করতে পারত পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যালে
সঙ্গে। কিন্তু সে-পথেও লেভেলক্রসিং। দেবাদ্রি কলকাতাতেই নেই। কোন এক পার্সি
ইহুদি তরুণীর খোঁজে গোয়া চলে গেছে। 'আশ্রয়'-এর কেসটা মিসিং স্কোয়াড ব্রাঞ্চ থে
হোমিসাইড ব্রাঞ্চে চলে যাওয়ায় দেবাদ্রি আপাতত নিশ্চিন্ত। কিন্তু গার্গী তো আর নিশ্চি
হতে পারে না। কোনও সমস্যার ভেতর সে একবার ঢুকলে তার সমাধানে পৌঁছতে না পা
পর্যন্ত তার অবসর নেই।

কিন্তু ঘটনাগুলো তাহলে কার সঙ্গে আলোচনা কববে। হোমিসাইড ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্ট
দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে তার এখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মেনি যে তাকে বিরক্ত করতে পা
যখন-তখন। সবচেয়ে মুশকিল হল গার্গীর কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই। সব গোয়েন্দার
একজন করে সহকারী থাকে যার সঙ্গে দু'দণ্ড আলোচনা কবে বুঝে নিতে পারে ঘটনা
গতিপ্রকৃতি এখন কোন পথে।

সেদিন অফিসের প্রথম ঘণ্টাটা ডাকের ফাইলে মনোযোগ দিয়ে একটু ফুরসত খুঁজে নি
জেনে নিল সায়ন আজ ফ্যাক্টরিতে যায়নি, অফিসেই কী একটা মিটিং কর
ভিনরাজ্যের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের একটা নতুন সাবা
বাজারে ছাড়ার আগে বেস-ওয়ার্ক তৈরি করছে সায়ন। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বাজার এখ
তুঙ্গে। যে প্রোডাক্টই তৈরি করছে, তারই চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। সায়ন এখন বুঁদ হ
আছে তাব সৃষ্ট কোম্পানির সাফল্যের চেহারায়। গার্গীব দিকে তাকানোর ফুরসতই নেই। ত
সায়নের নিজস্ব জগতের ভেতর মাঝেমধ্যে ঠেলে ঢুকে পড়ে গার্গী। আজও সেরকমই ঢু
পড়ল সহসা। বলল, আচ্ছা বলো তো, মানুষ খুন করে কেন?

সায়ন তার চেম্বারে বসে কিছু একটা পড়ছিল মন দিয়ে। একটা লম্বা চিঠি। সম্ভবত ই
মেলে এসেছে তার কোম্পানির কোনও সুখবর। তাই মুখটা ভারী প্রশান্ত, ঝলমলে। চোখে
কোণে খুশির হাওয়া। হঠাৎ গার্গীব এমন অতর্কিত ও ঝাঁকুনি-দেওয়া প্রশ্নে টাল খেয়ে গে
তার খুশির জগৎ। বলল, এ তো একেবারে দার্শনিকের মতো প্রশ্ন। কিংবা মনস্তত্ত্ববিদদে
কথা। তুমি কি এখনও 'আশ্রয়'-এর কথাই ভেবে চলেছ?

—না ভেবে তো পারছি না। চোখের সামনে একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে। আর বাই তো চেনা লোকজন। না ভেবে কি পারি?

সায়ন গার্গীর প্রশ্নটা নিয়ে বুঁদ হয়ে ভাবতে বসেছে তখন। বলল, তুলিকা নিশ্চয়ই কারও ভা ভাতে ছাই দিচ্ছিল। তুলিকাকে সরিয়ে না দিয়ে তার উপায় ছিল না।

গার্গী তৎক্ষণাৎ যোগ করে, অথবা এমনও হতে পারে তুলিকা কারও এমন দুর্বল জায়গা াবিষ্কার করে ফেলেছিল যা জানাজানি হলে সেই লোকটির ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেত।

—বা এমন হতে পারে তুলিকা কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল। ব্ল্যাকমেল করতে করতে দওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল কারও।

গার্গী আরও ভাবল ঘটনাটা। বিষয়টির জটিলতা কোন দিকে ঘুরে যাচ্ছে তা নিয়ে তালপাড় করল কিছুক্ষণ। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে বলল, আচ্ছা, কারও প্রেমে বাধা পড়েছে লে তা নিয়েও কি কেউ এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে?

সায়ন হেসে বলল, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ কেন খুন করে, মনের কোন বস্থায় করে তা নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা শয়ে শয়ে কিংবা হাজারে হাজারে বই লিখেছেন। তবে ামার ধারণা, যখন কেউ খুন করে, সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষ আত্মহত্যা রে একরকম মানসিক অসুস্থতায়, খুন করে আর একরকম মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে। রপর একটা খুন চাপা দিতে আরও বহুরকম অপরাধ করতে পিছপা হয় না অপরাধী।

—তাহলে বলছ এর পর আরও একরকম অপরাধ ঘটাতে পারে খুনি।

সায়ন আবার হাসল, হয়তো। আবার নাও ঘটাতে পারে কিছু। যদি খুনি মনে করে লিকাকে সরিয়ে দিয়েই সে আপাতত নিশ্চিন্ত, সেক্ষেত্রে চুপচাপ থাকতে চাইবে এরপর।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে এরপর পুলিশি তদন্ত আরও জোরদার হবে। তাতে নির মোটিভ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তখন তো খুনি আরও মরিয়া হয়ে উঠবে, তাই না?

—শুধু পুলিশি তৎপরতা জোরদার হবে বলছ কেন! বলো, গোয়েন্দাও আরও সন্ধানী য়ে উঠবে ক্রমশ। চিন্তাজালে আটকে থাকবে সারাক্ষণ—তার রহস্য উন্মোচিত না হওয়া র্যন্ত। ঠিক কি না?

গার্গী হাসল। সায়নই যেন গোয়েন্দা সেজে গোয়েন্দা গার্গী চৌধুরির মনের খবর জেনে চলেছে এই মুহূর্তে। সায়নের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কাছে গার্গীর তো বরাবরই পরাজয়। যেন খুব জ্জা পেয়েছে এমনভাবে গার্গী কথার প্রসঙ্গ ঘোরায়, তা চেয়ারম্যান সাহেবের হাতে ওই ঙন কার্ডটা কীসের? কোম্পানির কোনও সুখবর মনে হচ্ছে।

—কোম্পানির ঠিক নয়, তবে কোম্পানির চেয়ারম্যানের পক্ষে নিশ্চয়ই। ব্রিটেনের কটি মাল্টি-ন্যাশনাল কম্পানি আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারা ইউরোপের তিনটে বড় বড় শহরে মিনার করছে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন নামী কোম্পানিগুলোর ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে উরোপের এ-ধরনের কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের একটা ইন্টার‍্যাকশনের মহা আয়োজন। ব্রাশিওরটা পড়ে মনে হল এ-ধরনের মুখোমুখি আলোচনা আমার বিদ্যাবুদ্ধিকে আর একটু াণ দিতে সাহায্য করবে। ভাবছি, আমন্ত্রণটা অ্যাকসেপ্ট করেই নিই।

গার্গী সায় দিয়ে বলল, সেরকম মনে হলে অবশ্যই যাবে।

—বাট হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তুমিও সঙ্গে চলো না?

হাসি-হাসি মুখে গার্গী বলল, ওরা যখন কোম্পানির চেয়ারম্যানকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে, খন চেয়ারম্যানের একাই যাওয়া উচিত। তার লেজুড় হিসেবে স্ত্রীকে নিয়ে গেলে ঠিক ভাল

দেখাবে না। যদি কেউ কখনও ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমন্ত্রণ জানায়, তখনই আমি যাওয়ার কথা ভাবব।

—তাহলে আমি একাই যাব বলছ।

—অফ কোর্স।

সায়নের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ টুকটাক কথা বলে গার্গী চলে এল নিজের চেম্বারে। তার মন থেকে 'আশ্রয়' কিছুতেই বেরুতে চাইছে না। বলা যায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। চারবছরের এই প্রতিষ্ঠানটা। কতদিন হয়ে গেল ওখানকার রহস্য এখনও একগলা কুয়াশায় ঢাকা। পুলিশও কিছু করতে পারছে না। গার্গীও তথৈবচ। সমস্যার ভেতর ডুব দিতে গেলে কেবল জটিলতাই বাড়ছে শুধু। ওদিকে অফিসের কাজে মন বসাতে গিয়েও দেখল, সেখানেও তার মন আর নিজের বশে নেই। 'আশ্রয়' তাকে সমূলে টানছে। কিছুক্ষণ ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে পি. এ পিয়ালি রায়কে বলল, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে মিসিং স্কোয়াড সেলে ধরো তো।

অনেক কষ্টে লাইন পাওয়া গেল মিসিং স্কোয়াড সেলের। কিন্তু দেবাদ্রি সান্যাল এখনও গোয়া থেকে ফেরেননি। সরকারি খরচে একবার গোয়া যাওয়ার সুযোগ পেলে কোন আহাম্মক আর চট করে ফিরতে চায়। দেবাদ্রিকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু পাওয়া গেল মিসিং স্কোয়াড সেলের সাবইনস্পেক্টর অলয় বসুরায়কে।

দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে গার্গীকে এখন অনেক পুলিশ অফিসারই একটু-আধটু চিনে ফেলেছে। অলয় বসুরায়কে পেতেই গার্গী সবাসরি জিজ্ঞাসা করল 'আশ্রয়'-এর মেয়েদের কারও কোনও হদিশ করা গেল, মিঃ বসুরায়?

গার্গী ভেবেছিল নিশ্চয় 'না'ই বলবেন সাব-ইনস্পেক্টরটি, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আমরা প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম একজনকে। কিন্তু ব্যাড লাক। ও ফসকে গেল একটুর জন্যে।

—ফসকে গেল। গার্গী লাফিয়ে উঠতে চাইল, কাকে ধরতে পেরেছিলেন হাতেনাতে?

—মেয়েটির নাম বলেছিল চৈতালি।

—চৈতালি! তাই নাকি! কোথায় দেখতে পেলেন তাকে? কী ভাবে? ফসকেই বা গেল কেন। কী ভাবে গেল? উত্তেজনায় একসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন করে তালগোল পাকিয়ে দিল সাব-ইন্সপেক্টরকে।

—দাঁড়ান তাহলে, আপনাকে বলি ঘটনাটা। আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন সাদা পোশাকের পুলিশ পোদ্দারবাবু কী একটা কাজে বহুবাজারের একটা রেস্তরাঁয় গিয়েছিলেন সেখানে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক তরুণের সঙ্গে একটি কিশোরীকে খেতে দেখে কীরকম সন্দেহ হয় তাঁর। ছেলেটাকেও ভারী চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। ডি. সি. সাহেবের সঙ্গে পোদ্দারবাবুও 'আশ্রয়ে' গিয়েছিলেন কিনা। হয়তো 'আশ্রয়'-এই দেখেছে। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বিল মেটাতে কাউন্টারে যেতেই টেবিলে বসে থাকা কিশোরীটিকে সাদা পোশাকের পুলিশটি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি, কী নাম বলো তো তোমার? মেয়েটি হঠাৎ আচমকা প্রশ্নে কীরকম ভয় পেয়ে যায়। আড়ষ্ট হয়ে বলেছিল, চৈতালি।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু তরুণটি তাহলে কে?

—বেশ সুন্দর দেখতে। ফর্সা রং! মুখে দু-একদিনের না কাটা দাড়ি। চোখে একটা হালকা নীলকাচের চশমা। চশমাটা অবশ্য নতুন।

গার্গীর কেমন যেন খটকা লাগল, তার নাম কি সমুদ্রনীল?

—ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। নামটা কিছুতেই আমার মনে আসছিল না।

—তারপর! মেয়েটিকে ধরলেন না কেন আপনাদের পোদ্দারবাবু?

—ধরবেন বলেই তো রেস্তোরাঁর বাইরে গিয়েছিলেন একটা পি. সি. ও. বুথ থেকে ডকোয়ার্টারে ফোন করতে। ফিরে এসে দেখেছেন তার মধ্যেই চিড়িয়া ফুড়ুৎ।

গার্গী ক্ষুব্ধ হল খুব। পুলিশ এ সব ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে এত কাঁচা কাজ করে যে তাদের ণর ভরসা রাখাই যায় না যেন। একটা মিসিং কিশোরীকে হাতের সামনে পেয়েও দিব্যি লিয়ে যেতে দিল স্রেফ নির্বুদ্ধিতায়।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ আবার ভাবনার গভীরে ডুব দিল গার্গী। মান্য ঘটনা, কিন্তু অসামান্য ক্লু ধরিয়ে দিলেন পুলিশ অফিসারটি। সমুদ্রনীলকে কেউ ব্যের মধ্যেই আনেনি। আনার কথাও নয়, কারণ তার মোটিভ পরিষ্কার নয়। মোটিভ কার কথাও নয়। কিন্তু চৈতালি নামের মেয়েটিকে হঠাৎ সমুদ্রনীলের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বিষ্কার করে চকিতে আর একটা ক্লু এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেলে গার্গীর কাছে।

বলা যায় অনিবার্য ক্লু। তুলিকার মৃতদেহ দেখতে যেদিন সকালে সে 'আশ্রয়'-এ য়েছিল, তুলিকাদের ঘরের এ-কোণ ও-কোণ নজর ফেলে টুঁড়তে টুঁড়তে যে সামান্য একটা ; কুড়িয়ে পেয়েছিল সেটি একটি লোহার নখ টাইপের কিছু। এখন জিনিসটা বার করে ল এটা সমুদ্রনীলেরই। গিটার বাজাবার সময় আঙুলে পরে নিতে হয় স্ট্রোক দিতে। এটার ন পিক। কিন্তু তুলিকার ঘরে কেন এটা পড়ে থাকবে মেঝেয়! বাব দুই মেধার ঝাঁপি কিয়ে গার্গী অনুমান করল, যে রাতে তুলিকা খুন হয়েছিল, সেই সন্ধেয়, অথবা বেশি রাতে দ্রনীলের আবির্ভাব ঘটেছিল তুলিকার ঘরে। হয়তো গিটার বাজাতে বাজাতেই উঠে সেছিল। কিংবা ইচ্ছে করেই আঙুলে পরে নিয়েছিল ওটা। তার পর তুলিকার সঙ্গে কী থাবার্তা হয়েছিল, কতখানি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল উত্তেজনার পারদ তা কোথাও লেখাজোকা কবে না। কিন্তু কী ঘটেছিল তা শুধু অনুমান করে নিতে হবে গার্গীকে।

সমুদ্রনীলের সঙ্গে একই রেস্তোরাঁয় চৈতালির উপস্থিতি ও তুলিকা খুন হওয়ার রাতে র ঘরে সমুদ্রনীলের আবির্ভাব—এই দু'টো তথ্য পাশাপাশি রেখে দুয়ে দুয়ে চার করা যায় না তা এখন গার্গীর গবেষণার বিষয়। কিন্তু গবেষণাটা আরও অনেক পথ চালিয়ে নিয়ে তে হলে দরকার সমুদ্রনীলকে জিজ্ঞাসাবাদ। তুলিকা খুন হওয়ার পরই সমুদ্রনীলের হঠাৎ করিতে ইস্তফা দেওয়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অতএব সন্দেহভাজনদের তালিকায় পাতত সমুদ্রনীলের অন্তর্ভুক্তি ঘটাল গার্গী। তার নাম শুধু সংযোজনই করল না, তাকে মোশন দিয়ে সবার ওপরে রাখতে বাধ্য হল এই মুহূর্তে। তার তো ক'দিন ধরে মনে চ্ছিলই হয়তো এমন কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, যাকে তারা আমলই দেয়নি এতদিন। লাস সান্যালও ক'দিন আগেই দেবাদ্রি সান্যালকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, একজন ত্ত্বাবধায়কই আড়ালে থেকে এতসব কাণ্ড করাচ্ছেন। সেই তত্ত্বাবধায়ক কি তাহলে মুদ্রনীলই।

কিন্তু সমুদ্রনীলকে এখন কোথায় পাবে!

'আশ্রয়' থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখন কি তার নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে, না কি লিয়ে আছে কোনও গোপন ডেরায়! সে যদি এতগুলো মেয়েকে সরিয়েই থাকে, তাদের থায় রেখেছে।

ভাবতে ভাবতে গার্গী তার ব্যাগ থেকে বার করল সমুদ্রনীলের ডায়েরিটা। পৃষ্ঠা উল্টে পড়তে শুরু করল তার বিভিন্ন সময়ের স্বগতোক্তি। প্রত্যেকটি লেখা বিশ্লেষণও করতে শুরু করল সমুদ্রনীলের মোটিভ আবিষ্কার করতে।

কিন্তু না, সমুদ্রনীলের লেখা থেকে যতটা না মোটিভ ধরা পড়ল, তার চেয়েও বড় ক্লু সহসা খুঁজে পেয়ে উত্তেজনায় ঘেমে গেল গার্গী। নোটবইটার পেছনের কভারটা অস্বাভাবিক উঁচু দেখে কী যেন সন্দেহ হল তার। কভারটা খুলে ফেলতেই ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো বেরিয়ে এল একটা চিঠি। চিঠিটার নীচে স্বাক্ষর ত্রিস্তা নামের একটি মেয়ের। চিঠিটা পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে গেল গার্গীর। এ কী পরিণতি হয়েছে ত্রিস্তার! আর চিঠির মর্মটা তো আরও সাংঘাতিক। বিষয়টা অনুধাবন করে আর কোনও সন্দেহের অবকাশই থাকার কথা নয় যে সমুদ্রনীলই এত সব কাণ্ডের হোতা! তার এক্ষুনি দরকার সমুদ্রনীলকে।

## ॥ ২২ ॥

ত্রিস্তার দীর্ঘ চিঠিটা হাতে নিয়ে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল গার্গী। হঠাৎই সমুদ্রনীলের সবুজ নোটবই থেকে মেয়েলি ছাঁদের হস্তলিপি উদ্ধার করবে, তার থেকে আবিষ্কৃত হবে এরকম একটা অনিবার্য ক্লু তা তার অনুমানের বাইরে ছিল। পত্রটিতে বার তিনেক চোখ বুলিয়ে সেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ করেও গার্গীর বিশ্বাস হচ্ছিল না সমুদ্রনীলের মতো শান্ত, সুন্দর একটি যুবক এত সব গভীর ঘটনার পেছনে থাকতে পারে। সমুদ্রনীলের চেহারাটাই প্রেমিক-প্রেমিক। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ফর্সা রং, নিখুঁতভাবে শেভ করা গালে একটা হালকা সবুজ আভা, নাতিদীর্ঘ দোহারা শরীর, চোখে কখনও নীলাভ কাচের চশমা। দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে হয় তাকে। তার ওপর গিটারে আশ্চর্য সব সুর তোলে। সে সুর যেন হৃদয় নিংড়ে তুলে আনে ভেতরের কান্না।

তার গিটারের টুংটাং সুর শুনলেই বোঝা যায় ত্রিস্তা তার জীবন থেকে চলে যাওয়ায় কতখানি কান্না অন্তরীণ ছিল ভেতরে। কান্নার রাশি জমে জমেই কি শেষ পর্যন্ত এতখানি হিংস্র, বেপরোয়া করে তুলেছিল সমুদ্রনীলকে! তাইই একের পর এক কিশোরীকন্যা অপহরণ, তার জের মেটাতে তুলিকাকে খুন! এত হিংস্রতা কি সত্যিই সম্ভব সমুদ্রনীলের মতো একজন রোমান্টিক তরুণের পক্ষে।

ত্রিস্তার লম্বা চিঠিটায় আরও একবার চোখ রাখল গার্গী। সেই ত্রিস্তা, যার সম্পর্কে সমুদ্রনীল কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত, ও হল নায়াগ্রা জলপ্রপাত, সারাক্ষণ শরীরে শব্দ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনও অনিবার্য লক্ষ্য অভিমুখে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সামনে যে কেউই থাকুক তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার দুর্বার গতিতে।

সেই ত্রিস্তা কলকাতা থেকে কানপুরে একটা ভাল চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার সময় অনুমানও করেনি কোথায়, কোন পাতালে ঝাঁপ দিয়ে জীবনটাকে শেষ করতে চলেছে। সেই কাহিনীই তো ত্রিস্তার চিঠিটার ছত্রে ছত্রে। গার্গী আরও একবার চোখ রাখে সেই গা শিউরানো পংক্তিগুলিতে ঃ

প্রিয় নীল,

হয়তো এই দীর্ঘ অদর্শনে আমার মুখটাই ভুলে গিয়েছ এতদিনে। নামটাও হয়তো বিস্মৃত হওয়ার পথে। সেটাই তো স্বাভাবিক। যে-মেয়েটা নতুন চাকরি নিয়ে অচেনা পথে পাড়ি দেওয়ার সময় বলে গিয়েছিল 'পৌঁছেই চিঠি দেব, তারপর তোমারও আর একটা চাকরি জোগাড় করে এখানে নিয়ে আসব তোমাকে। ঘর বাঁধব দুজনে।' সেই মেয়ে টানা দুদুটি বছর নিঃশব্দ! সেই হতচ্ছাড়িকে কে-ই বা মনে রাখবে কষ্ট করে! নিশ্চয়ই ভেবেছ মেয়েটা বিশ্বাসঘাতিনী, হয়তো অন্য কারও সঙ্গে লটকে গিয়েছে এতদিনে। নইলে একটা চিঠি পর্যন্ত কেন দেয় না! তাই না?

নীল, এতদিন পরে এই যে চিঠিটা হোটেলের ঘরে বসে লিখতে পারছি, তাও এক অদ্ভুত, অকল্পনীয় পরিস্থিতিতে। হোটেলের কথা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ? ভাবছ এতদিনে কানপুরের কোনও পশএলাকায় থাকার কথা যে-উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ের, সে কেন হোটেলের ঘরে থাকবে, কেনই বা তার চিঠির ওপর দিকের ডান কোণে লেখা থাকবে নরিম্যান পয়েন্ট!

হ্যাঁ, নরিম্যান পয়েন্ট অধুনা মুম্বইয়ের একটা অভিজাত এলাকা। যে-এলাকাটিকে আরব সাগরের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে বানানো হয়েছে মুম্বইয়ের সবচেয়ে উঁচু-উঁচু বাড়ির এক আশ্চর্য জঙ্গল। তারই একটি আকাশছোঁয়া বাড়ির তেরো তলায় তেরোশ তেরো নম্বর ঘরে আমার বসবাস। শুনে অবাক হচ্ছ, তাই না? কিন্তু আরও বিস্মিত হবে এই জেনে যে, কলকাতা থেকে যে-মেয়েটা বেরিয়েছিল একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের লোভনীয় মাইনেঅলা পি-এর চাকরি নিয়ে, তার এখানে পরিচয় একটি বিখ্যাত বারের ড্যান্সার হিসেবে। হ্যাঁ, আপাতত এটাই আমার নতুন চাকরি। কিন্তু কী করে কলকাতার ছটফটে মেয়ে ত্রিস্তা মুম্বইয়ের বার-ড্যান্সারে রূপান্তরিত হল সেই ইতিহাসটা শুনতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই।

চিঠিটা লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হল। নীল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া ভাল, অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া ভাল নয়। কানপুরে যে-মার্কেন্টাইল অফিসে পি. এ হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলাম সেটি আমার জীবনযাপনের পক্ষে মোটামুটি চলনসই। ওখানে তোমার একটা ছোটখাটো চাকরিও হলে আমাদের সংসার দিব্যি চলে যেত। কিন্তু বোধহয় আমার ভবিতব্যে লেখা ছিল অন্যরকম। কানপুরের অফিসে চাকরি করতে করতে ওখানকার একজন নামীদামি ক্লায়েন্টের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল হঠাৎ। লোকটির নাম রঙ্গনাথ গুপ্তা। খুবই হ্যান্ডসাম চেহারা, বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, তুখোড় কথা বলতে পারেন, অসম্ভব ব্যক্তিত্ব। আমার সঙ্গে আলাপিত হওয়ার প্রথম সুযোগেই প্রস্তাব দিলেন তাঁদের মুম্বইয়ের ব্রাঞ্চে অপেক্ষাকৃত বড় চাকরিতে জয়েন করতে পারি কিনা। আরও বলেছিলেন এরকম একজন অসম্ভব স্মার্ট মেয়ের পক্ষে সাধারণ পি.এ-র চাকরি করা মানে যোগ্যতার অপচয়। মুম্বইয়ে চাকরির প্রসপেক্ট অনেক বেশি।

নীল, আমি টোপটা গিলে ফেলেছিলাম। তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি কোনও একজন বিখ্যাত ঠগের পাল্লায় পড়েছি। আসলে রঙ্গনাথ গুপ্তার অ্যাসেট হল তার চেহারা, কথনভঙ্গি, কাউকে সম্মোহিত করে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁর কাছ থেকে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পুরনো কোম্পানিতে রেজিগনেশন-লেটার দিয়ে পাড়ি দিলাম মুম্বইতে। তখন অবশ্য মনে হয়েছিল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমার এই নতুন অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু করিনি কারণ আমি বরাবরই নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করি। হঠাৎ চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে কানপুরে যাওয়াটাও যেমন নিজের সিদ্ধান্ত ছিল, তেমনই

মুম্বইয়ে যাওয়াটাও। ভেবেছিলাম মুম্বই পৌঁছে নতুন চাকরিতে জয়েন করে তোমাকে একটা বড় সারপ্রাইজ দেব।

নীল, এতকাল পর তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে অনেক দাম দিতে হল। নতুন চাকরি নিয়ে মুম্বই পাড়ি দিলাম, তারপর তোমার ত্রিস্তা আর ত্রিস্তা রইল না। তার জীবনযৌবন সব বাঁধা পড়ে গেল এক বিখ্যাত ঠগবাজ রঙ্গনাথ গুপ্তার হাতে। নিয়ে গিয়ে তুলল তাদের গোপন ডেরায়। বলল, যে-চাকরি আমার জন্যে তারা ঠিক করে রেখেছে সেটা একটা বারের ড্যান্সারের পোস্ট। নীল, বলতে ভুলে গেছি, এর আগে রঙ্গনাথ গুপ্তা যখন আমাকে নানা প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করে আমার একটা ইন্টারভিউ-গোছের নিচ্ছিলেন, সেসময় কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি নাচগান জানি কিনা। সেটা নাকি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটি হিসেবে গণ্য হবে মুম্বইয়ের চাকরিতে। ব্যাপারটা তখন বুঝিনি, খোলসা হল মুম্বইতে এসে।

তারপর থেকে আমার এক আশ্চর্য বন্দিজীবন শুরু হল মুম্বইতে। আমাকে রাখা হল মুম্বইয়ের এক বিখ্যাত হোটেলে। হোটেলটার নাম লেখা বারণ, কেন তা ক্রমশ প্রকাশ্য। সেখানে জীবনযাপনের যাবতীয় সুখ, ঐশ্বর্য ও বৈভব ছড়ানো। কিন্তু অনেক দুর্ভাগ্যের একটি হল হোটেল থেকে বেরুবার অনুমতি নেই। নেই কোথাও ফোন করে কথা বলার সুযোগ কিংবা কাউকে চিঠি লেখার। আমরা কাজ সারাদিন হোটেলের ঘরে বৈভবের মধ্যে বাস করে সময় কাটানো। সন্ধের পর সেজেগুজে তৈরি থাকতে হয়। বার-এর কোনও কর্মচারী এসে আমাকে নিয়ে যায় একটা দামি বারে। সেখানে এক দঙ্গল মদ্যপ মানুষের লোভী চোখের সামনে নাচতে হয় গভীর রাত পর্যন্ত।

নীল, সে জীবন যে কতখানি অসহনীয়, কী ভীষণ গা-ঘিনঘিনে তা তুমি অনুমানও করতে পারবে না। রঙ্গনাথ গুপ্তাকে তারপর ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখতে পেয়েছি। তাঁকে কতবার বলেছি আমাকে মুক্তি দিতে। বারের প্রতিটি মানুষকেই হাতে-পায়ে ধরে বলেছি এই কলঙ্কের জীবন থেকে মুক্তি দাও। বিশ্বাস করো, নীল, কেউই এতদিন কর্ণপাত করেনি আমার কথায়। দীর্ঘ দুবছর পরে এই সেদিন রঙ্গনাথ গুপ্তা এসে দেখা দিলেন সহসা। বললেন, মাত্র একটা শর্তেই মুক্তি দিতে পারি তোমাকে।

নীল, আমি তখনও ভাবতে পারিনি কী সেই শর্ত যার বিনিময়ে আমার আগের জীবন ফিরে পেতে পারি। বলেছিলাম যে-কোনও শর্তেই রাজি। পরে ওরা যে-শর্ত জানাল, তা ভয়ঙ্কর। কেন বলল তা খুলে বলি। আমি অনেকবার তোমার কথা বলেছি ওদের, বলেছি, 'আমি সেই আশ্চর্য যুবকটিকে ভালবাসি। সে 'আশ্রয়' নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সামান্য মাইনের কাজ করে। কিন্তু তার মনটা বড়, ভীষণ বড়। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমি ফিরে গেলেই সে ঘর বাঁধবে আমার সঙ্গে।' রঙ্গনাথ গুপ্তা তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 'আশ্রয়' সম্পর্কে আরও নানান খবর জেনে নিলেন। তারপর একদিন আমার সামনে মেলে ধরলেন মুক্তির শর্ত।

নীল, সে শর্ত বড় ভীষণ শর্ত। শোনামাত্র চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'না, তা হয় না। আমার মুক্তির বিনিময়ে এত বড় অন্যায় কাজ আমি ঘটতে দিতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করুন।' কিন্তু রঙ্গনাথ গুপ্তা সাংঘাতিক ধরনের মানুষ। 'আশ্রয়' সম্পর্কে সব কিছু জানার পর আরও যেন হিংস্র হয়ে উঠলেন। বললেন, তাহলে শোন, এতদিন তোমার ওপর কোনও শারীরিক অত্যাচার করা হয়নি। এর পর তাও করা হবে। মাত্র তিন দিন সময় দেওয়া হল

আমাকে। বলা হল, এর মধ্যে মনঃস্থির করতে। না হলে আমাকে মুখোমুখি হতে হবে চরম অত্যাচারের।

নীল, আজ সমস্ত ঘটনাটা তোমাকে জানাতেই হল রঙ্গনাথ গুপ্তার নির্দেশে। তাদের শর্ত হল, যে-কোনও ভাবেই হোক 'আশ্রয়' থেকে পাঁচটি কিশোরী তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। একমাত্র তাহলেই ওরা আমাকে মুক্তি দেবে।

প্রস্তাবটা তোমাকে জানাতেও ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে নিজেকে। তুমি শুনলে নিশ্চয়ই ভাববে 'ত্রিস্তা এ রকম! এই ত্রিস্তাকে আমি ভালবেসেছিলাম!' তবু লিখতেই হল নিজের কথা ভেবে। তুমি তো জানই, সম্পূর্ণ অন্যভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলাম নিজের জীবন। আর পাঁচটা মেয়ের থেকে একেবারেই আলাদা। তার জন্যে কলকাতা থেকে কানপুর, কানপুর থেকে মুম্বই ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা করিনি। কিন্তু আমার জীবনের রূপরেখা যে এমন ভয়াবহভাবে লেখা আছে তা অনুমানেই ছিল না। যাই হোক, এখন কী করবে না করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার বিবেচনা। যদি সত্যিই আমাকে কোনওদিন ভালবেসে থাক, তা হলে ভেবে দেখো কাজটা করতে পার কি না। একটা সেলুলার ফোনের নম্বর তোমাকে দিলাম। যদি সম্ভব হয়, ফোন করে জানিও। যিনি ফোন ধরবেন তাকে বলে দিও কোথায় কীভাবে কাজটা সম্ভব হতে পারে।

নীল, চিঠিটা লিখতে গিয়ে হাত কাঁপছিল। চিঠিটা লিখব কি কি লিখব না ভেবে দুদিন ক্রমাগত ভেবেছি, ভেবেছি আর কেঁদেছি। তারপর ভাবলাম তোমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হওয়ার এই একটাই তো চান্স। ইতি, ত্রিস্তা।

চিঠিটা বার বার পড়ে, তার মর্মার্থ অনুধাবন করে গার্গী তখনও বুঝতে চাইছিল, ত্রিস্তার প্রস্তাব অনুযায়ী সমুদ্রনীল এত সব অঘটন সত্যিই ঘটিয়েছে কি না, ঘটালে কীভাবে! প্রথমেই গার্গী লক্ষ করল চিঠিটার তারিখ। মার্চ মাসের ঊনত্রিশ তারিখে চিঠিটা লিখেছিল ত্রিস্তা। তারপর তার দেওয়া সেলুলার ফোনের নম্বরে হয়তো সাড়া দিয়েছিল সমুদ্রনীল। ওদিকে যিনি ফোন ধরেছিলেন তার সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল সমুদ্রনীলের তা অনুমান করতে না পারলেও গার্গী হিসেব কষে দেখল, যেদিন চৈতালি নিবেদিতার সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় সেদিনটা ছিল বাইশে এপ্রিল। অর্থাৎ ত্রিস্তা চিঠি লেখার কিছু দিনের মধ্যে সমুদ্রনীলের অপারেশন শুরু।

তার পরের ইতিহাস তো পাই-টু-পাই দেখতে পেয়েছে গার্গী। তবু গার্গীর বিস্ময় তখনও টাল খাচ্ছে। এত বড় একটা কম্পাউণ্ড থেকে এতগুলো কিশোরী অপহরণ করা একা সমুদ্রনীলের পক্ষে সম্ভব কি না সেটাও ভেবে দেখার। সমুদ্রনীলের সঙ্গে গার্গীর মাত্র কিছুদিনের পরিচয়। সে সময় তার ব্যবহার, তার গিটার বাজানো, তার কথাবার্তা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল খুবই। চার বছর পরেও সমুদ্রনীল সমান জনপ্রিয়। কিন্তু মানুষ তো ঘটনার দাস। কোন ঘটনা কীভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে নিয়ে যাবে কোন ভবিতব্যে তা আগাম বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। ত্রিস্তাই কি জানত, তার জীবন প্রবাহিত হবে এভাবে! সমুদ্রনীলও তো জানত না তাকে এভাবে একটা বিশ্রী ঘটনার ভেতর ওতঃপ্রোত হতে হবে একদিন।

এখন রহস্যের উৎস অভিমুখে পৌঁছতে হলে প্রথমেই খুঁজতে হবে ঘটনার নায়ক সমুদ্রনীলকে।

কিন্তু কাজটা এই মুহূর্তে ভারী কঠিন। সমুদ্রনীল যদি সত্যিই অপরাধী হয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই তার পুরনো ঠিকানায় আর বাস করবে না। হয়তো সে কলকাতাতেই আর নেই। হয়তো এত দিনে ত্রিস্তাকে মুক্ত করে অন্য কোথাও ঘর বেঁধেছে। হয়তো—

ঘটনাপ্রবাহ যেখানেই গিয়ে পৌঁছক, প্রথমে তার বাড়ির খোঁজ নিতে হবে গার্গীকে। এবং তা এখনই। তার ঠিকানা জানা যেতে পারে 'আশ্রয়' থেকে। ঠিকানা জোগাড় হলে—

তৎক্ষণাৎ 'আশ্রয়'-এ ফোন করে নিবেদিতাকে চাইল, হ্যালো, নিবেদিতার সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে?

নিবেদিতাকে অবশ্য তখনই পাওয়া গেল না। ফোন ধরলেন ডেপুটি ডিরেক্টর চম্পক চট্টরাজ।

—আঙ্কেল, সমুদ্রনীলের বাড়ির ঠিকানাটা একবার দেবেন? কোনও ভণিতা না করেই গার্গী নেমে পড়ল কাজে।

চম্পক চট্টরাজ অবশ্য সাতে নেই পাঁচে নেই এমন ভাল মানুষ। কম কথার লোক বলে তক্ষুনি রেজিস্টার ঘেঁটেঘুঁটে বললেন, সমুদ্রনীলের দুটো ঠিকানা লেখা আছে, গার্গী।

—দুটো?

—হ্যাঁ। একটা ঠিকানা তার আদত বাড়ির। আরামবাগ থেকে আরও সতেরো কিলোমিটার যেতে হয় বাসে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দ্বিতীয় ঠিকানাটা কলকাতার একটা মেসের। শিয়ালদহের কাছেই মেসটা।

দুটো ঠিকানাই তার নোটবইতে হুড় হুড় করে টুকে নিল গার্গী। নিয়ে অবশ্য ফাঁপরেই পড়ল। শিয়ালদহের মেসবাড়িটা খুঁজে বার করা তেমন দুরূহ কিছু নয়, কিন্তু আরামবাগে তার বাড়ির অবস্থান খুঁজে বার করা বেশ কঠিন। অন্তত গার্গীর পক্ষে।

তৎক্ষণাৎ সে ঠিক করে নিল এখন কী তার করা উচিত, কীভাবেই বা এগুবে তার তদন্তে। শিয়ালদহের মেসবাড়িতে আজ বিকেলেই একবার হানা দেবে। একেবারে আচমকাই। কিন্তু আরামবাগের ঠিকানায় সমুদ্রনীলকে খুঁজতে হলে আপাতত পুলিশি সাহায্য নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি তেমন সন্দেহজনক কিছু সূত্র দিতে পারে পুলিশ, তখনই না হয় আরামবাগ পর্যন্ত ধাওয়া করবে। নাকি—, গার্গী দ্বিতীয় চিন্তায় মন দেয়, আগে অন্য কোনও সূত্র থেকে খবরটা নেওয়ার চেষ্টা করবে?

ভাবনাগুলো মগজের নরম জায়গায় কিছুক্ষণ চালাচালি করে টেলিকমে সায়নকে ধরল, হ্যালো, তোমার কোনও ডিস্ট্রিবিউটর আছে আরামবাগের দিকে?

সায়নের মাথাটা অবশ্য কমপিউটারের মতো। দ্রুত তার ঘিলুটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আছে একজন। ভোলানাথ পাল। আরামবাগ জেলাপরিষদ বাংলোর পেছন দিকে বাড়ি।

—ঠিক আছে। ভদ্রলোককে ফোনে যোগাযোগ করে জানো তো ওখানে আরাণ্ডি নামে কোনও গ্রাম আছে কি না। থাকলে আরামবাগ থেকে কীভাবে যাওয়া সম্ভব?

—নো প্রব্লেম। কাল সন্ধের মধ্যেই সব খুঁটিনাটি তথ্য জেনে যাবে।

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

—আগে থেকেই ধন্যবাদ দিও না। আগে তথ্যগুলো হাতে পাই। হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে আছে তো, ম্যাডাম? আগামী সপ্তাহেই আমি কিন্তু বেরুচ্ছি।

গার্গী কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়েছিল সায়নের ভ্রমণপঞ্জীর বিবরণ, অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

—বাহ্, ভুলে মেরেছ এর মধ্যে? ইউরোপ ভ্রমণের টোপটা গিলেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত। অনেক দিন ধরেই যাব যাব ভাবছিলাম। এখন যেহেতু সুযোগ পাওয়া গেল, অ্যাকসেপ্ট করেই নিলাম আমন্ত্রণটা। বাইরে মাঝেমধ্যে একটু এক্সপোজারও তো চাই।

—অবশ্যই, গার্গী হেসে উঠে বলল, এত কাল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের নামডাক শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার আশা করি ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতিও কুড়োবে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবের চেষ্টায়।

সায়নও হেসে ওঠে, ব্যঙ্গ করছ না কি!

—মোটেই না। তোমার যা ক্যালিবার, তাতে এরকম একটা কোম্পানির নাম কেবল তৃতীয় বিশ্বে সীমাবদ্ধ থাকবে তা আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। নামটা আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছনো দরকার। ওখানকার সেমিনারে তুমি যে দেদার সুনাম কুড়োবে তা আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি।

—থ্যাঙ্কু, ম্যাডাম। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

—ঠিক আছে, তুমি যতক্ষণে ইউরোপ ভ্রমণ করবে, আমি সে সময় 'আশ্রয়'-এর রহস্য নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকব কিন্তু। আগাম পারমিশান নিয়ে রাখলাম।

বলেই কী যেন ভেবে হেসে উঠল গার্গী, অবশ্যই তোমার 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর সাম্রাজ্য সামলে।

সায়ন হো হো করে হেসে বলল, থ্যাঙ্কু, ম্যাডাম। আমি জানি প্যারাডাইসের এম.ডি. একই সঙ্গে বাঁধতেও পারেন, আবার কবরী বন্ধনও করতে পারেন।

সায়নের সঙ্গে কথা চালাচালি করে গার্গীর মনটা ভাল হয়ে গেল হঠাৎ। সায়ন তার ওপর স্বামী হিসেবে কোনও কর্তৃত্ব ফলায় না, বরং তাদের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। অনেক ব্যাপারেই সায়নের ওপর নির্ভর করতে পারে গার্গী। কিন্তু সায়ন তার নিজের জগতে এত বেশি মগ্ন থাকে যে, গার্গীকে নিয়ে আলাদা করে ভাববে সে সময় যেন তার নেই। গার্গীকেই মাঝেমধ্যে জোরজার করে ঢুকে পড়তে হয় সায়নের আত্মমগ্নতার খোলস ছিঁড়ে।

বিসিভার রেখে গার্গী ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সমুদ্রনীলের সন্ধানে। সেদিন বিকেলেই রতনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিয়ালদহ অভিমুখে—। যে আস্তানায় কোনও একসময় বাস করত সমুদ্রনীল। শিয়ালদহ এলাকার এই মেসসমৃদ্ধ এলাকাটা গার্গীর একেবারেই অচেনা। কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলার মানুষজন কলকাতায় চাকরি করতে এলে তাদের সামনে যে কটি সংকট তীব্রভাবে দেখা দেয় তার একটি বাসস্থান সমস্যা। এই এলাকার পুরনো, ভাঙাচোরা বাড়িগুলির খুপরি ঘরগুলো বাইরের জেলার কত-কত মানুষের স্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হয় তার হিসেব বোধহয় কখনও নথিভুক্ত হয় না। এখানকার জীবনযাপন এখনও বোধহয় সেই শরৎচন্দ্রীয় আমলেই থেমে আছে। সে রকমই একটি পুরনো দোতলা বাড়ির ঝরঝরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে সমুদ্রনীলের খোঁজ করল গার্গী।

সমুদ্রনীলের নাম শুনে অন্য বোর্ডাররা কিছুক্ষণ তাকাতাকি করল নিজেদের মধ্যে। হয়তো কিছু বার্তা বিনিময় হল নিঃশব্দে। তারপর একজন অনতিচল্লিশ টাকসমৃদ্ধ যুবক এগিয়ে এসে প্রথমে জেরা করল গার্গীর পরিচয় ইত্যাদি। গার্গী কিছুটা অস্বস্তিতে, তবু সামলে নিয়ে বলল, দেখুন, একসময় ওর কলিগ ছিলাম। ওকে ভীষণ জরুরি একটা দরকারে খুঁজছি। 'আশ্রয়'-এ গিয়ে শুনলাম কদিন আগেই ওখানকার চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। তাই ভাবলাম যদি ওর পুরনো ঠিকানায় পাওয়া যায়—

টাকসমৃদ্ধ যুবক বেশ কর্কশ গলায় বলল, দেখুন, ওর সঙ্গে আপনার কী দরকার জানি না। জানার দরকারও নেই। তবে কদিন আগে এসেছিল একটা অবিবাহিত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। পুরনো বোর্ডার বলে মেসের ম্যানেজার দু-একদিনের জন্য একটা ঘরও দেবে বলেছিল। কিন্তু অন্য বোর্ডাররা অবজেকশন দেওয়ায় ওকে চলে যেতে হয়েছে।

সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল শুনে গার্গীর কৌতূহল তখন চরমে। তৎক্ষণাৎ মুখে একটা গার্জিয়ান-সুলভ গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, সঙ্গের মেয়েটি কে ছিল তার নাম জানেন?

—নাম! যুবকটি একবার ঘাড় নেড়ে 'না' জানিয়েও পরক্ষণে বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখি রেজিস্টারটা। বোধহয় নামটা লেখা আছে ওতে। ওদের থাকতে দেবে বলে ম্যানেজার লিখে ফেলেছিল প্রথমে, তারপর—

বলতে বলতে রেজিস্টার খুলে চেঁচিয়ে বলল, বীথি।

—বীথি! গার্গীর পায়ের নীচে কিছুক্ষণ টলমল মাটি। কদিন আগেই সাদা পোশাকের পুলিশ সমুদ্রনীলকে এক রেস্তরাঁয় আবিষ্কার করেছিল 'আশ্রয়'-এর একটি অপহৃত মেয়ের সঙ্গে, আবার মেসে এসেছিল আর একটি মেয়েকে নিয়ে। খুবই আশ্চর্য ও অভাবনীয় আবিষ্কার।

মেস থেকে যা জানার জেনে ফেলে গার্গীর পরবর্তী ও শেষ প্রশ্ন, আপনারা কি অনুমান করতে পারেন, ওরা এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে পারে?

মেসবাসীরা ততক্ষণে অনুমান করেছে, সমুদ্রনীলের বা বীথির বাড়ির কোনও আত্মীয়-টাত্মীয়া হবে গার্গী। বলল, খুঁজে দেখুন অন্য কোথাও। এতক্ষণে হয়তো কালীঘাটে গিয়ে মেয়েটাকে সিঁদুর পরিয়ে দুজনে ঘরকন্না করছে চুটিয়ে।

গার্গী আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল মেসবাড়ি থেকে। মনে হচ্ছে কিছুটা এগোনো গেল তদন্তে। সেদিন রাতেই কিন্তু আরও একটা ফোন গার্গীকে খুবই বিচলিত করল। ফোনটা করল নিবেদিতা, কীরকম অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলল, জানিস গার্গী, আমি আজ মৌলালির কাছে একটা বাসস্টপে অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ দেখি সমুদ্রনীল।

গার্গী চমকে উঠে বলল, কোথায়?

—অন্য একটা বাস সামনে এসে থামতেই দেখি জানলার ধারে সমুদ্রনীল। আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—সে কী, কেন?

—বাহ্, তার পাশেই তো বসে আছে রাই।

## ॥ ২৩ ॥

রাইকে সমুদ্রনীলের সঙ্গে বাসের সিটে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা গেছে শুনে গার্গী অথৈ বিস্ময়ে। অপহৃত হওয়ার পর দুবার 'আশ্রয়'-এ ফোন করেছিল রাই। খোঁজ করেছিল সমুদ্রনীলের। সমুদ্রনীল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে শুনে সে নাকি কেঁদেছিল। দু'বারই রাই জানিয়েছিল তাকে কিডন্যাপিং করে রাখা হয়েছে একটা গোপন ডেরায়। অপহরণকারীদের কথাবার্তা শুনে তার মনে হয়েছিল বাংলার বাইরে কোথাও রাখা হয়েছে তাকে।

সম্ভবত তখনও পর্যন্ত রাই অনুমান করতে পারেনি অপহরণকারীদের সঙ্গে সমুদ্রনীলের যোগাযোগ আছে। হয়তো সমুদ্রনীলকে খুবই ভালবেসেছিল সে। তাই ভাবতেও পারেনি

তাদের প্রতিষ্ঠানের নীলদা তাকে অপরহণ করে তুলে দিতে পারে মুম্বইয়ের এক ভয়ঙ্কর চক্রের হাতে। সমুদ্রনীলকে এতই বিশ্বাস করেছিল যে, অপহৃত হওয়ার পরও যখন সমুদ্রনীলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, স্বস্তির শ্বাস ফেলে নিশ্চিন্তে সঙ্গিনী হয়েছে তার। সে এখনও জানে না তাকে কয়েকদিনের মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হবে এক সাংঘাতিক আবর্তের গভীরে।

শুধু রাইই তো নয়। প্রথমে চৈতালিকে, পরে বীথিকেও দেখা গেছে সমুদ্রনীলের সঙ্গে। নিশ্চয়ই বাকি দুটি মেয়েও তারই হেফাজতে আছে। হয়তো মুম্বইয়ের সেই কুচক্রের হাতে কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে দেবে ᐧাঁচ কিশোরীকে। মেয়েগুলোই তার প্রেমিকা ত্রিস্তার মুক্তিপণ।

সেই পাঁচটি কিশোরীকে কীভাবে মুক্ত করা যায়, এখন সেই উপায়ই খুঁজে বার করতে হবে গার্গীকে। এ ক'দিন যে-অঙ্ক কষে সে এগোচ্ছিল, তা হঠাৎই ভেঙ্গে তছনছ। প্রায় সাপলুডো খেলার মতোই। এক-একটা দান ফেলে মই বেয়ে উঠছিল তরতর করে, হঠাৎ এমন দান পড়ল যাতে সাপের লেজ বেয়ে একদম পপাত ধরণীতলে।

কিন্তু সমুদ্রনীলই যদি এতসব কাণ্ডের নাটের গুরু হয়ে থাকে, তাহলে তুলিকা-হত্যাও নিশ্চযই তারই কাজ। গার্গীকে তাহলে এখন এগোতে হবে তুলিকার হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে।

ইতিমধ্যে আরও একটা গূঢ় ভাবনা উসকে উঠছে তার মাথায়। ক'দিন আগে বিলাস সান্যালই বলেছিলেন দেবাদ্রিকে, 'আশ্রয়'-এর অপকাণ্ডগুলি তো ঘটাচ্ছে একজন তত্ত্বাবধায়কই। কথাটা কি তা হলে শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণিত হল! সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, বিলাস সান্যালই বা ঘটনাটা জানলেন কী করে। এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলেছিলেন বিলাস সান্যাল, তাতে মনে হতেই পারে, 'আশ্রয়'-এর সমস্ত ঘটনা তিনি পাই-টু-পাই জানেন। আর যদি ধরেই নিই তিনি সব জানেন, তাহলে কীভাবে জানালেন ঘটনাগুলো। গার্গী অনুমান করে, একটাই সূত্র তাঁর জানার। গত দেড়-দু'মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার তাঁর আগমন ঘটেছে 'আশ্রয়'-এ। প্রতিবারই বেশ কিছুক্ষণ কথোপকথন হয়েছে নিবেদিতার সঙ্গে। কী কথা হত, কেনই বা, তা এতকালের মধ্যে একবারও প্রকাশ করেনি নিবেদিতা! সেটাই ভারী রহস্যজনক। হয়তো নিবেদিতাই সমস্ত ঘটনা জানে। তার কাছ থেকেই সব কিছু একে একে সংগ্রহ করেছেন বিলাস সান্যাল। কিন্তু সে ঘটনা দেবাদ্রি তদন্তে গিয়ে কিছুই জানতে পারেননি জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন সেদিন।

অর্থাৎ গার্গীকে তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সমুদ্রনীলই সমস্ত অপকর্মের মূল! আর তা সমস্তই নিবেদিতার জানা। সেইসঙ্গে 'আশ্রয়'-এর আরও কেউই হয়তো ব্যাপারটা জেনে গেছে ইতিমধ্যে। নিশ্চয়ই তুলিকাও জেনেছিল কোনওভাবে, তাই তাকে সরে যেতে হল পৃথিবী থেকে।

কিন্তু তুলিকা জানল, অথচ ফাদার জানলেন না কিছু সেটাও তো ভারী অসম্ভব ঘটনা।

তাহলে নিবেদিতাকেই আর একবার বাজিয়ে দেখবে নাকি সে কতটা জানে এ ব্যাপারে।

কিন্তু তার আগে সমুদ্রনীল সম্পর্কে বাকি তথ্য সংগ্রহ করার দিকেই মনঃসংযোগ করল গার্গী। সায়ন তার আরমবাগের ডিস্ট্রিবিউটরকে কাজে লাগিয়ে পরদিনই খবর এনে দিয়েছিল, স্যরি, ম্যাডাম। সমুদ্রনীল নামের তোমার এক্স-সহকর্মীটি কী যেন নাম সেই গ্রামটিতে বহুকালের মধ্যে পা দেননি।

গার্গী আগেই অনুমান করেছিল ব্যাপারটা, তবু জেনে আরও নিশ্চিন্ত হল। কয়েকদি কিশোরীকে অপহরণ করে কলকাতার ভিড়ভাট্টায় তবু লুকিয়ে রাখা সম্ভব, কিন্তু গাঁয়ে বাড়িতে কখনও নয়। পশ্চিমবাংলার গাঁ-দেশ এখন এতই উত্তেজনাপ্রবণ যে, বাইরে থেকে কেউ এলে তা জানাজানি হয়ে পড়বে তক্ষুনি। বিশেষ করে সমুদ্রনীলের মতো যুবক বহুকাল পর গাঁয়ে ফিরলে তা ছাইচাপা থাকবে না। ধোঁয়া বেরুবেই বেরুবে।

গার্গী বিড়বিড় করল নিজের মনে, তাহলে কী উপায়?

—সমুদ্রনীলকে খুঁজে বার করতে হলে তোমাকে পুলিশ-অফিসারদেরই শরণাপন্ন হতে হবে, ম্যাডাম। দেবাদ্রি সান্যালকে বলো।

গার্গী হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল, নাহ্, তিনি এখনও গোয়া থেকে ফেরেননি। তাছাড় কেসটা এখন হোমিসাইড ব্রাঞ্চ দেখছে। মিসিং স্কোয়াড ব্রাঞ্চ তাদের হাত ধুয়ে ফেলেছে।

—তাহলে হোমিসাইড ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনস্পেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করো। যিনি আ ও মানে ইনভেস্টিগেশন অফিসার, তাঁকেই বলো সমুদ্রনীলের কথা।

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তাই বলতে হবে দেখছি। তুমি তো আমাকে অকূলপাথারে ভাসিে ইউরোপে চললে।

সায়ন হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ। বুঝতে পারছি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউরোপ চলে গেে তদন্তের কাজে খুবই অসুবিধে হবে এ ক'দিন। বরং এক কাজ করো—

—কী? গার্গী জিজ্ঞাসু চোখ তোলে।

—তোমার ওই স্তাবক, সায়ন্তন ব্যানার্জির সাহায্য নাও। তুমি বললে নিশ্চয়ই ছোটাছু করবেন সমুদ্রনীলকে খুঁজতে।

গার্গীও হাসল। তবে মনে মনে। সায়ন্তন ব্যানার্জির ব্যাপারটা সায়ন বেশ স্পোর্টিং নিয়েছে। গার্গীর এই ছদ্মপ্রেমিক সম্পর্কে দু-একটা মন্তব্যও করে আজকাল। গার্গী অব সায়ন্তন-ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চায় মন থেকে। কিন্তু কিছু কিছু ভাবনা আছে যা মুছে চাইলেও পুরোপুরি মোছা যায় না। সায়ন্তন ব্যানার্জি এমনই একজন নাছোড়বান্দা লোক কারণে-অকারণে গার্গীকে ফোন করে। কখনও বলে ম্যাডাম, বিজ্ঞাপনের একটা নতু লে-আউট করিয়েছি, আপনি দেখে অ্যাপ্রুভ করলে কাগজে ছাপার জন্য অ্যাডভার্টাইজি এজেন্সিকে বলে দিতে পারি। গার্গী নিস্পৃহ স্বরে বলে, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।' পাঠিে দিতে বলায় ওপাশের কণ্ঠস্বর বুঝিবা একটু নিষ্প্রভ। হয়তো গার্গীর চেম্বারে আস চেয়েছিল, তার সামনে বসে একটু কথা বলতে মন করেছিল। কিন্তু গার্গী নাকচ করে দি তার ইচ্ছে। সে আজকাল খেয়াল করেছে নতুন অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার তার চেম্বা ঢুকলে আর উঠতে চায় না। আগড়ুম বাগুডম নানা প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ঘোরায় টেলিকমেও কথা বলে বহুক্ষণ। সে সব আলোচনার সঙ্গে কোম্পানির কাজকর্মের কোন সংযোগই নেই। ক'দিন আগে আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে। নিজের লেখা একটা নতু কবিতার বই উপহার দিয়েছে গার্গীকে। একদম ঝকঝকে বই। কয়েকদিন আগেই না বেরিয়েছে। গার্গী কবিতার বই তেমন পড়ে না আজকাল। পড়ত বহুকাল আগে—তা কলেজে পড়ার দিনে। তবু বইটা উল্টেপাল্টে মনে হল সো সো। মোটামুটি পড়া যায়। তা দু-একটা কবিতা আবার গার্গীকে উদ্দেশ করেই লেখা।

একটা ঘটনা তো এই মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে। মাস দুয়েক আগে গার্গী একা গোলাপি শাড়ি পরে এসেছিল অফিসে। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। এমনিতে তার সাজগোজে

বাহার নেই কোনও দিন। একটা টিপ পর্যন্ত পরে না কপালে। সেদিন একটা গোলাপি টিপও পরেছিল। কী আশ্চর্য, সেদিনই কী কারণে সায়ন্তন ব্যানার্জি তার চেম্বারে ঢুকে পড়েছিল হঠাৎ। তার অমন সাজগোজ দেখে কী উচ্ছ্বাস, ইস্, ম্যাডাম, আপনাক যা সুন্দর দেখাচ্ছে না! নিশ্চয়ই আজ কোনও বিশেষ অকেশন? চেয়ারম্যান সাহেব খুব তারিফ করেছেন তো আপনাকে দেখে?

একজন বাইরের লোকের মুখ থেকে এত প্রশংসা আবার পছন্দ করে না গার্গী। তবু শুনতে খারাপও লাগছিল না। মৃদু হেসে বলেছিল, না চেয়ারম্যান সাহেবের অত সময় নেই আমার সাজগোজ দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়ার।

—সত্যি! সায়ন্তন ব্যানার্জি হয়তো অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করেছিলেন উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাস পরে ঢেলে দিয়েছেন এক দীর্ঘ কবিতায়। পুরো কবিতাটাই গোলাপি শাড়ি ব্লাউজ পরা এক নারীর উদ্দেশে স্তুতি।

সায়নকে পুরো ঘটনাটা তখনই বলেছিল গার্গী। শুনে সায়ন অবশ্য কিছু বলেনি। হয়তো মনে মনে ঢালা উপুড় করেছে গার্গীর জীবনে এমন এক প্রেমিকের আবির্ভাব প্রসঙ্গ। পরে টুকটাক ইয়ার্কিও করেছে গার্গীর সঙ্গে। বন্ধুরা যেমন করে থাকে। সায়ন এখন তার যতটা না স্বামী, তার চেয়ে বেশি বন্ধুই। আজ সায়নের প্রস্তাব শুনে মিটমিট করে হেসে বলল, দ্যাখো, তোমার ওপর যতটা নির্ভর করতে পারি, বাইরের একজন লোকের ওপর ততটা নির্ভর করা যায় না। তা ছাড়া ওই লোকটিকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। কবি লেখকদের বোধহয় এরকম অনেক প্রেমিকাট্রেমিকা থাকে।

যাই হোক, সায়ন তাকে এরকম একটা অদ্ভুত ভাবনার গ্যালক্সিতে স্থাণু করে রেখে কয়েকদিনের মধ্যে পাড়ি দিল ইউরোপ। সে চলে যেতেই হঠাৎ যেন ভারী একা অনুভব করল গার্গী। কিন্তু তা সামান্য সময়। তারপর সে নিজের সত্তাটা দুভাগ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'রকম কাজে। একটা সত্তা ঢেলে দিল তার অফিসে। অন্য সত্তাটাই এই মুহূর্তে তার কাছে প্রধান, কারণ গার্গী নিশ্চিত 'প্যারাডাইস প্রোডাকটস'-এর পরিকাঠামো সায়ন এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যা সায়ন বা গার্গীর অনুপস্থিতিতেও আরও কিছুকাল গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে।

কিছুটা দোনামনা করে গার্গী ফোনে ধরল হোমিসাইড ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে। দ্যুতিমান অবশ্য দেবাদ্রির মতো গার্গীর ফোন পেয়েই হইচই করে ওঠে না। ভারী ও গম্ভীর গলায় বললেন, বলুন, কী জানতে চান?

গার্গী সরাসরি তার বক্তব্যে পৌঁছয়, বুঝতেই পারছেন মিঃ চ্যাটার্জি, 'আশ্রয়'-এর ব্যাপারে আমরা সবাই বেশ টেনসনে আছি। ওখানে এককালে আমি কাজ করেছি। তুলিকা আমার পুরনো সহকর্মী। জানতে চাইছিলাম তার হত্যা রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারলেন কি না—

দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সংক্ষিপ্ত উত্তর, এখনও তেমন কিছু জানাতে পারছি না, ম্যাডাম।

গার্গী যেন জানতই এরকম উত্তর আসবে। নিস্পৃহ, অনিচ্ছুক স্বর। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সমুদ্রনীল সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোনও ইনফরমেশান আছে?

—হ্যাঁ। শুনেছি, কোনও একটি মিসিং মেয়ের সঙ্গে তাকে নাকি দেখা গেছে দু-একবার।

—একটি মেয়ে! নাকি একাধিক মেয়ের সঙ্গে, মিঃ চ্যাটার্জি?

—না, না, একটিই মেয়ে। অন্তত যেটুকু ইনফরমেশান আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

গার্গী নাড়াচাড়া করল কথাটা। এমনও হতে পারে সমুদ্রনীল সম্পর্কে সব খবর এখন পাননি ওঁরা। সমুদ্রনীলের গতিবিধি গার্গী যেটুকু জেনেছে তা এখন বিস্তারিত ভাবে দ্যুতিমা চ্যাটার্জির কাছে বলবে কিনা তা ভাবল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার এখন একথাটাও জানা দরকা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড ব্রাঞ্চ আর কী কী খবর এর মধ্যে পেয়েছে।

—আচ্ছা, মি. চ্যাটার্জি, আপনার কি মনে হয়নি, সমুদ্রনীল এই সব ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবে জড়িত? তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন না?

—দেখুন, মিসেস চৌধুরী, এখনও পর্যন্ত আমাদের যা তদন্তের প্রোগ্রেস, তাতে অনুমা করছি একাধিক কালপ্রিট 'আশ্রয়'-এর মিসহ্যাপের সঙ্গে জড়িত। সমুদ্রনীল ইজ ওয়ান অ দেম। তবে তিনিই একনম্বর কালপ্রিট কি না তা এখনও আমাদের ইনভেস্টিগেশনে পরিষ্কা নয়। র‍্যাদার উই আব নাউ ইন্টারেস্টড অ্যাবাউট বিলাস সান্যাল।

গার্গী বিস্ময়েব স্বরে বলল, আপনার কি মনে হয় উনিই—

—না, ম্যাডাম, কোনও কিছুই বলা যাচ্ছে না এখন। তবু বিলাস সান্যালের যা অতী ইতিহাস জানা যাচ্ছে, তাতে তাঁকে খুঁজে বার করাটাই এমন আমাদের প্রথম কাজ।

গার্গী উৎসাহী হয়, কী ইতিহাস খুঁজে পেলেন, মিঃ চ্যাটার্জি! খুব সিক্রেট না হলে এব যদি বলেন—

—না, এখন আর কোনও লুকোছাপার ব্যাপার নেই। পোলিশ ইজ নাউ উইচ-হান্টিং য হিম।

—তাই নাকি? 'আশ্রয'-এর ব্যাপারেই?

—না। র‍্যাদার ফর অ্যা কেস অব ডাব্‌ল্ ফ্রড।

বিলাস স্যান্যালের বহুবিধ গুণের মধ্যে অন্যতম যে জালিয়াতি তা আগেই জেনে গার্গী। তবু 'ডাব্‌ল্ ফ্রড' শুনে একটু উসকে ওঠে কৌতূহল, কীরকম, মি. চ্যাটার্জি?

—আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, বিলাস সান্যাল সফ্‌ট্‌ওয়্যারের বিজনেসে বেশ সুনাম অজ করেছেন। একটা ন্যাশনালইজড ব্যাঙ্ক থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা লোন নিয়েছি এন্টারপ্রেনার হিসেবে নিজেকে শো করে। সেই ব্যাঙ্কের টাকা শোধ না করে নিজেকে ঘোষ করেছিলেন একজন দেউলিয়া হিসেবে। এখন আবার জানা গেছে, সেই একই প্রজেক্টের স্কি অন্য একটি ন্যাশনালাইজ্‌ড্ ব্যাঙ্কে দেখিয়ে আরও পঁচাত্তর লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলে একই সময়ে।

—বলছেন কী, মি. চ্যাটার্জি?

—হ্যাঁ। অর্থাৎ একই স্কিম দেখিয়ে দু দুটো ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছিলেন। কারও এ পয়সাও শোধ করেননি, প্রজেক্টটাও রূপায়িত করেননি। বুঝুন কীরকম এলেম।

বিলাস সান্যাল যে রীতিমতো এলেমদার লোক তা তাঁর সঙ্গে যারাই মিশেছে কার বুঝতে বাকি নেই আর। তবে সম্ভবত তাঁর সব এলেম এখনও প্রকাশিত হয়নি। পৃথিবী যে অনেক ভাল ভাল মানুষের জন্ম দেয়, তেমনই কিছু 'ফ্রড'-এরও। বিলাস সানাল সম্প দেবাদ্রিই বোধহয় বলেছিলেন, 'মিনি চার্লস শোভরাজ'।

—কিন্তু 'আশ্রয়'-এর সঙ্গে বিলাস স্যান্যালের সম্পর্ক কতটুকু তা কি উদ্ধার কর পেরেছেন, মি. চ্যাটার্জি?

—না, তবে সম্প্রতি এমন একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যাতে তাঁর ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে!

—কী রকম?

—আপনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন 'আশ্রয়'-এ শতভিষা রায় নামে একজন হোস্টেল সুপরিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন সম্প্রতি। কিন্তু মহিলার আসল পরিচয় কী তা বোধহয় জানেন না।

গার্গী জানে না। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে উনি?

—শতভিষা রায় হলেন বিলাস সান্যালের তৃতীয় স্ত্রী।

গার্গী এবার সত্যিই বোবা হয়ে গেল। দীর্ঘ চার বছর কোনও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছাড়াই 'আশ্রয়' ভালই চলেছিল। দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধিই ঘটছিল প্রতিষ্ঠানটির। হঠাৎ কোত্থেকে এক এলোঝড় এসে নাড়িয়ে দিয়েছে তার ভিত। ফাদার নিঃসন্দেহে বেশ উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভেবে। কিন্তু এরকম একটা টালমাটাল সময়ে শতভিষা রায় নামের এক অজ্ঞাতকুলশীল মহিলাকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করায় প্রতিষ্ঠানসুদ্ধ সবাই হতবাক। এখন গার্গীও অবাক হল শতভিষা রায়েব পরিচয় শুনে। বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ ফাদার কেন বিলাস সান্যালের প্রাক্তন স্ত্রীকে এনে চাকরি দিলেন! একই সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন উথলে উঠছে তার। তাহলে ফাদারের সঙ্গে কি বিলাস সান্যালের পরিচয় আছে? বিলাস সান্যালের সুপারিশক্রমেই কি 'আশ্রয়'-এ চাকবি হয়েছে শতভিষা বায়ের! না কি ঘটনাটা একেবারেই কাকতালীয়! শতভিষা রায় তাঁর নিজের এলেমেই চাকরি পেয়েছেন! অথবা ফাদারেব সঙ্গে অন্য কোনও সূত্রে আলাপ হয়েছে শতভিষা রায়েব! যেভাবে 'আশ্রয়'-এর বাকি তত্ত্বাবধায়কদের চাকরি হয়েছিল চাব বছর আগে, সেভাবেই কি চাকরি হয়েছে তাঁর?

রিসিভার নামিয়ে রেখে গার্গী নানান দোলাচলে ভোগে। সমুদ্রনীলকে নিয়েই যখন তার চিন্তা ঘুর খাচ্ছে, তখনই শতভিষা রায়ের আবির্ভাব এক অন্য ঘূর্ণি তুলল মনে। আশ্চর্য, সমুদ্রনীলের ব্যাপারটা তেমন আমলই দিলেন না দ্যুতিমান চ্যাটার্জি। কিন্তু সমুদ্রনীলকে তার যে চাইই চাই।

এতক্ষণে গার্গী অনুভব করতে পারল তার সীমাবদ্ধতা। সে নিতান্তই একজন অনুসন্ধিৎসু তরুণী, কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার ভেতরে উঁকি দেওয়াটা যার নেশা। টুঁ দিয়ে জানতে চায় তার আসল রহস্য। অথচ গোয়েন্দা হিসেবে তার কোনও পরিচিতিই নেই। শুধু বার বার নিজেকে জড়িয়ে ফেলে এমন সব অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে। তার রহস্য উন্মোচন না করা পর্যন্ত তার নিস্তার থাকে না। এবারও 'আশ্রয়'-এর ঘটনার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়বে ক্রমশ। তাতে তার বিভ্রান্তিই বাড়বে। কোনও সূত্রই পাচ্ছে না ঠিকঠাক। যে মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সমুদ্রনীলই প্রকৃত কালপ্রিট তখনই বিলাস-শতভিষা প্রসঙ্গ ভুস করে ভেসে উঠল পটভূমিতে।

কিন্তু সমুদ্রনীল এপিসোডও তো পরিষ্কার হওয়া দরকার। পুলিশ ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি বলছেন একটিই মেয়ের সঙ্গে দেখা গেছে সমুদ্রনীলকে। অথচ গার্গী জেনেছে তিনজনের খবর। তিনটি খবরই তিনরকম সূত্রে পাওয়া। সমস্ত ঘটনাগুলো নিয়ে একদিন দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে বসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু দ্যুতিমান কি তাকে সময় দেবেন! তার আগে আরও একটা খবর জানা দরকার। যে-টর্চটির আঘাতে তুলিকার মৃত্যু হয়েছিল, তাতে কারও হাতের ছাপ পাওয়া গেল কি না। একটু আগেই দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনার সময় এই প্রসঙ্গটা তুলতে একদম ভুলে গেল সে। অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। খবরটা পেতে আবও একবার দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে ফোনে ধরবে, না কি ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে গিয়ে শ্রান্তমল্লিকা নামের টেকনিসিয়ানটির সঙ্গে ভাব জমাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পরিদিন দুপুরবেলা ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তার ভাণ্ডারে জুটল তাতে আবার সমস্ত অঙ্ক নতুন করে কষা শুরু করতে হ গার্গীকে।

## ॥ ২৪ ॥

পাঁচ ব্যাটারির যে-টর্চটা দিয়ে তুলিকাকে সেই রাতে আঘাত করা হয়েছিল, তাতে কারও হাতের ছাপ পাওয়া গেল কিনা সেইটেই আপাতত গার্গীর জিজ্ঞাস্য বিষয়। ভাবছিল তথ্যটা হোমিসাইড ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকেই জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কী ভেবে সিদ্ধান্ত নিল, সরাসরি ফরেনসিক টেকনিসিয়ান শ্রান্তমল্লিকার সঙ্গে কথা বলাই ভাল।

এখানে-ওখানে ফোনোফোনি করে গার্গী জেনে নিল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির যথাযথ হদিশ। ঠিকানাটা বেনিয়াপুকুর থানার কাছাকাছি। ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট শ্রান্তমল্লিকা নামের তরুণীটির সঙ্গে সেদিন সামান্য সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল তার। ভাল করে আলাপও হয়নি। চোখোচোখি হয়েছিল দু-চারবার। কিন্তু মেয়েটির চলাফেরা, সপ্রতিভতা তাকে ভারী আকর্ষণ করেছিল। মেয়েরা এরকম স্মার্ট হলে গার্গীর বেশ ভাল লাগে। সেই চৌখস তরুণীটির খোঁজেই অতএব গার্গী বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে।

পার্ক সার্কাস এলাকায় ফরেনসিক ল্যাবরেটরির বাড়িটা খুঁজে পেতে অবশ্য একটুও দেরি হল না। তারই একটি প্রশস্ত ঘরে দেখা হয়ে গেল শ্রান্তমল্লিকার সঙ্গে। আগের দিন পরনে ছিল সালোয়ার-কামিজ। আজ সবুজে-নীলে মেশানো একটা শিফনের শাড়ি। তাতে আরও চমৎকার দেখাচ্ছে। গার্গী নিজে থেকেই গিয়ে আলাপ করে বলল, তুলিকা আমার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দুর্ঘটনাটা নিয়ে আমরা সবাই ভীষণ আপসেট। কোনও তালহদিশই করা যাচ্ছে না কেন খুন হল তুলিকা। ফরেনসিক টেকনিশিয়ান হিসেবে আপনি যা-যা তথ্য পেয়েছেন তা কি আমাকে জানানো যাবে?

শ্রান্তমল্লিকা চোখ বুজে ঘটনাটা কিছুক্ষণ স্মরণে এনে লোফালুফি করে অবশেষে চোখ খুলল, তার রিপোর্ট তো আমরা ডি. সি. ডি. ডি-র কাছে বেশ ক'দিন আগে পাঠিয়ে দিয়েছি।

গার্গী হেসে বলল, দেখুন, পুলিশের কাছে পাঠানো রিপোর্ট আমাদের নাগালে পৌঁছবে না। কিন্তু রিপোর্টটা দেখা আমার কাছে খুব জরুরি। আমি যদি রিপোর্টটা একবার দেখতে চাই, আপনাদের কি আপত্তি হবে?

—অফকোর্স! শ্রান্তমল্লিকা মুহূর্তে তার আবেদন নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, এভাবে বাইরের লোকের কাছে আমাদের রিপোর্ট দেখানোর কোনও অর্ডার নেই।

গার্গী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, তা হয় তো নেই। কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্টও তো পাবলিক ডকুমেন্ট। রিপোর্টটা কোর্টে এক্সিবিট হিসেবে থাকবে নথির সঙ্গে। তখন তার কপি চাইলেই পাওয়া যায়। ঠিক কিনা?

শ্রান্তমল্লিকা একটু থমকাল, তা হয় তো পাওয়া যায়।

গার্গী এবার ভূমিকা ছেড়ে সরাসরি তার বক্তব্যে আসে। প্রায় তারই সমবয়সী কি বয়সে একটু বড় তরুণীটির চোখে চোখ রাখল, দেখুন, আপনাকে খুলেই বলি সমস্যাটা। কলকাতা পুলিশের দক্ষতার ওপর আমাদের তেমন ভরসা নেই। এর আগেও বেশ কয়েকটি কেসে দেখেছি সময়মতো চার্জশিট দিতে পারেনি ওরা, অপরাধীকে সনাক্ত করা তো দূরের কথা। পুলিশের তদন্তের ধারা দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, সামান্য মেধা প্রয়োগ করলেও যে কেসগুলো সহজে ফয়সালা করা যায়, সেগুলোর অপরাধীও ছাড়া পেয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে, বলা যায় বিরক্ত হয়েই মাঝেমধ্যে আমি আমার সাধারণ মাপের মস্তিষ্কটাই প্রয়োগ করতে শুরু করেছি কোনও কোনও কেসে, যেগুলোয় আমার পরিচিত কেউ জড়িত হয়ে পড়েছে, বা পড়বার সম্ভাবনা। এর আগে এরকম কয়েকটা কেসের তদন্ত করে শনাক্ত করেছি অপরাধীকে। এই কেসটারও তদন্ত করতে শুরু করেছি কিছুদিন হল। 'আশ্রয়'-এর প্রতিটি মানুষই আমার ভীষণ কাছের লোক। তাদের কথা ভেবে, ফাদারের কথা ভেবে ঠিক করেছি এ-কেসটা আমি নিজেই তদন্ত করব।

শ্রান্তমল্লিকা বিস্ফারিত চোখে তাকাল গার্গীর দিকে, ইউ মিন ইউ আর অ্যা ডিটেকটিভ?

—ডিটেকটিভ বলতে যা বোঝায় আমি ঠিক তা নই। কেউ আমাকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছে তাও নয়। বলতে পারেন আমার অনুসন্ধিৎসা বস্তুটি প্রবল। কোনও একটা ঘটনা মাথার ভেতর ঢুকলে ইচ্ছে হয় তার বাইরের দিক, ভেতরের দিক সব উল্টেপাল্টে দেখি। তার ভেতর কোনও রহস্যের গন্ধ পেলে তার উন্মোচন করার চেষ্টা করি।

—দেন ইউ আর ওয়েলকাম। অ্যান্ড লেট আস বি ফ্রেন্ডস, শ্রান্তমল্লিকাকে ভারী উচ্ছ্বসিত দেখায় এ সময়, আমাদের দেশে মেয়ে ডিটেকটিভ একেবারেই নেই। শুনে খুব ইন্টারেস্ট লাগছে। আমরা যদি পরস্পকে তুমি বলি আপত্তি আছে?

—অ্যাবসলিউটলি নট। আপনিতে যতটা দূরত্ব থাকে, তুমিতে তার চেয়ে ঢের কম। তা হলে তুমি আমাকে সাহায্য করছ?

—একশোবার সাহায্য করব। তা হলে আমার ঘরে এসো যেখানে বসে আমি কাজ করি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী ভাল লাগছে। আমরা এত কষ্ট করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে পুলিশের হাতে তুলে দিই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ অপরাধী শনাক্ত করতে পারে না। একে-ওকে ধরে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়। ক'দিন পরেই সে জামিন পেয়ে যায়। কেস চলতেই থাকে। অনেক সাড়া-জাগানো মার্ডার কেসও একসময় ধামাচাপা পড়ে যায় এ ভাবে।

গার্গীকে নিয়ে শ্রান্তমল্লিকা চলে এল একটা দশ বাই বারো ঘরে যার ভেতরটা বেশ টিপটপ সাজানো। দেওয়ালে অনেক রকম ফিল্মের নেগেটিভ সারি সারি ঝোলানো। ঘরের মাঝখানে হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে দুটি রেক্সিন-সাঁটা চেয়ার। তার ও পাশেরটায় শ্রান্তমল্লিকা বসে এ পাশেরটা দেখিয়ে বলল, বোসো। হুঁ, কথা শুরু করার আগে তোমার নামটাম কিন্তু জানা দরকার।

—গার্গী। গার্গী চৌধুরি। তোমার নাম কিন্তু মিসিং স্কোয়াড সেলের দেবাদ্রি সান্যালের কাছ থেকে সেদিনই জেনে নিয়েছিলাম—শ্রান্তমল্লিকা।

—ফাইন। শ্রান্তমল্লিকা তার গাম্ভীর্য ছেড়ে বেশ সহজ হয়, তোমার নামটা কোনও কারণে শোনা-শোনা লাগছে। সে যাই হোক, তোমাকে আগে ফাইলটা দেখাই।

সবুজরঙা প্লাস্টিকের কভারটা খুলতেই অনেকগুলো নেগেটিভ প্লেট বেরিয়ে এল শ্রান্তমল্লিকার হাতে। তার নীচে কয়েকটা পজিটিভও। তারপর অনেকগুলো রিপোর্ট।

সেগুলো গার্গীর সামনে মেলে ধরে তরুণী বিশেষজ্ঞটি বললেন, মেঝে, দেওয়াল আ দরজায় যাদের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে সেগুলোর কথাই প্রথমে বলি। তুলিকাদের ঘরটা তুলিকা ছাড়াও থাকত তিয়াসা নামের একটি মেয়ে। ঘরে তাদের দুজনের হাতের ছাপ পাওয় যাবে তা তো স্বাভাবিকই। কিন্তু আরও কয়েকটি হাতের ছাপ পাওয়া গেছে যারা ও ঘ থাকে না।

গার্গী আগ্রহী হল, সেগুলো কাদের?

—নিবেদিতা, নির্মাল্য ও সমুদ্রনীল নামের তিনজনের।

—তারাও তো পাশাপাশি ঘরে থাকে। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে কোনও কাজে বা নিছ গল্প করতেও এসে থাকতে পারে।

—কিন্তু ছাপগুলো এত টাটকা যে বোঝা যায়, সেই রাতেই এসেছিল তাঁরা। দ একদিনের আগের ছাপ হলে ধুলো পড়ত ছাপগুলোয়।

—কিন্তু সমুদ্রনীল তো চাকরি ছেড়ে চলে গেছে তুলিকা খুন হওয়ার দু-একদিনে মধ্যেই। তার হাতের ছাপ কী ভাবে মেলালে?

শ্রান্তমল্লিকা হাসল, তার ঘর তো পাশেই। সেখানে তার ব্যবহৃত অসংখ্য জিনিসপ থেকে তার হাতের ছাপ জোগাড় করে মিলিয়েছি।

—ও। কিন্তু আর কারও ছাপ পাওয়া যায়নি?

—না। যদি আর কেউ ওদের ঘরে ঢুকে থাকে, তা হলে গ্লাভস পরে ঢুকেছিল যাতে তা হতের ছাপ না ধরা পড়ে ফরেনসিক টেস্টে।

গার্গী ভাবল কথাটা, সে রকম কোনও চিহ্ন কি তোমরা পেয়েছ?

—একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি তা নয়। সম্ভবত আর একজন কেউ ঢুকেছিল ঘরে।

—কে সে! গার্গীর অজান্তেই তার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসে শব্দ দুটো। কিছুক্ষণ ব যেন বিড়বিড় করল নিজের মনে। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, পাঁচ ব্যাটারির টর্চের গায়ে ি কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?

ফাইল থেকে আরও একটা রিপোর্ট বার করল শ্রান্তমল্লিকা। সেটাও গার্গীর সামনে মে ধরে বলল, টর্চটার গায়ে নিবেদিতা আর তুলিকার সঙ্গে আর যার আঙুলের ছাপ পাওয়া গে সে হল নির্মাল্য।

গার্গী আবার ভাবল ব্যাপারটা। তারপর হঠাৎ বলল, গ্লাভস পরে যদি কেউ টর্চটা ধ থাকে।

—সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—ও কে, গার্গী এবার হাসল শ্রান্তমল্লিকার হাসি-হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে। বল তুমি যেমন একটু আগে বলছিলে মেয়ে-ডিটেকটিভ একেবারে আনকমন ঘটনা এ-দে তেমনি আমিও বলি মেয়ে-ফরেনসিক টেকনিসিয়ানও কিন্তু আন্‌কমন।

শ্রান্তমল্লিকা এতক্ষণে শব্দ করে হাসল, থ্যাঙ্কু, বলে ফরেনসিক ল্যাবরেটরির বাই বেরিয়ে এল গার্গী, তার মাথায় তখন একরাশ এলোমেলো চিন্তার দোলাচল। দুশ্চিন্তাই ব চলে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের রিপোর্ট থেকে নতুন কিছু ক্লু বেরুল কি না তা-ই ভাবছি স্টিয়ারিঙে মোচড় দিতে দিতে। আজকাল মাঝেমধ্যে নিজেই ড্রাইভারি করছে গার্গী। তা গাড়ি চালানোটাও অভ্যেসে থাকে, তার যাতায়াতেও কিছু স্বাধীনতা।

অফিস থেকে ঘণ্টা দেড়েকের ফুরসত খুঁজে পার্ক সার্কাসের এই অ্যাডভেঞ্চারটুকু যাওয়ার সময় যতটা রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল, ফেরার পথে সেই থ্রিল কোথায় যেন উবে গেল মুহূর্তে। নতুন কোনও ক্লু-ই পাওয়া গেল না যেন। মেন্টর'স হাউসের কয়েকজন তত্ত্বাবধায়কের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া নতুন কোনও ইঙ্গিত উপহার দিতে পারেনি শ্রান্তমল্লিকা। আজ গার্গীর শুধু একটাই প্রাপ্তি। শ্রান্তমল্লিকার মতো একটি স্মার্ট বান্ধবী।

সেদিন অফিসে ঢুকে বাকি সময়টা কাজে তেমন মন বসাতে পারল না সে। কেমন যেন উড়ু-উড়ু মন। নানান ভাবনায় উড়ছে তো উড়ছেই। অন্যদিনকার চেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। কিন্তু অফিসের এয়ার-কন্ডিশনড চেম্বার ছেড়ে রাস্তায় গরমের দাপটে গাড়ি চালাতে চালাতে ঘেমে নেয়ে উঠল দ্রুত। কী আর করা যাবে! ঘাম তো কলকাতার সঙ্গী।

অফিস থেকে ফিরে ফ্ল্যাটের অখণ্ড নির্জনতায় 'আশ্রয়'-এর সমস্ত ঘটনা পূর্বাপর ভাবতে বসল গার্গী। সায়ন ইউরোপের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। এখন সে একা, একদম একা। হয়তো আজ বা কাল সায়নের টেলিফোন আসবে। সে-কারণে সন্ধের পর ফ্ল্যাটে থাকাটা তার খুব যে একটা অসহনীয় লাগে তা নয়। একা থাকলে ভাবনার জগৎটা মেলে ধরা যায় পুরোপুরি।

আজও সে ভাবেই একে-একে খুলে ধরল তার ভাবনার পসরা। পাঁচটি কিশোরী অপহরণের দায়ে সমুদ্রনীলকেই দায়ী করতে তার মন চাইছে না ঠিকই, কিন্তু পর-পর তিনটি কিশোরীকে তিন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা গেছে এই তথ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে তা হলে তো সমুদ্রনীলই! কিন্তু বাকি সন্দেহভাজনরা কি তা হলে নির্দোষ! আর যদি সমুদ্রনীলই এত সব অপরহণ ঘটিয়ে থাকে, তা হলে 'আশ্রয়-এর সঙ্গে জড়িত বাকি চরিত্রগুলির অস্বাভাবিক আচরণের কী ব্যাখ্যা করবে?

আসলে সমুদ্রনীলকে সে কোনও দিন অপরাধী ভাবতে পারেনি। তার সঙ্গে গার্গী কিছুদিন কাজ করেছে। গিটারিস্ট যুবকটিকে 'বেটোফেন' বলে ডাকত তারা। বেটোফেন সমুদ্রনীলের খুব প্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু ওই নামে তাকে অভিহিত করলে মুখে সরল, সুন্দর হাসি ফুটিয়ে বলত, 'কেন তোমরা শুধু শুধু সেই শ্রদ্ধেয় মানুষটাকে অপমান করছ?' সেই সমুদ্রনীল ত্রিস্তাকে হারিয়ে গত দু'বছর ভীষণ কষ্টে ছিল। সমগ্র নারী সমাজটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল মনে মনে। ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রিস্তার এরকম একটা কষ্টের চিঠি তার ভালবাসার জগৎটা যে তোলপাড় করে দিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু 'আশ্রয়' তাকে এতকাল অন্ন জুগিয়েছে। তার ওপর একটা কৃতজ্ঞতা বোধ তো আছে। তার রুজি রোজগারের জায়গা থেকে এতগুলো কিশোরীকে অপহরণ ও তারপর তুলিকাকে হত্যা—সবটাই সমুদ্রনীলের পক্ষে কি সম্ভব! তবে সমুদ্রনীলের বিরুদ্ধে যুক্তিটাই বেশি। এ-প্রশ্ন জাগেই তা হলে তুলিকা খুন হওয়ার রাতে কেনই বা সমুদ্রনীল গিয়েছিল তার ঘরে! তার টাটকা ফিঙ্কারপ্রিন্টও পাওয়া গেছে ওদের ঘরের দেওয়ালে, দরজায়।

এতগুলো অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার পর সমুদ্রনীলের ওপর তো সন্দেহ পড়ছেই। তিয়াসার সন্দেহও তাকেই।

কিন্তু কী পরিপ্রেক্ষিতে তুলিকাকে খুন হতে হল সেইটেই আগে জানা দরকার। তিয়াসা বলেছিল রাইকে না পাওয়ার কারণেই। এখন দেখা যাচ্ছে রাই তার কাছেই আছে। তা হলে?

ভাবনাটা দু-এক মুহূর্ত মগজের গভীরে রোল করে গার্গীর হঠাৎ খেয়াল হল, তুলিকা যে-রাতে খুন হয়েছিল, সেদিন বিকেলে গার্গী তাকে লিফ্‌ট্ দিয়েছিল 'আশ্রয়'-এ। কম্পাউণ্ডের

ভেতর গাড়ি থেকে নামার সময় গার্গীর সঙ্গে শুভরাত্রি বিনিময়ের মুহূর্তে তুলিকা ভুলে তার হাতের ব্যাগটা ফেলে গেছে সিটের ওপর। সেই ব্যাগটা তুলিকাকে ফেরত দেওয়ার আর সুযোগ পাওয়া যায়নি। আজ এতদিন পর গার্গীর মনে হল তুলিকার ব্যাগটা আবার নেড়েচেড়ে দেখা যাক। জীবিত তুলিকার ব্যাগ হয়তো এত দরকারি মনে হত না। কিন্তু মৃত তুলিকার ব্যাগ থেকে কোনও ক্লু যদি আবিষ্কৃত হয়।

ব্যাগটি আলমারি থেকে বার করে বিছানার ওপর উপুড় করে দিতেই ভেতর থেকে একে একে প্রকাশিত হল জানা ও অজানা নানান তথ্য। জানা তথ্য হল, তুলিকা বরাবরই সাজতে ভালবাসত। তার ব্যাগে অতএব থাকবেই একটা ছোট আয়না, লিপস্টিক, নেল পালিশ—এমন কী টিপের পাতাও। আর একটা তথ্য জেনেছিল হোমিসাইড ব্রাঞ্চের সিজার লিস্ট থেকে। সেটা আবারও জানল—'লা মিন্যযিত রেইনে' নামের একটি কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেটের স্ট্রিপ নিয়মিত ব্যবহার করত তুলিকা। ট্যাবলেটটা বিদেশ থেকে আনানো। নাম পড়ে মনে হল ফ্রান্সে তৈরি ট্যাবলেট। কিন্তু যা আশ্চর্য তা হল তুলিকার জীবনযাপন তা হলে এতটাই বেহিসেবি ছিল যার জন্যে তাকে নিয়মিত কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হত। কিন্তু সম্পর্কটা কার সঙ্গে ছিল! নাকি একাধিক পুরুষের অস্তিত্ব ছিল তার জীবনে!

ব্যাগের ভেতর থেকে আরও যা-যা পাওয়া গেল তারও একটা সিজার-লিস্ট মনে মনে তৈরি করল গার্গী :

১ 'কার রেন্টাল' নামের সংস্থাটির বেশ কয়েকটি বিল।

২ এয়ারপোর্ট হোটেলের প্যাডে লেখা একটা টাইপ করা চিঠি।

৩ মুম্বইয়ে পাঠানো একটি ফ্যাক্সবার্তার কপি। বেশ সংকেতে লেখা।

৪ গ্রেট ব্রিটেনের স্ট্যাম্প-মারা একটা বড় এনভেলাপ, কিন্তু তার ভেতর কোনও চিঠি নেই। তবে এনভেলাপের ওপর প্রেরকের নাম ঠিকানা আছে।

৫. পি সি ও বুথ থেকে পাওয়া একটি আই এস ডি-র মোটা অঙ্কের বিল। টেলিফোন নম্বরটা সম্ভবত গ্রেট ব্রিটেনেরই।

৬. লন্ড্রির বিল দুটো।

৭. দুটো একশো টাকার নোট। পাঁচটা পঞ্চাশ টাকার। দশ টাকার নোট চারখানা। কিছু খুচরো পয়সা—তাতে ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

৮. একটা লাইটার।

৯. কিছু টুকরো কাগজ।

সিজার তালিকাটি তৈরি করে গার্গী মনে মনে বেশ পুলকিত বোধ করে। ক'দিন আগেই হোমিসাইড ব্রাঞ্চের অফিসাররাও এ রকমই একটি লিস্ট তৈরি করে তার একটা কপি দিয়ে গিয়েছিল আঙ্কেল তরফদারের কাছে। যতদূর মনে পড়ে তাতে কয়েকটা এয়ার মেল খামের কথা লেখা ছিল। সেগুলো অবশ্য নতুন খাম। অর্থাৎ গার্গী বিদেশের কোথাও চিঠিপত্র লিখত নিয়মিত। এখন জানা গেল সেখান থেকে উত্তরও আসত। একটা আই এস ডি বিল দেখে এও প্রমাণিত ইংলণ্ডের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বেশ নিবিড়। কেন যোগাযোগ তার একটা কারণ অবশ্য গার্গী অনুমান করতে পারে। হয়তো ইংলণ্ডের কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে 'আশ্রয়'-এর জন্য মোটা অঙ্কের সাহায্য আসে। তাই 'আশ্রয়'-এর খবরাখবর নিয়মিত পাঠানো হয় সে সব জায়গায় যাতে আরও কিছু সুখবর আসে সেখান থেকে।

একটা চিরকুট টেনে নিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের প্রেরকের ঠিকানা তার ওপর লিখল গার্গী। সেই সঙ্গে আই এস ডি বিলের টেলিফোন নম্বরটাও। হয়তো আজ বা কালকের মধ্যে সায়নের টেলিফোন আসবে। তাকে এই ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বলতে হবে কাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তুলিকার তা খুঁজে বার করতে।

তারপর জানতে হবে মুম্বইয়ে কার ঠিকানায় ফ্যাক্স পাঠিয়েছিল কয়েকদিন আগে। অতঃপর ব্যবস্থা করতে হবে তার ব্যাগ থেকে পাওয়া টাকাটার। টাকায়-পয়সায় মিলিয়ে পঁচিশ পয়সা কম পাঁচশ টাকা। টাকাটা ফাদারকে ফিরিয়ে দিতে হবে একসময়। শুধু টাকাটাই নয়, পুরো ব্যাগটাই দেওয়া দরকার। কিন্তু আপাতত কিছুই দেবে না। ব্যাগটা এখন তার কাছেই থাকবে এক্সিবিট হিসেবে।

কিন্তু 'কার রেন্টাল'-এর বিলগুলো নিয়ে কী করবে এই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারল না গার্গী। বিলগুলো তো পেমেন্ট করতে হবে 'আশ্রয়'-এব ফাণ্ড থেকে। 'কার রেন্টাল'-এর মালিক নিশ্চয়ই তাগাদা দেবেন কয়েক দিনের মধ্যে। তখন ফাদার কি একটু অসুবিধায় পড়বেন।

গার্গী মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, কী আর অসুবিধে হবে। 'কার রেন্টাল'-এর মালিককে ফাদার নিশ্চয়ই বলবেন একটা ডুপ্লিকেট বিল তৈরি করে দিতে।

এত সব ভাবনা নিজের ভেতর নাড়াচাড়া করে তুলিকার ব্যাগটা আবার আগের মতোই গুছিয়ে ফেলল দ্রুত। আলমারিতে যেখানে রাখা ছিল সেখানেই ভরে রেখে যেইমাত্র বিছানায় এক পাক গড়িয়ে নিতে যাবে তখনই বেজে উঠল তারস্বরে ফোন।

গার্গী ছুটে গিয়ে ধরতেই ওপাশে সায়নের গলা, সায়ন বলছি—

গার্গীর গলায় উথলে উঠল খুশির ঝিলিক, ঠিকঠাক পৌঁছে গেছ?

—হ্যাঁ। তোমার একা থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না। কীসের অসুবিধে!

—তা নয়। তোমাকে একা রেখে আসতে আমার বড় ভয় হয়।

গার্গী মনে মনে হাসে। কলকাতায় থাকলে গার্গীর কথা ভাবার বিন্দুমাত্র সময় থাকে না সায়নের। আজকাল গার্গী আলাদা বিছানায় শুলেও তা নিয়ে প্রশ্ন করে না একবারও। অথচ বাইরে গেলেই ফোন করে ঠিকঠাক খোঁজ নেয় গার্গীর। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সেমিনার কবে?

—কালই। কিন্তু তোমার জন্য একটা অদ্ভুত খবর আছে। এখানে আসার পর একটা খবর কানাকানি হচ্ছে এখানকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে।

—কী খবর?

—একজন ইণ্ডিয়ান নাকি এখানকার কয়েকটা ব্যাঙ্ককে বহু টাকা ফ্রড করে পালিয়েছে কলকাতায়। এতদিন পর সেটা ভেসে উঠেছে সারফেসে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছে এখানকার গর্ভনমেন্ট। হয়তো শিগগিরই তারা কলকাতা গিয়ে পৌঁছবে। তুমি সেদিন বলছিলে না কে একজন লোক একই স্কিম দেখিয়ে দুটো ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের লোন নিয়েছে, কিন্তু এখনও এক পয়সাও শোধ দেয়নি। এ ঠিক সেরকমই ব্যাপার।

—কিন্তু লোকটার নাম কী! বিলাস সান্যাল?

—সে খবরটা এখনও জানা যায়নি। একটা মেয়েঘটিত কেসেও জড়িয়ে পড়েছিল লোকটা। খুব এলেমদার চরিত্র।

গার্গী স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশ্চয়ই বিলাস সান্যালের কথাই বলতে চাইছে সায়ন।

—ঠিক আছে, তুমি একটা কাজ করতে পারবে? এই ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা লিখে নাও তো। খোঁজ নিয়ে জানাও তুলিকা কার বা কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত নিয়মিত।

—ও, কে। নো প্রবলেম, ম্যাডাম। আমি সব খবব নিয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখছি দু-একদিনের মধ্যেই। বাই—

গার্গী বুঝতে পারল, ঝুলি থেকে হয়তো সায়নই বার করবে বেড়ালটা। কী বার করবে কে জানে।

## ॥ ২৫ ॥

শতভিষা রায় নামের যে নতুন হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিছু দিন হল যোগদান করেছে 'আশ্রয়'-এ, সেই গম্ভীর স্বভাবের যুবতীটির সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই আলাপ করার ইচ্ছে গার্গীর। খুবই সুন্দরী মহিলা, আবার বেশ দাপুটেও। বিলাস সান্যালের এই তৃতীয় স্ত্রী কে যে ঠেক খেয়েছেন আপাতত টলমল এই প্রতিষ্ঠানটিতে তা কোনও ভাবে জানতে হবে গার্গীকে। এ ক'দিন তার ফুরসত হচ্ছিল না। শনিবার দুপুরের পব অফিসের কাজ হালকা হতেই ফোন করল 'আশ্রয়'-এ। সাধারণত ফাদারই ধবেন ফোন, আজ কথা শোনা গেল চম্পক চট্টরাজের, বলো, কী খবর?

—আঙ্কেল, নিবেদিতাকে পাওয়া যাবে লাইনে?

—নিবেদিতা। না। ও তো ফাদারের সঙ্গে হোস্টেলের দিকে গেল। কাল রাতে নাকি কী সব ঝামেলা হয়েছিল। সেই কারণেই—

—কী ঝামেলা, আঙ্কেল?

রিসিভারের ও পাশে ইতস্তত করলেন চম্পক চট্টরাজ, ফোনে সব বলা যাবে না এমনিতে এখানকার আবহাওয়া ভীষণ জটিল, তার ওপর বিপ্রতীপ-স্বভাবের মহিলারা এক জায়গায় বাস করলে জটিলতর হয়ে ওঠে পরিস্থিতি!

এরকমই জটিল সংলাপ বলে, আঙ্কেল চট্টরাজ আরও জটিল একটা ছবি ছুড়ে দিলেন গার্গীর দিকে। গার্গী প্রবল বিভ্রান্ত। এর আগে 'আশ্রয়'-এব আবহ সাধারণত জটিল করে তুলত বিশাখাই—তাব ক্যান্টাঙ্কারাস্ স্বভাবেব জন্য। সেটা অবশ্য ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল কম্পাউণ্ডের বাসিন্দাদের। আজ তা হলে নিশ্চয়ই অন্য টানাপোড়েন। এরকমই একটা জটিল মুহূর্তে ওখানে গার্গীর উপস্থিতিটা খুবই দরকার।

তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলকাতার জল-উপছানো রাস্তায়। সামান্য জ্যামজট কাটিয়ে 'আশ্রয়'-এ পৌঁছে দেখল যতটা জটিল ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক ঘোরালো ঘটনা।

ভিড়টা মেয়েদের হোস্টেলের দিকেই। সেদিকে এগোতেই চোখে পড়ল রূপায়ণ বসে আছে মাঠের মাঝখানে। ঘুর ঘুর করতে থাকা একটা শালিকের সঙ্গে কথা বলে চলেছে দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে। গার্গীকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, ম্যাডাম, তুমি এই কেলোর কীর্তির মধ্যে হঠাৎ!

রূপায়ণের কথ্যরীতি বরাবরই আলগা ধরনের। গার্গী অকুস্থলে পৌঁছনোর আগে কেলোর কীর্তির রকমটা বুঝতে চাইল, কী হয়েছে ওখানে?

—সে অনেক গণ্ডগোলে ব্যাপার। বেশি নাক না গলানোই ভাল।

সামান্য মস্করা করে গার্গী স্বাভাবিক করে তুলতে চাইল রূপায়ণকে, তোমার ওই চীনে নাক কোথাও গলবে না, ব্রাদার।

রূপায়ণ হি হি করে হেসে বলল, যা বলেছ, ম্যাডাম। কিন্তু তোমার ওই এরিয়ান নাক গলাতে গেলেও বিপদ হতে পারে। সতীনে-সতীনে ঝগড়া, কোথায় থামবে কেউ বলতে পারে না, কুত্র ফাদারঃ।

'সতীনে-সতীনে' বাক্যবন্ধটি গার্গীকে বেশ কৌতূহলী করে তুলল। কিছুটা পরিষ্কার হল যেন ব্যাপারটা। একটু খোঁচাতেই রূপায়ণ তার স্বভাবসিদ্ধ রগুড়ে গলায় জানাল যে-কাহিনী তা যথার্থই গোলমেলে। হোস্টেলের নতুন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শতভিষা রায় নাকি আবিষ্কার করেছেন ওখানকার দুই কিশোরী সোনালি আর পলাশী ছক আঁটছিল রাতের গভীরে পালিয়ে যাওয়ার। সন্ধের পর দুজনে তাদের ঘরে সুটকেসও গোছগাছ করছিল দরজা বন্ধ করে। সে সময় শতভিষা রায় ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই দুজনে খুব ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। দুজনেই অবশ্য অস্বীকার করেছে ঘটনাটা। তাদের এমন কোনও পরিকল্পনাই নাকি ছিল না। এ ভাবে সুটকেস তো তারা প্রায়ই গোছায়। তবু শতভিষা তাদের খুব ধমকেছেন। এই পর্যন্ত পরিস্থিতি তবু ঠিক ছিল। হঠাৎ আজ সকালে নিবেদিতা নাকি সোনালিকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ঠিক কী হয়েছিল বল তো কাল?' সোনালি কোনও উত্তর না দেওয়ায় নিবেদিতা আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'সত্যি করে বল তো, নতুন সুপারিন্টেণ্ডেন্টই কি তোদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল?' সে কথাটা কীভাবে মেয়েদের মধ্যে কানাকানি হতে হতে একসময় পৌঁছে গেছে শতভিষা রায়ের কানে। শতভিষা রায় তাতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ফাদারের কাছে অভিযোগ করেছেন এটা খুবই অভিসন্ধিমূলক কথা। নিবেদিতাও নাকি প্রকাশ্যে বলেছে, 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' তারপর বহুক্ষণ দুজনে ঝগড়া। গোটা 'আশ্রয়' জুড়ে প্রবল ঝঞ্ঝাট। এখন ফাদার নিবেদিতাকে নিয়ে গিয়েছেন হোস্টেলে—শতভিষা রায়ের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে।

পরিস্থিতি যাকে বলে অগ্নিগর্ভ। আঙ্কেল চম্পক চট্টরাজ ঠিক বলেছেন, এখানকার জটিল আবহাওয়ার মধ্যে নিজেরা বিবাদ করে জটিলতম করে তুলছে জায়গাটা। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না নিবেদিতা কেন ঢুকতে গেল শতভিষা রায়ের শাসনের মধ্যে।

ঘটনাটা নিজের মনে দু-এক পাক ঘুলিয়ে গার্গী বুঝতে চাইছিল গোলমালটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। ত্রিস্তা যে-চিঠিটা লিখেছিল সমুদ্রনীলকে, তাতে বলা ছিল তার মুক্তিপণ পাঁচটি কিশোরী। প্রথমে চৈতালি, তারপর অতসী, অতঃপর একসঙ্গে শেফালী ও বীথি, শেষে রাই—পাঁচ কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার পর 'আশ্রয়' রাহুমুক্ত হয়েছে এমন ভাবা যায় যদি সমুদ্রনীল কালপ্রিট হয়। তারপর আবার দু'জন কিশোরীর নিজে থেকে পালিয়ে যাওয়ার ছকটা ত্রিস্তার চিঠির বয়ান অনুযায়ী মিলছে না। তারা সত্যিই কি পালিয়ে যাওয়ার ছক

এঁটেছিল, না কি সবটাই শর্তভিষা রায়ের সন্দেহ! এও তো হতে পারে এ রকম একটা গল্প ফেঁদে হইচই বাধিয়ে শতভিষা তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে চাইছেন!

কিন্তু নিবেদিতাই বা কেন শুধু শুধু এ রকম একটা আলটপকা মন্তব্য করতে গেল!

রূপায়ণের নাগাল পেরিয়ে গার্গী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে হোস্টেলের নীচে টিচার্সরুমে যেখানে ফাদার মুখোমুখি বসিয়েছেন দুই বিবদমান যুবতীকে। আশেপাশে আরও বসে আছেন আঙ্কেল তরফদার, নির্মাল্য, বিশাখা, অরণি আর সুছন্দা। গার্গী একটুও ইতস্তত না করে ঢুকে গেল ঘরটিতে, যেন এখনও 'আশ্রয়'ই তার চাকুরিস্থল। তার উপস্থিতি সবাই মেনেও নিল নিঃশব্দে।

নিবেদিতার গলাই তখন বেশ উঁচুতে। বহুক্ষণ ধরে চিৎকার চেঁচামেচি করায় তার সমস্ত শরীরে তখন উত্তেজনা। ফাদার তাকে শান্ত করতে বলছেন, অযথা রাগ দেখিও না, নিবেদিতা। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট একেবারে নতুন। এখানকার পাল্‌স্ তিনি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু তিনি যে অ্যাকশন নিয়েছেন তা 'আশ্রয়'-এর ভালর জন্যই।

—সবটাই ভালর জন্য বলতে চাইছেন! আপনি কি জানেন, প্রতিদিন সন্ধের পর তিনি একবার করে কম্পাউণ্ডের বাইরে যান! বাইরে গিয়ে তিনি কাছের পি সি ও-বুথ থেকে কাউকে টেলিফোন করছেন রোজ! আমার ধারণা এখানকার ঘটনাপঞ্জী কাউকে প্রতিদিন জানাচ্ছেন বিস্তারিতভাবে।

শতভিষা রায়ের ফর্সা, গোল ছাঁদের মুখ লাল হয়ে উঠল এই আচমকা আক্রমণে। ফুঁসে উঠে বললেন, ইট'স আ ড্যাম লাই। কে বলল আমি কাউকে রিপোর্ট করতেই বাইরে গিয়ে ফোন করি। পার্সোনাল ফোন বলেই বাইরে যাই, অফিসের ফোন ব্যবহার করি না।

নিবেদিতা গলায় জোর এনে বলল, কিন্তু আপনি রোজ লালবাজারে ফোন করেন কেন!

—লালবাজারে! শর্তভিষা রায় যেন নক্ষত্র থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন, মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা! নিবেদিতা তার হাতব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটা টুকরো কাগজ বার করল, এই দেখুন। এগুলো বুথ থেকে এনেছি। প্রতিদিন রাত আটটার পর আপনি সামনের বুথে গিয়ে যে-নম্বরে ফোন করেন তা লেখা আছে স্লিপগুলোয়। কম্পিউটার তো আর মিথ্যে কথা বলবে না।

টিচার্সরুমের ভেতর কিছুক্ষণ বরফশীতল স্তব্ধতা। ফাদারও হতভম্ব! কিছুক্ষণের জন্য চুপসে গেলেন শতভিষা রায়ও। পরক্ষণে বললেন, এই স্লিপগুলোতে কি লেখা আছে আমার নাম! কার না কার স্লিপ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। ইচ্ছে করেই আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যাতে আমি এখানে থাকতে না পারি। নিশ্চয়ই কারও ভেস্টেড ইন্টারেস্টে ঘা লাগছে। তাইই—

এতক্ষণের তর্কবিতর্কের পূর্বাপর কিছুই জানে না গার্গী, তাই বুঝে উঠতে পারল না শতভিষা রায়ের বিরুদ্ধে নিবেদিতা ছাড়া আর কে কে অভিযোগ করেছে, করলে কী ধরনের অভিযোগ।

তুমুল চেঁচামেচির মধ্যে নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে তাতে নিজেকে ন্যস্ত করে গার্গী। চোখ কান খোলা রেখে বুঝে উঠতে চাইছে টানাপোড়েনের গতিপ্রকৃতি। নিবেদিতা কোনও একদিন তাকে বলেছিল সে নিজেই লক্ষ রাখছে কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে! কার কী উদ্দেশ্য এখানে। সেই কারণেই কি শতভিষা রায়ের ওপর তার গোয়েন্দাগিরি!

হোস্টেলের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শতভিষা রায়ের দিকেই তীক্ষ্ণ নজর ফেলছিল গার্গী। নতুন আগন্তুক ক'দিনের মধ্যে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছেন এখানে। খুব ফর্সা রং, নাকটা বেশ চোখা, চোখ দুটোয় চঞ্চল চাউনি। গার্গী ঘরে ঢুকতে তাকেও বেশ কড়া নজরে দেখে নিলেন কয়েকবার। কিন্তু নিবেদিতার দিকে তাকাচ্ছেন প্রায় দুর্বাসা-চোখে। নিবেদিতা প্রবল উত্তেজিত বলেই বোধহয় এখনও ভস্ম হয়নি।

ফাদার অবশ্য চাইছেন দুজনের অভিযোগ পর্ব শেষ হলে অতঃপর একটা মিটমাট করার। বেশ কয়েকদিন পর ফাদারকে দেখে বেশ কষ্টই হল গার্গীর। সেই আগের দাপট আর একটুও নেই। আগেকার দিন হলে এতক্ষণে খুবই ধমকাধমকি করতেন দুজনকে। অথচ আজ চাইছেন সালিসি করতে, স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন, দ্যাখো, দুজনে একই প্রতিষ্ঠানে থাকো, দু'জনেরই মূল লক্ষ্য এক—'আশ্রয়'-এর মঙ্গল করা। এখন যদি নিজেদের মধ্যে এ ভাবে ঝগড়া করো, তা হলে চারদিকে আরও দুর্নাম ছড়াবে এই প্রতিষ্ঠানের। তাতে ক্ষতির মধ্যে ক্ষতি তোমাদের সবাইকার রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। উঠে যাবে এতদিন ধরে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটা।

একটু পরেই গড়াপেটার মতো করে ঝামেলাটা আপাতত চুকিয়ে দিলেন ফাদার। বাইরে এসেও কেমন অন্যমনস্ক, চুপচাপ। হাঁটছিলেন একাই। গার্গীকে সামনে দেখে বললেন, বুঝলে। 'আশ্রয়' বোধহয় আর টিকল না।

—কেন, ফাদার? এখন তো এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব কড়াকড়ি হয়েছে শুনলাম।

ফাদার খুশি হয়ে বললেন, সেই কারণেই তো শতভিষাকে বেশি মাইনে দিয়ে এখানে আনলাম। নইলে যে-অর্গানাইজেশনে ও ছিল, সেখানকার ম্যানেজমেন্ট ওকে ছাড়তেই চায়নি। গার্গী কৌতূহলী হয়ে পড়ল শতভিষা রায়ের বায়োডাটা জানতে। একটু আগেই নিবেদিতা অভিযোগ করছিল উনি নাকি সন্ধের পর এখানকার ঘটনাপুঞ্জ কাউকে গোপনে রিপোর্ট করেন। সেটা যে লালবাজারে তাও স্পষ্ট করতে চাইছিল। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। আরও একটু খোলসা করে জানা দরকার সবটা। বলতে বলতে টুক করে জিজ্ঞাসা করে, আপনার চয়েস যখন, নিশ্চয়ই সি ইজ অ্যা গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কোথায় ছিলেন এর আগে।

—একটা নামী গার্লস-কলেজের হোস্টেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন অনেক দিন। সে চাকরি ছেড়ে সম্প্রতি জয়েন করেছিলেন একটা প্রাইভেট ইনটেলিজেন্স ব্যুরোতে।

—ইনটেলিজেন্স ব্যুরো! গার্গী আশ্চর্য হয়।

—হ্যাঁ। শতভিষার পাওয়ার অব অবজারভেসন সাংঘাতিক রকমের ভাল। আজকাল বিভিন্ন কোম্পানি তাদের ভিতরকার নানান গোলমাল, স্যাবোটেজ ইত্যাদি নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়ে। তারা এ ধরনের প্রাইভেট ইনটেলিজেন্টস ব্যুরোর সাহায্য নেয় ঝামেলা থেকে উদ্ধার পেতে। শতভিষা নাকি এর মধ্যে বেশ কয়েকটা কোম্পানিকে বাঁচিয়েছে তাদের ইন্টারনাল গোলমালের হাত থেকে। কিন্তু এইসব ইনটেলিজেন্স ব্যুরোতে কাজ করার রিস্ক অনেক। তাই ছাড়তে চাইছিল চাকরিটা। এখানকার গোলমালের কথা শুনে নিজেই একদিন ফোন করে বলল, সমস্যা মিটিয়ে দেব।

গার্গী খুব আশ্চর্য হচ্ছিল শতভিষা রায়ের পরিচয় শুনে। একই সঙ্গে হোস্টেল পরিচালনা ও ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় এই মহিলাই 'আশ্রয়'-এর পক্ষে

সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট। ফাদার তাহলে অনেক হিসেব কষে শতভিষা রায়কে এখানে চাকরি দিয়েছেন। কিন্তু তাহলে নিবেদিতা কেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। শতভিষা রায় এখানে থাকলে তার কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে। না কি কাউকে বাঁচাতে চাইছে। এখানকার দুর্ঘটনাপঞ্জীতে নিবেদিতারও হাত থাকতে পারে এমন সন্দেহ তো এখনও করে থাকেন কেউ কেউ? ব্যাপারটা তাহলে সত্যিই ধাঁধার।

তবে শতভিষা রায় যদি সত্যিই এমন অভিজ্ঞতার অধিকারিণী হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করা দরকার গার্গীর। তবে তা আজ না হলেও চলবে। শতভিষা রায় এখানকার সমস্যার ভেতর দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। ক'দিনেই জেনে যেতে পারবেন প্রতিষ্ঠানের আসল টানাপোড়েন কোথায়। তখন একদিন ওঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় জেনে নিতে হবে সমস্যাটার মূল।

স্কুল-বিল্ডিং থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফাদারের সঙ্গে তাঁর অফিস-চেম্বারে গিয়ে পৌঁছল গার্গী। ফাদারের কাছে তার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। একটু নিরিবিলি পেলে কয়েকটা প্রশ্ন রাখবে তাঁর কাছে। ফাদার কী উত্তর দেন সেটাই তার দেখার। প্রশ্নগুলো একরকম ঃ এক, 'আশ্রয়'-এ এত এত দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আজ পর্যন্ত কম্পাউণ্ডের ভেতর অথবা বাইরে কোনও পুলিশ পোস্টিং হল না কেন? ফাদার নিজেই নাকি নিষেধ করেছেন পুলিশকে। করলে কেন? দুই দুর্ঘটনার পেছনে কার বা কাদের হাত থাকতে পারে তা জানিয়ে পুলিশের কাছে কেনও গোপন রিপোর্ট দিয়েছেন কি না। তিন, 'আশ্রয়'-এর আর্থিক অবস্থা কীরকম? শোনা যায় এ পর্যন্ত বহু টাকা পেয়েছেন ফাদার দান হিসেবে। সেই কারণে কারও গাত্রদাহ শুরু হয়েছে কি না? চার, যার যা যাদের গাফিলতিতে এই ঘটনাগুলো পর পর ঘটেছে, তাদের কাছে এ পর্যন্ত কোনও কৈফিয়ত তলব করেছেন কি না ফাদার। করলে কোনও সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছেন কি না। কৈফিয়ত তলব না করলে কেনই বা করেননি?

কিন্তু ভাবনাটাই সার হল গার্গীর। ফাদার তাঁর চেম্বারে বসতে না বসতেই একজন গাঁয়ের লোক কোত্থেকে হাজির হল গুটি গুটি পায়ে। পরনে ময়লা জামা-কাপড়। চাউনি বোকা বোকা। হাত জোড় করে বলল, বাবু, আপনি আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন।

ফাদারকে সহসা বিব্রত দেখাল, আজ আসতে বলেছিলাম। তাই নাকি। ও হো, বেমালুম ভুলে গেছি ব্যাপারটা। অবশ্য মাঝখানে আমি অন্য একটা কাজের জন্য ফোন করেছিলাম শ্রীরাধাকে। বলল, শ্রীরাধাই এখন মুম্বইতে নেই, বাইরে গেছেন।

—বাইরে! গাঁয়ের মানুষটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ফাদারের দিকে।

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম আমেরিকায় কী একটা শো আছে। সেখানে মুম্বই থেকে অনেকে যাবেন। সবই ফিল্মলাইনের। আপনি এক কাজ করুন। সামনের মাসের মাঝামাঝি একবার আসুন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে ওদের। রিয়ার সঙ্গে যাতে আপনাদের দেখা করিয়ে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করব খুব। তখন আপনারাই রিয়াকে জিজ্ঞাসা করবেন মুম্বইয়ের যে কনভেন্টে পড়াশুনো করছে সেখানেই পড়বে, না কি আপনাদের গাঁয়ে গিয়ে বাস করবে। কী বলুন, রবীনবাবু?

রবীনবাবু নামের মানুষটি স্পষ্টতই বুঝে উঠতে পারলেন না ব্যাপারটা। কলকাতায় এত সব বৈভবের মাঝখানে এসে পৌঁছলে তাদের বুদ্ধি সুদ্ধি আরও লোপ পেয়ে যায় বোধ হয়। বললেন, আজ্ঞে, গাঁ থেকে এত দূরে আসা-যাওয়া করতেও তো অনেক খরচ। আমরা গরিব মানুষ। কত খরচ করে এলাম।

—ঠিকই তো, ফাদার তৎক্ষণাৎ তাঁর পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলেন রবীনবাবুর দিকে, আপনি এই টাকাটা রাখুন। আমিই যখন আপনাকে আজ আসার জন্য বলেছিলাম, আপনার যাতায়াতের ভাড়াটা আমারই দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, তাহলে সামনের মাসে—

একশো টাকার একটা নোট হাতে পেতে রবীনবাবু নামের মানুষটা আর কথা বাড়ালেন না। তিনি চেম্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই ফাদার তাকালেন গার্গীর দিকে, বুঝতে পেরেছ, কী ফ্যাসাদে পড়েছি। ও রিয়ার কেউ হয় না। শুধুমাত্র একই গাঁয়ের লোক। এখন কার মুখে খবর পেয়েছে রিয়া 'আশ্রয়'-এ থাকে না। মুম্বইয়ে থাকে। অতএব ওদের এক্ষুনি তাকে এনে দেখাতে হবে। বোঝ আবদার। আমি যে মেয়েটাকে চারবছর রাখলাম, খাওয়ালাম পরালাম, তাকে উপযুক্ত জায়গায় পাঠালাম যাতে তার জীবনযাপনটাই বদলে যায়, সে কথা এখন ওরা বুঝতে চাইছে না।

গার্গী চিন্তিত মুখে বলল, শ্রীরাধাকে জানিয়েছেন ব্যাপারটা?

—না। জানাতে পারলাম কোথায়! সি ইজ অ্যা বিজি লেডি! কখন বাড়ি থাকে, কখন স্টুডিওতে যায়, কখন আউটডোরে যায় তার কি ঠিক আছে। আর আজকাল প্রোডিউসাররাও হয়েছে তেমনই। আউটডোরে যাওয়া মানে হয় সুইজারল্যাণ্ড, না হয় ফ্রান্স, না হয় ইটালি। ফিল্মের হিরোইনকে তার বাড়িতে পাওয়া মানে ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতো দুর্লভ ঘটনা।

গার্গী ঝট করে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, শিরিনের বাবা-মাও তো এসেছিলেন শুনলাম তাঁদের মেয়েকে নিতে।

—হ্যাঁ। তারাও তো নাছোড়বান্দা। আমি তো ডিসুজাকে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলাম শিরিনকে আনতে। তারপর তো জানই তুলিকার মিস্‌হ্যাপটা হয়ে গেল। দিল্লিতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসতে হল, শিরিনকে আনতে পারলাম না।

—ওরা আর আসেনি?

—আসেনি আবার! এসেই তো গল্প শোনায় কত টাকা খরচ হচ্ছে জেলা থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতে। সেদিনও দুশো টাকা নিয়ে গেছে। আমার তো হয়েছে গেরো। সোস্যাল ওয়ার্ক করতে নেমে এখন হাতে হেরিকেন। কবে যে এর হাত থেকে মুক্তি পাব তার ঠিক নেই।

গার্গী তখন নিজেকে প্রস্তুত করছে ঠিক এরকম মোক্ষম সময়ে ফাদারের সামনে প্রশ্নগুলো কীভাবে রাখবে। সে সময় হঠাৎ চেম্বারে ঢুকে পড়লেন শতভিষা রায়। গার্গীকে তখনও ফাদারের সামনে বসে থাকতে দেখে তাঁর ভুরুতে ফুটে উঠল একটি মস্ত জিজ্ঞাসাচিহ্ন। ভাবলেন কেন এই তরুণী এখনও বসে।

ফাদার অবশ্য তখনই আলাপ করিয়ে দিলেন দু'জনের। তাতেও শতভিষা রায়ের অভিব্যক্তি তেমন প্রসন্ন হল না। বোধহয় ফাদারের সঙ্গে তখনই তাঁর কিছু কথা একান্তে বলার দরকার, গার্গী বসে থাকলে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলতে পারবেন না শতভিষা।

কী আর করে গার্গী। তারও তো কিছু প্রশ্ন ছিল ফাদারের কাছে। কিন্তু সে একেবারেই বাইরের লোক। তার দরকার আর শতভিষা রায়ের প্রয়োজনে বিস্তর ফারাক। শতভিষার কাজটাই এ ক্ষেত্রে ফাদারের কাছে বেশি জরুরি। ব্যাপারটা বুঝে ফেলে গার্গী ঝট করে উঠে দাঁড়াল, আজ চললাম, ফাদার। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা ছিল। কিন্তু সেটা সময়-সাপেক্ষ। পরে একদিন আসব।

—আমার সঙ্গে! ফাদার অবশ্য অবাক হলেন।

—হ্যাঁ। নিতান্তই ব্যক্তিগত। দু-একদিন পরে হলেও অসুবিধে নেই। আমি পরে ফোন করে আসব।

—অবশ্যই। ফাদার তাকে বিদায় জানিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শতভিষা রায়ের সঙ্গে কথা বলতে। গার্গী বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে অনুভব করল সুন্দরী মহিলাটি কয়েক দিনের মধ্যেই ফাদারের গুডবুকে ঢুকে পড়েছেন। ফাদার বোধহয় এই টালমাটাল সময়ে নির্ভর করতে চাইছেন শতভিষার ওপর। হয়তো আর কেউ তাঁর কাছের লোক নেই। যার ওপর নির্ভর করতেন সেই তুলিকা না থাকায় আরও বেশি ঝুঁকে পড়ছেন নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্টের দক্ষতার দিকে। হয়তো মহিলা সত্যিই কাজের।

তবু ফাদারের এই শতভিষা-এপিসোডটি আপাতত গার্গীর কাছে একটি ছোট্ট রহস্য।

সে-রহস্য আরও ঘোরতরভাবে দানা বাঁধল কয়েক দিনের মধ্যে। নিবেদিতার কাছ থেকে মাঝে মধ্যে ফোন পেয়ে গার্গী অবহিত হল দুটি জরুরি তথ্য। শতভিষা রায়কে যাতে বাইরে গিয়ে গোপনে ফোন করতে না হয় তার জন্য হোস্টেলে শতভিষা রায়ের ঘরেই একটি নতুন ফোন এনে দিয়েছেন ফাদার। শুধু তাই নয়, 'কার রেন্টাল' থেকে একটি মারুতি গাড়িও আসে শতভিষার জন্য। শতভিষা হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে যান কোথায় না কোথায়—তার হদিশ কেউ রাখে না। সারা 'আশ্রয়'-এ সে কারণে কানাকানি-ফিসফিসানি চলছে, কিন্তু ফাদারের তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর অপেক্ষা করছিল গার্গীর জন্য। হঠাৎ একদিন জানতে পারল, ফাদার বেরিয়েছিলেন কোনও কাজে। ফেরার পথে নেমেছিলেন বেকবাগানের মোড়ে। একটা দোকানের দিকে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি কোত্থেকে ফুঁড়ে বেরুল তাঁর সামনে, একটা হাত বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। হাতে একটা চকচকে রিভলভার। সেই অচেনা আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ফাদার। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলিটা। বুকে না লেগে লেগেছে তাঁর বাঁ হাতে। তক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করে বার করা হয়েছে গুলিটা। আপাতত বিপদ মুক্ত। কিন্তু ভীষণ শক পেয়েছেন ফাদার।

অন্য সবাইকার মতো গার্গীও বিস্মিত হয়ে ভাবছিল কে ছুড়তে পারে গুলিটা! কেনই বা!

## ॥ ২৬ ॥

ফাদার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন খবর পেয়ে গার্গী তার হাতের সব কাজ ফেলে তড়িঘড়ি ছুটল 'আশ্রয়'-এর উদ্দেশে। তার ভাবনার ছকটা কেউ যেন অলক্ষে হেসে উল্টে দিয়েছে। গ্যালন-গ্যালন দুশ্চিন্তায় এখন হাবিডুবি। সমুদ্রনীলের হেপাজতে অন্তত তিনটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে তিনটি সূত্রে। প্রথমে রেস্তরাঁয় চৈতালির সঙ্গে, তারপর সমুদ্রনীলের দেখা পাওয়া গেছে তার মেসে বীথির সঙ্গে, শেষে বাসের জানালায় রাইয়ের সঙ্গে। এর মধ্যে ফাদার কেন গুলিবিদ্ধ হলেন, কার রোষের শিকার হলেন সেটাই এক প্রশ্নচিহ্ন। পাঁচটি কিশোরীর বিনিময়ে

সমুদ্রনীল যদি ত্রিস্তাকে মুক্ত করে ফেলে থাকে, তবে তার আর ফাদারের ওপর ক্রোধ বা ক্ষোভ পুষে রাখার কথা নয়।

তড়িঘড়ি 'আশ্রয়'-এ পৌঁছে গার্গী দেখল, পরিস্থিতি আরও ভীতিপ্রদ। দুই আঙ্কেলের কেউই শব্দটি বার করছেন না মুখ থেকে। তত্ত্বাবধায়করা আতঙ্কিত। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে হোস্টেলের সবুজরাও। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না এই গভীর সংকটে তারই বা কী ভূমিকা এখানে। গোয়েন্দার, না পরিত্রাতার। পুলিশের একটি বড় দল ঘুরে গেছে, একে-ওকে জিজ্ঞাসার পর ডি-সি-ডি-ডি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একটা পুলিশ ক্যাম্প এবার না বসালেই নয়। ক্যাম্পটা বসবে প্রধান ফটকের ঠিক মুখে, যতদিন না এখানকার সংকটের কোনও ফয়সালা হয়। তারপর আরও কী ঘটবে, বা ঘটতে পারে তার কিছুই আর অনুমানে কুলোচ্ছে না। ফাদারকে জিজ্ঞাসা করেও নাকি কোনও প্রাঞ্জল উত্তর পাওয়া যায়নি। ফাদার শুধু বলেছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না কারা এ-কাণ্ড করেছে। এরা হয়তো সেই দুর্বৃত্তের দল যাবা আমার এত স্বপ্ন দিয়ে গড়া প্রতিষ্ঠানটা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। আমি পুলিশকে বারবার জানাচ্ছি আপনারা প্রতিষ্ঠানটা রক্ষা করুন। তাতে পুলিশি তৎপরতা জোরদার হওয়ায় এখন নিশ্চয় তাদের সব রাগ আমার ওপর। আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে নিষ্কন্টক হতে পারে তাদের উদ্দেশ্য।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে অদূরে একটা বড় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ফাদারকে। অপারেশন করে গুলিটা বার করার পর আপাতত সুস্থ। পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বলেছেন আজ সকালে। কিন্তু কেন তার ওপর এ-ধরনের আক্রমণ হল তার সঠিক কারণ সম্পর্কে তিনিও খুব নিশ্চিত নন একথা জানার পর গার্গী ভাবছিল সে নিজে একবার ফাদারের কাছে যাবে। ফাদারকে তার অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ছিল, কিন্তু এই দুর্ঘটনার মধ্যে সে সব আলোচনা তো করা যাবে না। বরং বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করবে।

'আশ্রয়'-এর তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলার পর গার্গী দ্রুত চলে এল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পেরিয়ে নামী নার্সিংহোমটার কাছে। দু জন কনস্টেবলের সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে সামনের চাতালটায়। তাদের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি ছুড়ে রিসেপশনের মুখোমুখি হল গার্গী, বলল, ফাদার ইন্দ্রনীল বটব্যালের সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।

—জরুরি! কিন্তু তাঁর সঙ্গে কারও দেখা করার তো অর্ডার নেই। ওপরে তাঁর কেবিনের সামনেও পুলিশ পোস্টিং করা আছে।

—কিন্তু আমার নামটা একবার ওঁকে জানাবেন? শুনলে নিশ্চয়ই—

—কী নাম? রিসেপশনিস্ট সন্দেহ সন্দেহ চোখে তাকায়।

—বলবেন, গার্গী চৌধুরি।

রিসেপশনিস্ট যুবক মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, ফাদারের সঙ্গে কোনও ক্রমেই দেখা হবে না।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গার্গী তার হাতের ব্যাগটি থেকে বার করল এক টুকরো চিরকুট। তাতে বড় বড় অক্ষরে লিখল, 'উইশ ইউ কুইক রিকভারি। গার্গী'। রিসেপশনের যুবকটিকে অনুরোধ জানাল, তার চিরকুটটা যেন যথাসময়ে ফাদার সমীপে পৌঁছে দেওয়া হয়।

কিছুটা হতাশ, কিছুটা দুশ্চিন্তিত মুখে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠবে, সে সময় 'হাই ডার্লিং' বলে কার হেঁড়ে গলা শুনতেই চমকে ওঠে। হুঁ, এ কণ্ঠস্বর আলফ্রেড ডিসুজার না হয়ে

যায় না। আজও পরনে নীল আঁটোসাটো গেঞ্জি আর বত্রিশটা পকেটআলা জিনসের ঢোল প্যান্ট। মাথায় সবুজ ফেল্টের টুপি। কাঁধে ভারী ব্যাগ। পাছে তার থাবার মতো হাতে গার্গীর নরম হাতটা নিয়ে পেঁষাপিষি করেন এই ভয়ে গার্গী দু'হাত তুলে নমস্কার করে, ফাদারের সঙ্গে দেখা হল? আমাকে তো ঢুকতেই দিল না। আলফ্রেড ডিসুজা ম্লান মুখে মাথা ঝাঁকালেন নো, নো, দে ডিডন'ট অ্যালাউ মি অলসো। কতবার বললাম ভুভারতে ওই বেচারির নিজের বলতে কেউই নেই। আই অ্যাম হিজ বেস্ট ফ্রেণ্ড। আমাকে দেখা করতে দিতেই হবে। কিন্তু দোজ ফুলিশ পুলিশেস পেইড নো হিড টু মাই ওয়ার্ডস। অল ওয়ার্থলেস।

আলফ্রেড ডিসুজার মুখটা সহসা বরফ কঠিন হয়ে উঠল তা গার্গীর নজর এড়াল না। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে গার্গী বলল, কী আর করা যাবে বলুন। পুলিশ তার ডিউটি করছে। নিশ্চয়ই ওদের বড় সাহেবরা সেরকমই হুকুম দিয়েছেন ওদের ওপর।

—কিন্তু তাই বলে নিয়ার রিলেটিভ্‌দেরও এন্ট্রি দেবে না? ওর তো কিছু দরকারও থাকতে পারে আমাদের সঙ্গে। আমি, তুমি—সবাই তো ওর ওয়েল উইশার, তাই না? ইংলণ্ডে থাকতে আমিই তো ওর ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড ছিলাম। এখনও আমি যা বলি, তা-ই শোনে

গার্গী কিছুক্ষণ আলফ্রেড ডিসুজাকে স্থির চোখে নিরীক্ষণ করে বলল, চলুন ডিসুজা, এখানে এসে আমাদের কারও উদ্দেশ্যই যখন সফল হল না, কোথাও একটু বসে কফি খাই। কফি খেতে খেতে কিছু টুকটাক কথাও বলে নিই দু'জনে।

—ও, শিওর, আলফ্রেড ডিসুজাকে ভারি উল্লসিত দেখাল গার্গীর এই আকস্মিক প্রস্তাবে। মহিলাদের ওপর গোয়ানিজ লোকটির যে ভয়ঙ্কর দুর্বলতা আছে তা তার গত কয়েকদিনের চাউনি, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি দেখে বুঝতে বাকি নেই গার্গীর। এখন কফির টেবিলে লোকটিকে আয়ত্তে এনে একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

ফাঁড়ির আশেপাশে কিছুক্ষণ টহল দিয়ে গার্গী খুঁজে বার করল একটি আটপৌরে চেহারার কফিঘর। দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে রঙিন সানমাইকা লাগানো টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি হল দু'জনে। আলফ্রেড ডিসুজা তাঁর সাদা দাড়িগোঁফের জঙ্গলে মাখিয়ে রেখেছেন কয়েক চামচ টেনসন, তারপর বলো, ডার্লিং. কী যেন বলবে বলছিলে?

আলফ্রেড ডিসুজার সম্বোধনে খুব পরিবর্তন লক্ষ করছিল গার্গী। কিন্তু তাতে তেমন আমল দিতে চাইছে না এই মুহূর্তে। তার এখন দরকার পুরনো আমলের কিছু খবর। পুরনো বলতে তেমন পুরনো নয় যদিও। কফি অবশ্য পৌঁছে গেল দু-চার মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যেই। যেন কফি না পৌঁছলে তার প্রশ্নমালা গাঁথতে পারছিল না গার্গী।

—আচ্ছা, মিঃ ডিসুজা, আপনি তো সেবার বলেছিলেন, ফাদার ইংল্যাণ্ডে থাকতে একজন মারাঠি ডিভোর্সি যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি ফাদারের কাছে, মানে ইন্দ্রনীল বটব্যালের কাছে বেশিদিন থাকেনি। তাই তো?

—এক্স্যাক্টলি।

—সেই মেয়েটি তারপর কার খপ্পরে পড়ল তা কি আপনার জানা আছে, কিংবা তারা এখন কোথায় থাকেন?

আলফ্রেড ডিসুজা যে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন তা বোঝা গেল তাঁর চোখের নীচে কিছু কোঁচ পড়তে, ও সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল, ডার্লিং, পাস্ট ইজ পাস্ট। লেট আস থিঙ্ক দ্য ফিউচার। বটব্যালের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ও একেবারে ভুলে যেতে চায় সেই দিনগুলোর কথা।

—ভুলে যাওয়াই অবশ্য উচিত, গার্গী নিজের মনে বিড়বিড় করল, তবে কি জানেন মিঃ ডিসুজা, কাল রাতে আমার হাজব্যাণ্ড ফোন করেছিল লণ্ডন থেকে। আমি ওকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম ঠিকানাটা কার তা খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে। ফোন করে বলল, ওই বাড়িতেই এক সময় ইন্দ্রনীল বটব্যাল বসবাস করতেন। সেই বাড়ির ল্যাণ্ডলেডি এখন বৃদ্ধা। চোখে প্রায় দেখতেই পান না, কিন্তু কানদুটো সদা সতর্ক। খোঁজ খবর নিতে গিয়ে আমার হাজব্যাণ্ড সায়ন চৌধুরির আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে। খুব চমৎকার মহিলা। ভারী ইমোশনাল। ইন্দ্রনীল বটব্যালের কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসছিল তাঁর। বলেছেন ফাদার যে-মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন, যে পরে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে, সেই মেয়েটির নাকি আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আলফ্রেড ডিসুজা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ঠিকানা আপনি কোত্থেকে পেলেন?

ডিসুজার হঠাৎ তুমি সম্বোধন করা, আবার আপনিতে ফিরে যাওয়ায় ভারী কৌতুক বোধ করল গার্গী। হেসে বলল, ঠিকানাটা সেদিন প্রায় উড়ে এসে পড়েছিল আমার গাড়ির সিটে। বলা যায় অলৌকিকভাবে।

—উড়ে এসে। ডিসুজা সামান্য বিভ্রান্ত।

—হ্যাঁ। জাস্ট লাইক অ্যা ফ্লাইং সসার। যাই হোক, আপনি কি মেয়েটির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জানতেন?

ভারী শরীরের ডিসুজার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস, হ্যাঁ। আমরাও শুনেছিলাম মেয়েটি মিসিং।

—ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন, ডিসুজা? খুব কৌতূহল হচ্ছে শুনতে।

—কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আমিও যে পুরো ঘটনাটা জানি তাও নয়। আসলে দ্যাট উওম্যান ওয়াজ অ্যা ব্যাড এলিমেন্ট। সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না ভেরি স্লিপারি। ডিভোর্সি মেয়েটিকে বিয়ে করে বটব্যাল ওয়াজ নট হ্যাপি। ওকে আমি বারবার বারণ করেছিলাম, আমার কথা শোনেনি। এক বছরও টেঁকেনি ওদের বিয়েটা। তার আগেই আর এক জনের সঙ্গে কেটে পড়ল, তারপর অবশ্য তার খবর রাখতে আমি বা বটব্যাল কেউই আর আগ্রহী ছিলাম না। পরে শুনেছিলাম যার খপ্পরে পড়েছিল, সেও বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ওয়ান ফাইন মর্নিং সেই মেয়েটা আবার কোথাও বোধহয় চলে গিয়েছিল।

—বোধহয় মানে!

—মানে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল কার সঙ্গে গেল কিছুই জানা যায়নি আর। সবাই ধরে নিয়েছিল এ সব স্লিপারি চিঁড়িয়া আবার কারও সঙ্গে উড়ে গেছে।

—যার কাছ থেকে চলে গেল, তিনিও আর খোঁজখবর করেননি তাঁর স্ত্রী কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল!

—স্ত্রী! হো হো করে হাসলেন ডিসুজা। এরা তো কারও স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য জন্মায় না। শুনেছিলাম মেয়েটির ওইরকমই অদ্ভুত নেশা। প্রতি বছর স্বামী বদল করা।

—তাই। খুব মিস্টেরিয়াস ক্যারেকটারের তো! কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না এ নিয়ে কোনও হইচই হয়নি?

—শুনেছিলাম তার লাস্ট হাজব্যাণ্ড, মানে যার কাছ থেকে সে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে থানায় ডায়েরি করেছিল যে তার বউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—ব্যস।

—হ্যাঁ। পুলিশ হয়তো খোঁজাখুঁজি করেছিল, তারপর খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

গার্গী অবাক হয়ে বলল. একটা জলজ্যান্ত মেয়ে ইংলণ্ডের মতো দেশ থেকে রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেল তাও কি সম্ভব?

ডিসুজার কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটা হাই তুলে বলল, ব্যাপারটা খুব মিস্টেরিয়াস শুধু এটুকুই বলতে পারি।

—আপনি কি জানেন, ইংলণ্ডের পুলিশ নাকি কোনও একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে সেই মেয়েটার মিসিং হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আবার নতুন করে ইনভেস্টিগেশন শুরু হচ্ছে।

—ইজ ইট! আলফ্রেড ডিসুজা হঠাৎ কোনও উড়ন্ত বিমান থেকে প্যারাসুট সহযোগে যেন লাফ দিয়ে নামলেন গার্গীর সামনে, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

কব্জির ঘড়িতে চোখ রেখে ডিসুজা ততক্ষণে উঠে পড়েছেন টেবিল থেকে। বিলটা অবশ্য গার্গীই মেটাল, কেননা সে-ই তো কফির আমন্ত্রণটা জানিয়েছিল। গার্গীর প্রশ্নপর্ব অবশ্য তখনও শেষ হয়নি। বাইরে বেরিয়েই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ডিসুজা, আপনি কি বিলাস সান্যাল নামের কাউকে চেনেন?

—বিলাস সানিয়েল। আলফ্রেড ডিসুজা অবাক-অবাক চোখ করে তাকালেন গার্গীর দিকে, হু ইজ দ্যাট চ্যাপ! ইজ হি এনি ভি আই পি?

—হি ইজ অ্যা গ্রেট ম্যান. গার্গী হাসি হাসি মুখ করে তাকাল. চেনেন, না চেনেন না?

—না, চিনি না তো। কোথায় থাকেন? কী করেন? তিনি কি আমার প্রজেক্টের কাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক!

—না, তা বলতে পারব না। তবে শুনেছি তিনি একসময় ইংলণ্ডে থাকতেন। একটা মহিলা-সংক্রান্ত স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে পড়েছিলেন সে সময়।

—তাই নাকি! তারপর?

—শুধু তাই নয়। একটা ব্যাঙ্ক ফ্রড-এর ব্যাপারেও তাকে খুঁজছে ওখানকার পুলিশ।

—হোয়াট! আলফ্রেড ডিসুজাকে এতক্ষণ খুবই নির্বিকার, উত্তেজনাহীন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ এত জোরে 'হোয়াট' শব্দটি উচ্চারণ করলেন যে চমকে উঠল গার্গী। ইংলণ্ডের পুলিশ বিলাস সান্যালকে যদি খোঁজেও, তাহলে ডিসুজার এত চমকে ওঠার কী আছে? যে বিলাস সান্যালকে ডিসুজা আদৌ চেনেন না, তাকে খোঁজার কারণে ওই গোয়ানিজ লোকটির এত বিচলিত হয়ে পড়াটা কি ঠিক! তা ছাড়া সায়নের কাছ থেকে যেটুকু খবর এখনও পর্যন্ত পেয়েছে, তাতে ব্যাঙ্ক-জালিয়াতির দায়ে যে-ভারতীয়টিকে খুঁজছে ইংলণ্ডের পুলিশ, তিনি যে বিলাস সান্যালই তা সায়ন পরিষ্কার করে বলতে পারেনি। গার্গীই বর্ণনা শুনে আন্দাজ করছে জালিয়াত লোকটি হয়তো বা বিলাস সান্যাল।

আলফ্রেড ডিসুজাকে অমন উত্তেজিত হতে দেখে গার্গী একটু চেপে ধরতে চাইল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বিলাস সান্যালকে আপনি চেনেন, মিঃ ডিসুজা?

—নো, নো, অ্যাবসলিউটলি নট, বেশ জোরে জোরে ঘাড় ঝাঁকাতে শুরু করলেন ডিসুজা। তাতে তাঁর সাদা দাড়িগোঁফের জঙ্গলও যেন কেউ ঝাঁকাচ্ছে জোর করে।

গার্গী হেসে বলল, সত্যিই চেনেন না?

আলফ্রেড ডিসুজা এবার বেশ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করলেন। সাধারণত খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের এবং খুবই বুদ্ধিমান গোয়ানিজ চরিত্রটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট।

গার্গী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডিসুজার অমন ক্রুদ্ধ মূর্তি সে কখনও দেখেনি। তাকে শান্ত করতে বলল, অকারণে কেন উত্তেজিত হচ্ছেন। আসলে আপনাকে একটু টিজ করে দেখছিলাম আপনি সত্যিই রেগে ওঠেন কিনা। আপনাকে কখনও রাগতে দেখিনি তো। তাইই—

গার্গীর হিউমার মিশ্রিত বাক্যবাণে অমনি বিদ্ধ হলেন আলফ্রেড ডিসুজা, ইউ নটি গার্ল। আমাকে টিজ করা হচ্ছে! ঠিক আছে, পরে নিশ্চয়ই তোমাকে কোনও শাস্তি দেব। আপাতত একটা পুরস্কার দিই। বলে একগাল হেসে তাঁর ঢাউস ব্যাগটি থেকে বার করলেন একটা ছোট্ট কেক, নাও। দিস ইজ ইয়োর রিওয়ার্ড। আমাকে কেউ এভাবে সত্যিই রাগাতে পারেনি। ক্রোধ হল মানুষের অন্যতম শত্রু, যে-শত্রু মানুষের ওপর ভর করলে তার বুদ্ধিনাশ হয়। ভুল হয়ে যায় সিদ্ধান্ত নিতে। যাইহোক, তাহলে এখন আর সময় নষ্ট না করে বরং কাল সকালে একবার আসা যাবে। তখন নিশ্চয়ই বটব্যালের সঙ্গে দেখা করতে দেবে, কী বলো?

ডিসুজা তার বিশাল গাড়িটিতে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী কিছুক্ষণ একা একা হাসল। কাল রাতে সায়নের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে অনেকক্ষণ। গার্গীর পাঠানো ঠিকানাটা অনুসরণ করে সায়ন ইতিমধ্যে অনেকগুলি গল্প সংগ্রহ করে এনেছে। তারই একটা ছোট্ট ফালি ডিসুজার সামনে পরিবেশন করতেই যে-চিত্রটি উপহার পাওয়া গেল তা এই মুহূর্তে কম নয়। কিন্তু সে-গল্প তো আগের বারের। তার সঙ্গে 'আশ্রয়'-এর ঘটনাপঞ্জী মেলানো খুব সোজা কাণ্ড নয়। সবচেয়ে মুশকিল হল বিলাস সান্যালের হদিশ খুঁজে বার করা। সে-লোকটা হঠাৎই যে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেল, তাকে শুক্লপক্ষে যাত্রা করানো যাচ্ছে না এটাই আপাতত সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়।

ডিসুজা বিদায় নেওয়ার পর গার্গীও তার গাড়িতে উঠে ফিরে যাবে, হঠাৎই তার নজরটা আটকে গেল একটা তুঁতেরঙের ঝকঝকে মারুতির দিকে। আরে, এ গাড়িটা ফাদারেরই তো! হুঁ, গার্গীর অনুমান মিলেই গেল। মারুতির ভেতরে যে-মহিলা বেশ রাজকীয়ভাবে সমাসীন তিনি শতভিষা রায়। গাড়িটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বাঁয়ে বাঁক নিতেই গার্গী বুঝে গেল, ফাদারকে দেখতেই নার্সিংহোমের দিকে যাচ্ছেন শতভিষা। গাড়ির ভেতর তাঁর জাঁকিয়ে বসা দেখে মনে হচ্ছে ফাদারের অবর্তমানে 'আশ্রয়'-এর যাবতীয় মালিকানা এখন শতভিষারই।

খুব অল্প দিনেই শতভিষা যে বেশ কায়েম হয়ে বসেছেন 'আশ্রয়'-এ তা বুঝতে বাকি থাকে না। গার্গীর ফিরে যাওয়া মাথায় উঠল। তৎক্ষণাৎ গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ধাওয়া করল তুঁতেরঙা মারুতির পিছু পিছু। আর কী আশ্চর্য, যে-পুলিশ বাহিনীর বার্লিন বেড়া ডিসুজা বা গার্গী কেউই ভাঙতে পারেনি, শতভিষা অনায়াসে সেই অটল প্রতিবন্ধক ভেঙে ঢুকে গেল নার্সিংহোমের ভেতর। আরও অবাক কাণ্ড পুলিশেরই একজন কনস্টেবল তাকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল ভেতরে।

এবার গার্গী সত্যিই চিন্তার গহনে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এখনও অদ্ভুত, ধোঁয়াটে। শতভিষা রায় হঠাৎ কোন অমরাবতী থেকে উড়ে এসে চারবছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় আঙ্কেল-ব্রাদার-সিস্টারদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম টপকে 'আশ্রয়'-এ জুড়ে বসলেন তা অবশ্যই এখন গবেষণার বিষয়। 'আশ্রয়'-এর বাসিন্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কাটাছেঁড়া চলছে। কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে কি না কে জানে। গার্গী এখনও পারেনি। তবে গবেষণাটা চালিয়ে যেতে থাকে মনে মনে।

নার্সিহোমের ভেতর শতভিষা রায়ের অনায়াস গমন দেখে এটাও বোঝা গেল একমাত্র তাঁর নামেই ছাড়পত্র দেওয়া আছে পুলিশের খাতায়। নিশ্চয়ই ফাদারের ইচ্ছে অনুসারেই।

'আশ্রয়'-এর অন্য কেউ যে দেখতে আসেনি ফাদারকে তা একটু আগেই 'আশ্রয়' থেকেই জেনে এসেছে গার্গী। পুলিশ-অফিসাররা নাকি সেখানে ফতোয়া জারি করে এসেছেন, তাদের অনুমতি ছাড়া কেউই যেন আপাতত কম্পাউণ্ডের বাইরে না যায়। তাহলে শতভিষা রায়ই একমাত্র ব্যতিক্রম।

নার্সিংহোমের বাইরে চাতালে ঠায় দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে গার্গী তখন মনে মনে একটাই অঙ্ক কষে চলেছে। বিলাস সান্যালের ডিভোর্সি তৃতীয়া স্ত্রী কেনই বা এতখানি গুরুত্ব পেয়ে গেলেন ফাদারের ডেরায়। ফাদারের ডান হাত তুলিকা খুন হয়ে যাওয়ায় হয়তো ভীষণ অসহায় বোধ করছিলেন এতকালের দাপুটে কর্ণধার। এ সময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল আর একজন কারও ওপর নির্ভর করাব। কিন্তু সেই নির্ভরতা 'আশ্রয়'-এর কেউ না হয়ে কেন শতভিষা! শতভিষার সঙ্গে কী সম্পর্ক ফাদারের।

একটু পরেই লম্বা, মেদহীন শরীরটা নিয়ে তরতর করে শতভিষা বেরিয়ে আসতেই গার্গী তাঁকে ধরল, ফাদার এখন কেমন আছেন?

শতভিষা বোধ হয় আশা করেননি তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য আলাপিত হওয়া এক তরুণী তাব কাছে এমন হামড়ে জিজ্ঞাসা করবে ফাদারের খবর। এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, একটু বেটার।

শতভিষা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতেই গার্গী আবার তাঁকে ধরল, ফাদার কি আপনাকে বলেছেন আবার তাঁর ওপর অ্যাটেম্পট হতে পারে?

শতভিষা রায় যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গার্গীর কথায়। ভুরু কুঁচকে বললেন, সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

—যদি বলে থাকেন, তাহলে এখনই ডি.সি.ডি.ডি.-কে একবার ফোন করে দিতে হবে যাতে প্রপার সিকিউরিটি দেওয়া হয় ওঁকে।

শতভিষা কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ। হোস্টেলে ফিরে গিয়েই জানিয়ে দিচ্ছি।

দিন কয়েক পরেই গার্গীর অফিসের ই-মেলে সায়নের কাছ থেকে একটা লম্বা চিঠি এসে পৌঁছল যাতে ব্যাঙ্ক ফ্রডের কেস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লেখা। গার্গী যা ভেবেছিল, তার চেয়েও সাংঘাতিক সব ঘটনা বর্ণনা করেছে সায়ন। গার্গী পড়তে আরম্ভ করল রুদ্ধশ্বাসে। এ তো চার্লস শোভরাজের বাবার বাবা!

## ॥ ২৭ ॥

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে আসা ই-মেলের চিঠিটায় রুদ্ধশ্বাসে গার্গী চোখ পাতছিল ঃ

গার্গী,

কলকাতার খবরের কাগজে হর্ষদ মেহতা নামের এক ভারতীয় প্রতারকের কাণ্ডকারখানা একসময় হাঁ করে গিলতাম আমরা। সেরকমই আর এক ভারতীয়ের প্রতারণার খবর

এখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দারুণ হইচই শুরু হয়েছে। এমনকী রাজনৈতিক মহলেও টনক নড়েছে। ঘটনাটা এতটাই সাংঘাতিক যে পড়তে পড়তে একজন ভারতীয় হিসেবে মাথাটা নুয়ে যাচ্ছে মাটিতে। লোকটি ইংলণ্ডে প্রবাসী, কিন্তু ঘটনাটা ঘটিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নামী ব্যাঙ্কে। এ-সব কথা গলা ফাটিয়ে বলার মতো নয়, তবু তোমার অনুসন্ধিৎসু মগজে হয়তো কোনও কাজে লাগতেও পারে এই ভেবে জানালাম ই-মেলের মাধ্যমে।

তবে ভারতীয় লোকটি নাটের গুরু হলেও তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন তাঁরই ওপরঅলা। তিনি অবশ্য সে-দেশীয়। তাঁকেই সামনে রেখে তারপর ঘটানো হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেই ব্যাঙ্ককে ফতুর করার চক্রান্ত। ধরা যাক সেই ওপরওলাটির নাম মিঃ এক্স। কোটি কোটি ডলারের মুনাফা অর্জন করে এমন ব্যাঙ্কটির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। ব্যাঙ্কটা চলছিলও বেশ রমরম করে, কিন্তু তাঁর কাছে যে-কোনও একটা চাকরির খোঁজে এল সেই ভারতীয়। ধরা যাক তিনি মিঃ আলফা! যৌবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছানো ধারালো চেহারার সেই যুবকটিকে দেখে ভারী মনে ধরল মিঃ এক্সের। ছোট্ট একটা চাকরিতে বহাল করলেন তাকে। কিন্তু সেই ভারতীয়টির উচ্চাশা এতই আকাশচুম্বী যে তাকে সেই ছোটখাটো চাকরিতে ঠিক ধরে রাখা গেল না। মিঃ আলফা হয়ে উঠলেন মিঃ এক্সের সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টাও। মিঃ এক্স অতঃপর ভাসলেন সুখসাগরে, আর মিঃ আলফা তাঁর বসকে নানাভাবে উপদেশ দান করে যেমন দেখালেন জীবনকে কীভাবে ভোগ করতে হয় পুরোদমে, সেইসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করাতে লাগলেন একে-ওকে-তাকে। বেশির ভাগ ঋণই আসলে মিঃ আলফার বেনামী সব কোম্পানিতে যাদের কারও অস্তিত্ব আছে, কারও বা নেই। সব ডলারই আসলে মিঃ আলফার গোপন অ্যাকাউন্টে জমা হতে থাকল হু হু করে। কিছু ডলার আবার মিঃ আলফার বন্ধু-বান্ধবদের কোম্পানিতেও ঋণ দেওয়া হল যার থেকে একটা মোটা অঙ্কের কমিশন জমা হতে থাকে মিঃ আলফার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে।

এভাবেই তার দুজন ভারতীয় বন্ধু কয়েক লক্ষ ডলার উপার্জন করলেন। তাদের একজনের নাম ধরা যাক মিঃ বিটা, অন্যজনের নাম মিঃ গামা। আলফা, বিটা ও গামা—এই তিন চরিত্রই ইংলন্ডে বসবাসকারী তিন প্রবাসী ভারতীয়। ডলারের টানে টানে তিনজনেই একে একে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক বিলাসবহুল শহরে।

এদের মধ্যে মিঃ আলফাই প্রধান চরিত্র। বয়সেও তিনজনের মধ্যে প্রবীণ। কয়েক বছরের মধ্যে তিনিই কয়েক বিলিয়ন ডলার সরিয়ে ফেললেন মিঃ এক্সের টেকো মাথায় টুপি পরিয়ে।

ব্যাপরাটা প্রথম জানাজানি হল বছর তিনেক আগে ওখানকার পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক বিরোধী নেতা প্রসঙ্গটি তোলায়। তখনই সরকারের টনক নড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পর মিঃ এক্সকে সরিয়ে দেওয়া হল চেয়ারম্যানের পদ থেকে। অবস্থা সঙ্গিন বুঝে একই সঙ্গে আলফা, বিটা আর গামা গা-ঢাকা দিলেন ইউরোপের কোনও দেশে। শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই দেশটির সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিও এর মধ্যে জড়িত, না হলে মিঃ এক্সেরই বা কেন কোনও শাস্তি হল না তাঁর চেয়ারম্যানের পদ হারানো ছাড়া, আর আলফা-বিটা-গামা এরাই বা কেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারল বিনা প্রতিরোধে।

কিন্তু এই জালিয়াতির ফল যা হল তা এককথায় ভয়ঙ্কর। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড ধস নেমে গেল। একটা নামী ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি ডলার 'সাইফন

আডট' হয়ে যাওয়ায় নড়ে গেল সেখানকার রাজনৈতিক পটভূমিও। তবে শুধু তাইই নয়। মিঃ আলফার আরও যে-সব কীর্তি ক্রমশ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তার মধ্যে অন্তত দুটো না বললেই নয়।

এক) আফ্রিকার একটা ছোট্ট দেশে বছরখানেক আগে মিলিটারি ক্যু হওয়ায় সেখানকার প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে নির্বাসিত। মিঃ আলফার কাছে তখন বহু কোটি ডলার। তিনি ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললেন সেলো ফোনে। জানালেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করতে পারেন যদি প্রেসিডেন্ট তাঁর সামান্য কয়েকটি শর্তে রাজি হন। শর্তগুলি এরকম ঃ (ক) মিঃ আলফার নির্বাচিত কোনও অস্ত্র বিক্রেতাকে আপতত শতকরা তিরিশ ভাগ টাকা জমা দিলেই পাওয়া যাবে বিপুল সম্ভারের অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে রত হতে হবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হলেই বাকি টাকা। (খ) ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হলে ওখানকার বিশাল একটা জিপ-প্রস্তুত কারখানার মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে মিঃ আলফার নামে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরকম শর্তে রাজি হওয়ার অব্যবহিত ফল সেখানে প্রেসিডেন্টের অনুগত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, বহু জীবনহানি ও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা লাভ। ঘটনাটা নিয়ে এত তোলপাড় হত না যদি না পরে জানাজানি হত রাষ্ট্রপুঞ্জের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল ওই দেশটিতে কোনও ভাবে অস্ত্র বিক্রি করার ওপর। সমস্ত ঘটনাটার পেছনে মিঃ আলফার হাত আছে প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদপত্র জুড়ে ঝোড়ো হাওয়া। কিন্তু মিঃ আলফা নাকি হাত ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছেন, এই অস্ত্র বিক্রিতে আমি সামান্যই একজন কমিশন এজেন্ট। কে কোথায় যুদ্ধ করল না করল তাতে আমার দায় কী!

দ্বিতীয় ঘটনাটিও অদ্ভুত। আলফা বিটা আব গামার মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আঁতাত ছিল যতদিন না তাদের জীবনে দেখা দিলেন একজন ডেল্টা। ডেল্টা একজন সুন্দরী মহিলা। এতটাই সুন্দরী যে তিন প্রতারক একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সেই মহিলার আকর্ষণে। অনিবার্যভাবে তার ঠিক পরেই শুরু হল এমন টানাপোড়েন যে তাদের মধ্যে দেখা দিল একটা মস্ত ফাটল। অবশ্য সেই ফাটল সেভাবেই থেকে গেল কারণ পুলিশ তখন তিন জনকেই খুঁজছিল। তিনজনই ততদিনে পাখির মতো হাওয়া হয়ে গেছে পুলিশের নাকের ডগা থেকে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা অবশ্য এখনও তদন্তের আওতায়। এখানকার পুলিশ হয়তো আরও কিছুটা জানে, কিন্তু তদন্তের স্বার্থে আপাতত চাপা দিয়ে রেখেছে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের ফাইলের আড়ালে।

এত সব তদন্তের কথা তোমাকে লিখলাম শুধু মাত্র তোমার অজস্র কৌতূহলের ঝাঁপিতে জমিয়ে রাখার জন্যেই। অনেক টুকিটাকি ঘটনা গোয়েন্দাদের অনেক সময় কাজে লেগে যায় কোনও বড় তদন্তের জট ছাড়াতে। হয়তো এটাও লেগে যাবে কোনও দিন। মনে হয় ফ্ল্যাটে একা থাকতে খুব বোর লাগছে তোমার, আমার সেমিনার পর্ব শেষ হলেই ফেরার প্লেন ধরব। আজ এই পর্যন্ত। তোমার সায়ন।

দীর্ঘ চিঠিটা বার দুই চোখস্থ করে বহুক্ষণ ভুরুতে কোঁচ ফেলে বসে রইল গার্গী। এ-দেশেও ব্যাঙ্ক প্রতারণা বা জালিয়াতির খবর মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। কিন্তু এত বড় প্রতারণার ঘটনা বোধ হয় ঘটেনি। একজন ভারতীয়—তার কতখানি এলেম থাকলে অত

দূরে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন ডলার সাইফন করতে পারে তা ভেবে অবাক হচ্ছিল। পরক্ষণে মনে হয় মিঃ এক্সের সহযোগিতা ছিল বলেই হয়তো জালিয়াতিটা ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। গার্গী এও ভাবছিল মিঃ এক্স তো তাঁর দেশের সরকারের মহানুভবতায় বেঁচে গেলেন, কিন্তু তিন ভারতীয় আলফা বিটা আর গামার কী দশা হল তা আর জানা গেল না। আর ডেল্টা নামের যে অসামান্য সুন্দরী রমণীর আভাসমাত্র দিয়ে সায়ন ইতি টেনেছে চিঠির, তারই বা পরিণতি কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

ভাবনাটা কয়েক মুহূর্ত সাট্‌ল্‌ককের মতো তার মনের র‍্যাকেটে একা একা নাচাল। অবশ্য এই ভাবনাটাব চেয়ে আরও অনেক জোরালো ভাবনা এই মুহূর্তে ভিড় করে আছে তার মগজে। 'আশ্রয়'-এর আবহ এখন নিঃসন্দেহে জটিলতার তুঙ্গে। পাঁচটি কিশোরী যদি সত্যিই সমুদ্রনীলের হেপাজতে থেকে থাকে বা এতদিনে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে ত্রিস্তার হোটেল-বস্ বঙ্গনা গুপ্তার কবলে, তা হলে আরও ক'টি জটিল প্রশ্ন সামনে বিন্ধ্যপর্বতের মতো দাঁড়িয়ে। এক, তুলিকাকে কেনই বা খুন করা হল? এই ঘটনার পেছনেও কি সমুদ্রনীলের ভূমিকা? দুই, সমুদ্রনীলের উদ্দেশ্য যদি সাধিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এত দিন পর ফাদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হল কেন? তিন, শতভিষা রায় আসলে কে? বিলাস সান্যালের তৃতীয় স্ত্রী, এখন ডিভোর্সি, কী কারণে চাকরি পেলেন ফাদারের প্রতিষ্ঠানে? তিনি কেনই বা রোজই গোপনে ফোন করেন পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে! আরও আশ্চর্য, ফাদার তা জেনেও তার জন্যে আলাদা টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন হোস্টেলে। অর্থাৎ শতভিষা রায় যে পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে ফোন করেন তাতে ফাদারের গোপন সমর্থন আছে। না অন্য কোনও কারণ! আবার ফাদার গুলিবিদ্ধ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পর 'আশ্রয়'-এর কেউ, এমনকী আলফ্রেড ডিসুজা, বা গার্গী কেউই কেবিনে দেখা করার অনুমতি পায় না। অথচ শতভিষা রায়কে পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে যায় ফাদারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। ফাদার একমাত্র শতভিষার কাছেই বলেন তাঁর ওপর পুনর্বার অ্যাটেম্পট হতে পারে সেই আশঙ্কার কথা। চার, নিবেদিতা সে দিন অভিযোগ করেছে শতভিষার বিরুদ্ধে, স্পষ্টতই সে চাইছে না শতভিষা 'আশ্রয়'-এ থাকুক। নিবেদিতা কি আশঙ্কা করছে শতভিষা থাকলে 'আশ্রয়'-এর ক্ষতি হবে! না কি শতভিষা থাকলে নিবেদিতারই অসুবিধে হচ্ছে কোনও ভাবে। পাঁচ, বিলাস সান্যালের এই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে বিলাস সান্যালের এখন কী ধরনের সম্পর্ক! নিবেদিতার কাছে এখনও তিনি মাঝে মধ্যে আসেন। কেন আসেন তা আজ পর্যন্ত জানা গেল না।

অন্তত এই শেষ প্রশ্নটির উত্তর কোনওভাবে গার্গীর পক্ষে জানা সম্ভব। নিবেদিতার ওপর গার্গী তেমনভাবে চাপ সৃষ্টি করলে হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হবে নিবেদিতা। আর শতভিষার সঙ্গেও একবার মুখোমুখি কথা বলার দরকার। তিনি যদি সত্যিই ফাদার বা 'আশ্রয়'-এর শুভানুধ্যায়ী হন, তাহলে অবশ্যই গার্গীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হবেন। যদি না দেন সেক্ষেত্রে গার্গীর অঙ্কটা অন্য স্রোতে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা।

এত সব ভাবনার পর গার্গী সিদ্ধান্ত নিল, তাকে আরও একবার 'আশ্রয়-এ যেতে হবে। অনেক দিন হয়ে গেল এক বিচিত্র গোলকধাঁধায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে সবাই। জটটা এবার ছাড়াতেই হবে তাকে।

'আশ্রয়'-এ যাবে বলেই তোড়জোড় করছে, সে সময় হাতের সংবাদপত্র উথলপাতাল পড়তে পড়তে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপনে চোখ আটক হল তার। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছে বক্স-

আকারে, কর্মখালির পৃষ্ঠায়। এরকম বিজ্ঞাপন তো হরবকতই ছাপা হয়, কিন্তু এই বিজ্ঞাপনট যেন একটু অন্য রকম। বেসুরো। বক্সের মধ্যে লেখা আছে ঃ

কোনও একটি প্রাইভেট বিমান পরিষেবা সংস্থায় বিমান-সেবিকার কাজে কয়েকজন সুন্দরী, তন্বী, অবিবাহিতা, স্মার্ট, শিক্ষিতা তরুণীকে নিযুক্ত করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যত অন্তত বি.এ.। ইংরেজিতে কথা বলায় তুখোড় হওয়া প্রয়োজন। ইচ্ছুক প্রার্থীরা ইদানীং তোল একটি ফটোগ্রাফ-সহ আগামী সপ্তাহের সোম থেকে বুধ যে কোনও দিন সরাসরি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ক্যামাক স্ট্রিটস্থ অফিসে দেখা করুন। নির্বাচিত প্রার্থীদের পরে সপ্তাহেই, কোম্পানির নিজস্ব বিমানে নিয়ে যাওয়া হবে মুম্বইতে—সংস্থার অফিসে যোগ দেওয়ার জন্য। ইতি আর. গুপ্তা, রেনেসাঁ এয়ারলাইনস।

আর. গুপ্তা নামটি দেখে হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল গার্গীর। রেনেসাঁ নামে কোনও এয়ারলাইনস এ দেশে আছে কি না, না কি এটা নতুন কোনও সংস্থা সেটা খোঁজ নিতে হবে আজ বা কালকের মধ্যেই। সংবাদপত্রে আজকাল অনেক নিরীহ বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোনও গুঢ় সংকেত লুকিয়ে থাকাটা আশ্চর্য নয়। মুম্বই থেকে আসা ত্রিস্তার চিঠিতে রঙ্গনাথ গুপ্ত নামের জনৈক ধুরন্ধর ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়ার পর আরও যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল গার্গী। আর. গুপ্তা হয়তো রঙ্গনাথ গুপ্তাই। তা হলে একবার খোঁজ নিতে হয় ওখানে। মনে পড়ল এ ধরনের কোনও ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ তাকে কখনও দিতে হয়নি চাকরি পেতে গিয়ে। 'আশ্রয়'-এর চাকরিতে বেশ একটা বড় হার্ডল টপকাতে হয়েছিল—সে হার্ডল ছিলেন ফাদার। তাঁর দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে একমাস পর তাঁর মুখোমুখি হওয়াটা ছিল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। প্রচুর ধমক ধামক খেতে হয়েছিল ঠিক ঠিক প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব না দিতে পারায়। তবু সবশেষে ফাদার খুশি হয়েছিলেন তার পরীক্ষার মার্কশিটগুলো দেখে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার ফিচারের কয়েকটা পড়ে। এবারকার ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ কি সেরকমই হবে! সে কি এবারও পারবে নির্বাচিত হতে! আর যদি নির্বাচিত হয়!

কথাটা ভাবামাত্র গার্গীর সমস্ত শরীরে কুল কুল করে বয়ে গেল একটা শিরশিরে অনুভূতি। নির্বাচিত হলে আরও অনেক তরুণীর সঙ্গে তাকেও নিশ্চয় মুম্বইতে নিয়ে যাওয়া হবে রেনেসাঁ বিমান পরিষেবা সংস্থার নিজস্ব বিমানে। সেখানে কি তাকে বিমান সেবিকার কাজে যোগ দিতে বলা হবে। না এই বিজ্ঞাপনটাও একটা ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পিত ফাঁদ। যারা নির্বাচিত হতে পারবে, তাদের পরিণতি কি শেষে ত্রিস্তার মতোই ভয়ঙ্কর হবে!

সায়ন এখন সুদূর ইউরোপে সেমিনার করে বেড়াচ্ছে, তার অনুপস্থিতিতে এরকম একটা ফাঁদে জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হবে কি না সেটা ভাবতে বসল গার্গী। না কি গোটা ব্যাপারটা পুলিশের কাছে জানিয়ে দেবে যাতে তারা কড়া নজর রাখে পরিস্থিতির ওপর।

তবে সেটা পরের ভাবনা। আগে তো ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউটা হয়ে যাক।

ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিনেই গার্গী তাদের মুখোমুখি হবে বলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল দ্রুত। একটা ক্ষীণ অস্বস্তিও অবশ্য হচ্ছে। তাকে কলকাতার অনেক মানুষ চেনে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেষে বিমানসেবিকার চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে এ খবর শুনলে হাসাহাসি করবে সবাই। তা ছাড়া যদি সত্যিই একটা র‍্যাকেটের পিছু ধাওয়া করতে হয়, ইন্টারভিউয়ের সময় তার একটা ছদ্মবেশের প্রয়োজন।

ভাবামাত্র একটা অচেনা বিউটিপার্লারে গিয়ে প্রথমেই বদলে ফেলল তার হেয়ার স্টাইল। তার সমান্তরাল লম্বা চুল বিউটিশিয়ানের হাতের কারুকাজে হয়ে উঠল কোঁকড়া-কোঁকড়া। কোমর ছাপানো চুল কুঁকড়ে ছোট হয়ে উঠে এল পিঠের অর্ধেক। সেই কোঁকড়া এলো চুল গালের দু'পাশ বেয়ে এমন ঝুপসি হয়ে নেমে এল যে গার্গীর মুখের কাঠামোটাই গেল বদলে। ঘরে ফিরে তার দু'চোখের মণিতে পরে নিল দুটি বিড়াল-চোখ লেন্স। হ্যাঁ, এবার তাকে দিব্যি একটি ক্যাটআইড তরুণী বলে মনে হচ্ছে। আরও পরে নিল একটা মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। বদলে নিল বেশভূষাও। শাড়ি পরাটাই তার অভ্যেস। সেই মেয়ে যদি নীল জিনসের প্যান্টের ওপর একটা হলুদ টপ পরে নেয়, তাহলে গার্গী চৌধুরী অনায়াসে রূপান্তরিত হতে পারে মিমি মুখার্জিতে।

আয়নায় বারবার নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গার্গী নিশ্চিত হল সে নিজেকেই আর চিনতে পারছে না। ঠোঁটের পাশে একটা মস্ত কালো তিলও এঁকে নিল যাতে ইন্টারভিউয়ারের চোখ তার চোখে বেশি থিতু না হয়ে বিদ্ধ করতে পারে তার তিলটাই।

ছদ্মবেশটা নিখুঁত হতেই গার্গী কাঁধে একটা মস্ত ব্যাগ ঝুলিয়ে হেলে দুলে রওনা হল ক্যামাক স্ট্রিটের ঠিকানার উদ্দেশে। নির্দিষ্ট বাড়িটির দোতলায় উঠে কাঁচ ঘেরা ঘরটার বাইরে দেখল, অজস্র তরুণীর ভিড়। ভেতর থেকে ঘন ঘন ডাক পড়ছে তাদের। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে আসছে। মাত্র কয়েকজনকেই বোধহয় একটু বেশি সময় জেরা হল।

সেন্টার-টেবিলের ওপর রাখা স্লিপে মিমি মুখার্জি তার নাম ধাম লিখে বসে পড়ল একটা খালি সোফায়। এরপর ক্লান্ত হয়ে শুধু প্রতীক্ষা।

সে-প্রতীক্ষার কাল অবশ্য শেষও হল একসময়। মিমি মুখার্জির ডাক পড়তেই গার্গী সুৎই ডোর ঠেলে স্মার্ট ভঙ্গিতে ভেতরে। বেশ প্রশস্ত ঘর। সাজানো, ফিটফাট। মাঝখানে একটা সাদা সানমাইকা-লাগানো টেবিল। তার ওপাশে মাত্র একজনই ইন্টারভিউয়ার। বেশ সুদর্শন পুরুষ। চোখে হাল্কা চশমা। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ-টশ। মুখে স্মিত হাসি। গার্গী ঢুকতেই হাসিটি আরও উদ্ভাসিত, প্লিজ টেক ইয়োর সিট, মিস মুখার্জি।

পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন। বহু তরুণীকে একই প্রশ্ন করায় এখন সুদর্শন পুরুষটির চেষ্টা সত্ত্বেও শোনাচ্ছে তোতা পাখির মতো। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই গার্গীর সামনে এগিয়ে দিলেন একটা ছাপানো ফর্ম। তাতে পাঁচটি প্রশ্ন। প্রশ্নের পাশে ইয়েস / নো লেখা। সেখানে টিক দিতে হবে। প্রশ্নগুলো এরকম ঃ

১। যে চাকরিতে আপনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তাতে বছরের বেশির ভাগ সময়টাই বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। তাতে আপনি রাজি আছেন কি না?

২। আগামী পাঁচ বছর আপনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন না। সেটা আপনার পক্ষে অসুবিধেজনক কি না?

৩। আপনার কি কোনও পিছু টান আছে?

৪। আপনি কি নিজেকে হোমসিক মনে করেন?

৫। নাচ অথবা গান ইত্যাদি কোনও এক্সট্রা কারিকুলার যোগ্যতা আপনার আছে কি না?

গার্গী দ্রুত হাতে প্রশ্নগুলোর পাশে টিক দিতে দিতে এক মুহূর্ত থেমে গেল শেষ প্রশ্নটিতে পৌঁছে। বিমানসেবিকার চাকরির সঙ্গে নাচ অথবা গান ইত্যাদি এক্সট্রা কারিকুলার যোগ্যতাও

থাকা দরকার কি না তা জানা নেই তার। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ত্রিস্তার কথা। তাকে কানপুর থেকে যখন মুম্বই নিয়ে গিয়েছিলেন রঙ্গনাথ গুপ্তা, তার আগে এ-ধরনেরই কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথার ফুরসতে। কথাটা মনে পড়তেই শরীরের ভেতর শিরশিরে অনুভূতিটা দ্রুত ফিরে এল গার্গীর। এই সুদর্শন পুরুষটিই কি সেই রঙ্গনাথ গুপ্তা! ত্রিস্তার চিঠিতেও লেখা ছিল রঙ্গনাথ গুপ্তা খুবই হ্যান্ডসাম, সুন্দর ব্যক্তিত্বের পুরুষ।

সেই সুপুরুষ লোকটি গার্গীর উত্তরগুলো মিনিট আধেক পড়লেন খুঁটিয়ে। পরক্ষণেই একটা সুন্দর কার্ড ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। তাতে লেখা ঃ আগামী পরশু ভোর ছ'টায় এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে হবে। উইথ ব্যাগব্যাগেজ। প্রথমে ছ'মাস ট্রেনিং। ট্রেনীকে বিমানে করে ছ'মাস ঘুরতে হবে বিশ্বের এ-কোণ ও কোণ। তারপর বাড়ি ফিরে একমাসের বিশ্রাম। অতঃপর চাকরি জীবনের শুরু।

গার্গীর কার্ড পড়া শেষ হতেই মৃদু হাসির ঠমক ঃ ও কে, বাই, সি ইউ এগেইন, মিস মুখার্জি। পুরো ইন্টারভিউ শেষ হতে মাত্র মিনিট চার। ততক্ষণে ডাকা হয়ে গেছে পরবর্তী প্রার্থীকে।

কার্ডটা ব্যাগে ভরে গার্গী বাইরে বোরোতেই তাব ভেতর তখন থিকথিক করছে হাজার উত্তেজনার জার্ম। তাহলে সে এখন কী সিদ্ধান্ত নেবে। পরশু ভোরে এয়ারপোর্টে হাজির হবে কি হবে না। না কি গোটা ঘটনাটা জানিয়ে দেবে পুলিশে। সে ক্ষেত্রে পুলিশ কোনও স্টেপ নিতে পারবে কি না সেটাও ভাবার। না কি পরশু ভোরে আরও সব তরুণীদের সঙ্গে পাড়ি দেবে অনিশ্চিতের উদ্দেশে! দেখবে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। পুরো র‍্যাকেটটাকে যদি হাতে নাতে ধরতেই হয়, তা হলে অনিশ্চিত গন্তব্যে পাড়ি দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু তার আগে কি গোটা ঘটনাটা পুলিশকে জানিয়ে যাওয়াই ভাল!

এমন এলোমোলা অজস্র ভাবনার ফাঁকে আরও একটা ক্ষীণ সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার মগজে। সে এখনও পর্যন্ত বিলাস সান্যালকে কখনও চোখে দেখেনি, এই সুপুরুষ ব্যক্তিটি কি রঙ্গনাথ গুপ্তা, না সেই মহাপুরুষটিই!

## ॥ ২৮ ॥

সংবাদপত্রের সিনেমার পাতাতে সাধারণত চোখ রাখে না গার্গী। সকালে পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটা বিসদৃশ ছবিতে চোখ পাততেই ভুরুতে কোঁচ পড়ল বড় করে। ছবিটা শ্রীরাধার। কোনও একটা বিশাল বাজেটের সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তারই মহরতের ছবি। সেটা অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু দৃশ্যটিতে শ্রীরাধার পরনের পোশাক দেখলে শিরশির করে ওঠে গার্গীর শরীর, যদিও জানে হিন্দি

ছবিতে এ-ধরনের পোশাক আকছার পরতে হয় নায়িকাদের। তবু এই শ্রীরাধা তাদের 'আশ্রয়'-এ এসেছিলেন, তাঁর কাছেই রিয়াকে দত্তক দেওয়া আছে, এ সব কথা ভাবলে মনটা কেমন খিঁচড়ে যায় হঠাৎ। ফাদারই বা কেন রুপোলি পর্দার এই লাস্যময়ী নায়িকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাও বুদ্ধিতে কুলোয় না যেন।

ছবিটা দেখে তার নীচের খবরটাও পড়তে ইচ্ছে হল। এ সব অনুষ্ঠানের খবর ভারী ক্লিশে। তবু মহরতের খবরে আর একটা আশ্চর্য তথ্যে ঠেক খেয়ে গেল হঠাৎ। ছবিটা প্রযোজনা করছেন আলফ্রেড ডিসুজা নামের একজন গোয়ানিজ। বিগ বাজেটের ছবি। সারা পৃথিবীর সুন্দরতম লোকেশনগুলিতে শুটিং তোলা হবে। থাকবে আরও অজস্র চমক আর আকর্ষণ। প্রযোজক দাবি করেছেন এ-ছবি হবে সর্বকালের সেরা ছবিগুলির অন্যতম।

পড়তে পড়তে ক্রমশই বিস্মিত হচ্ছিল গার্গী। আলফ্রেড ডিসুজা কিছুদিন আগেই গার্গীকে বলেছিলেন কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে দরিদ্র ও উপেক্ষিত নারীদের কল্যাণের জন্য গড়ে তুলবেন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। সে-কারণে ব্যাঙ্কের কাছে একটা বড় অঙ্কের প্রোজেক্ট পেশ করেছেন যার মধ্যে ব্যাঙ্ক লোন নেবেন দশকোটি, তার সঙ্গে নিজের দু'কোটি মিশিয়ে ব্যবস্থা করবেন দশ হাজার নারীর কর্মসংস্থান। পরে এও বলেছিলেন ব্যাঙ্ক যদি ঋণ নাও মঞ্জুর করে, তিনি নিজের টাকাতেই গড়ে তুলবেন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প। তাতে বোঝা গিয়েছিল আলফ্রেড ডিসুজা একজন ধনকুবের। তবু তখনও উপলব্ধি করা যায়নি তিনি ঠিক কতটা ঐশ্বর্যের মালিক। থাবার মতো দুটো হাত, মোটা থলথলে চেহারার লোকটির কথা দু'দণ্ড ভেবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাটা উল্টে ফেলল গার্গী।

কিন্তু পৃষ্ঠা বদলে দিলেও ভাবনাটা বদলায় না। শ্রীরাধাকে নায়িকা করে আলফ্রেড ডিসুজার সিনেমা তৈরির অন্তরালে অন্য আর একটা ইঙ্গিত লুকোনো রয়েছে যেন। গোয়ানিজ লোকটার সঙ্গে মুম্বই চিত্রজগতের কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে নিশ্চয়ই। হয়তো তাঁর সূত্রেই শ্রীরাধার আগমন 'আশ্রয়'-এ। আলফ্রেড ডিসুজা বারাবার বলেছিলেন ইংলন্ড থাকতে তিনিই ছিলেন ফাদার অর্থাৎ ডঃ ইন্দ্রনীল বটব্যালের বন্ধু, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ী।

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় আর মন গাঁথতে পারল না গার্গী। কালো অক্ষরগুলো যেন মিছিল করে উঠে এল পৃষ্ঠা থেকে। সেগুলো পরস্পর স্থান বদল করতে লাগল ইচ্ছে মতো। অনেকটা সেই পারমিউটেশন-কম্বিনেশনের অঙ্কের মতো। মাত্র কয়েকটা স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা অ্যালফ্যাবেট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইতিমধ্যে কোটি কোটি পঙ্‌ক্তি লেখা হয়ে গেছে পৃথিবীতে। সেরকমই আরও কিছু পঙ্‌ক্তি লিখতে ইচ্ছে হল গার্গীর। অবশ্যই মনে মনে। কালো অক্ষরগুলো ওলট-পালট করে সাজিয়ে গার্গী ভুরু কুঁচকে বুঝে উঠতে চাইল শ্রীরাধা পর্বটি। তার ভাবনাগুলো এরকম ঃ

১। ফাদার কয়েকদিন আগেই ফোন করে জেনেছিলেন শ্রীরাধা বেশ কিছুদিনের জন্য আমেরিকা গেছেন। কিন্তু সংবাদপত্র বলছে তিনি আপাতত মুম্বইয়েই ব্যস্ত তাঁর শ্যুটিং নিয়ে। তাহলে শ্রীরাধার প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে এরকম একটা ভুল তথ্য সরবরাহ করা হল কেন!

২। কিছুদিন আগে ফাদার নিবেদিতাকে বলেছিলেন আরও একবার 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটির আয়োজন করতে। সময় কম ছিল বলে প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় রিয়া ছাড়া আর কাউকে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই নিবেদিতা চেয়েছিল রিয়াকে কয়েকদিনের জন্য 'আশ্রয়'-এ আনানোর ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ফাদার জানিয়েছিলেন শ্রীরাধা রিয়াকে একদিনের জন্যও ছাড়তে রাজি নন। কেন?

৩। সম্ভবত আলফ্রেড ডিসুজার মাধ্যমেই ফাদারের সঙ্গে শ্রীরাধার আলাপ। রিয়াকে দত্তক নেওয়ার পর রাইকেও নিতে চেয়েছিলেন শ্রীরাধা। হয়তো সবটাই ঘটেছিল ডিসুজোর সুপারিশেই। রাইয়ের জেদেই শেষ পর্যন্ত ফাদার তাকে শ্রীরাধার কাছে পাঠাতে পারেননি। অতঃপর ডিসুজা নিজেই নিতে চেয়েছিলেন রাইয়ের ভরণপোষণের ভার। তাতেও রাজি হয়নি রাই। তার পরিবর্তে গিয়েছিল শিরিন। সেই শিরিন এখন কোথায় আছে তা জানা যাচ্ছে না। শিরিনের বাবা তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নাছোড়, তবু ফাদার এখনও পর্যন্ত শিরিনকে আনার ব্যবস্থা করেননি। এর মধ্যে রাইও অন্তর্হিত। খুন হয়েছে তুলিকা। কেন এত সব ঘটল। কেন!

৪। এর মধ্যে সমুদ্রনীলের ভূমিকাই বা কী!

এত সব ভাবনার চড়াইতে উঠতে উঠতে গার্গী ততক্ষণে তৈরি হচ্ছে মুম্বই যাওয়ার পরিকল্পনায়। গুছিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট স্যুটকেস। তার লাগেজ কোনও দিনই ভারী হয় না। এবার তো আরও হালকা থাকা উচিত, কেননা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না কী ঠিক ঘটবে আগামিকাল! মুম্বইয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে কী ভবিতব্য! ঠিকমতো হিসেব করে পা না ফেললে হয়তো আর একজন ত্রিস্তা হয়ে যাবে সে-ও। ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকির। বিশেষ করে সায়ন যখন কলকাতায় নেই, ইউরোপে সেমিনার করে বেড়াচ্ছে, সে সময় এরকম একটি বেমক্কা অভিযানে একা বেরুনো সত্যিই টেনসনের। তাহলে কি সায়নের কথামতো তার স্তাবক সায়ন্তন ব্যানার্জিকে ঘটনাটা খুলে বলবে! লোকটাকে মনে মনে বেশ অপছন্দ করে সে, আবার কোথাও একটা দুর্বলতাও আছে যেন। সে কি শুধু লোকটার স্তুতি-স্তাবকতার জন্যে। না কি অন্য কোনও টান! গার্গী নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু উত্তর পায়নি। সেই সায়ন্তন ব্যানার্জিকেই কি বলবে তার এই ট্যুরে কোনওভাবে সঙ্গী হতে।

সেদিন বিকেলে একটা অভাবিত খবরে চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। মুম্বইয়ে পর-পর শক্তিশালী বিস্ফোরণে সাতটি জায়গায় বহু মানুষ হতাহত। বহু অট্টালিকা ধ্বংস। শহরের এখানে-ওখানে মজুত করা হয়েছিল ভয়ঙ্কর আর ডি এক্স। কোথাও মারুতির ভেতর, কোথাও মোপেডের পেছনে, কোথাও অ্যাটাচিতে রাখা হয়েছিল বিস্ফোরক। তারপর পরিকল্পিতভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির ছাদ বা দেওয়াল। ঘটনার ভয়াবহতা এমনই যে নড়েচড়ে বসেছেন দিল্লির কর্তারাও। ভয়ে কাঁপছে গোটা মুম্বই শহর। এর মধ্যেই প্রশাসনের উচ্চমার্গের ব্যক্তিরা পরিদর্শন করেছেন প্রতিটি অকুস্থল। আদেশ দেওয়া হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের।

টি ভি-র নব ঘুরিয়ে বহুক্ষণ ঘটনাগুলো চাক্ষুষ করল গার্গী। চারপাশের লোকজনের মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে বোঝা যায় কতটা টাল খেয়ে গেছে একটা ব্যস্ত শহরের জীবনযাপন। চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে শহর থেকে বেরুনোর পথগুলিতে। অপরাধী কে বা কারা তা এই মুহূর্তে বোঝা না গেলেও বিস্ফোরণের পেছনে যে বিশাল একটা চক্র জড়িত তাতে সন্দেহ নেই। এটা কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর কাজ, না কি মাফিয়ারাই জড়িত তা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে বিস্তর।

কিন্তু মুম্বই শহরে এতগুলো বিস্ফোরণের পর আগামিকালের মুম্বই-অভিযান আর হবে কি না সেই ভাবনাটাই চক্কর মারল গার্গীর মগজে। তার তো স্যুটকেস গোছানো শেষ। কিন্তু

রেনেসাঁ বায়ু পরিবহণ সংস্থার প্রোগ্রাম বহাল আছে কি না তার খবর তো নেওয়া দরকার! জানলা দিয়ে রোদের নরম কণাগুলো তখন জানান দিচ্ছে বিকেল হয়ে এসেছে বাইরের পৃথিবীতে। কাল ভোরেই প্লেন। রেনেসাঁ সংস্থা থেকে খোঁজখবর যদি নিতেই হয় তবে তা এখনই। ভাবনাটা হৃৎপিণ্ডে চলকে উঠতেই গার্গী অমনই রূপান্তরিত হল মিমি মুখার্জিতে। তক্ষুনি গাড়িতে উঠে রওনা দিল ক্যামাক স্ট্রিটস্থ সেই অফিসে। এ সব কাজ ফোনেই সেরে নেওয়া যেত। কিন্তু রেনেসাঁ সেদিন কোনও ফোন নম্বর দেয়নি, তেমনই দেয়নি তাদের মুম্বই অফিসের ঠিকানাও। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা গোপনীয়তা আছে। মুম্বই-অফিসের ঠিকানা জানা থাকলে গার্গী আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু রেনেসাঁর কর্তাব্যক্তি খুব সাবধানী। এতএব গার্গীকেও পা ফেলতে হবে হিসেব করে।

কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনের ফুটপাথে একটা মস্ত লিমুজিনকে জিরোতে দেখে বেশ চমকে উঠল। আরে, এই লিমুজিনটা তার তো খুবই চেনা। এ-শহরে এরকম একটা ঢাউস গাড়িতে চড়ে যাঁকে প্রায়শ ঘুরে বেড়াতে দেখে তিনি সেই কোটিপতি গোয়ানিজ আলফ্রেড ডিসুজা।

কিন্তু আলফ্রেড ডিসুজা হঠাৎ এখানে কেন! ঘটনাটা তার কাছে একটু আশ্চর্যই মনে হল এই মুহূর্তে। পরক্ষণে ভাবল এরকম অদ্ভুত ঘটনা হয়তো এরপর আরও ঘটবে। অতএব চোখ কপালে না তুলে চোখকে চোখের জায়াগায় আপাতত রেখে দেওয়া যাক। নির্বিকারভাবে বরং দেখা যাক কোথাকার পাশা কোথায় গড়ায়।

অতএব রেনেসাঁ সংস্থার অফিসে ঢোকার জন্য সে মোটেই ব্যস্ত হল না। লিমুজিন থেকে কিছুটা দূরে গাড়ির ভেতরেই অপেক্ষা করতে লাগল সতর্ক দৃষ্টি পেলে। একটু পরেই কী আশ্চর্য, লিমুজিনটার পেছনেই এসে দাঁড়াল একটা নীল অ্যাম্বাসাডার। কী অদ্ভুত, এ তো সেই নীল গাড়িটা যার নম্বর চারটে চার। গার্গীর বুকের ভেতর তখন একশো রেলগাড়ির দাপানি। অ্যাম্বাসাডারটার ভেতর থেকে নামলেন আর কেউ নয়, আঙ্কেল। আঙ্কেল তরফদার। নেমেই হন্তদন্ত হয়ে সেঁধিয়ে গেলেন রেনেসাঁ সংস্থার অফিসারের দিকে।

মিনিট পনেরো টানটান অপেক্ষার পর সংস্থার অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রথমে আলফ্রেড ডিসুজা, তাঁর পেছনে আঙ্কেল। দু'জনে দুটো গাড়িতে উঠলেন। পরক্ষণে হুস হুস করে গার্গীর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন দু'জনে।

গার্গীর দুটো পা ততক্ষণে অবশ, অনড়। ঘটনাটার কিছুই যেন তার মগজে কুলোচ্ছে না। দুয়ে দুয়ে কিছুতেই যেন চার হচ্ছে না। রেনেসাঁ নামক এক অচেনা বায়ু পরিবহণ সংস্থার রহস্যময় পটভূমিকায় কোত্থেকেই বা হাজির হলেন আলফ্রেড ডিসুজা, কোত্থেকেই বা রণধীর তরফদার। কী সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে! তা হলে সংবাদপত্রে বিমানসেবিকা রিক্রুট করার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যার নামে, সেই আর. গুপ্তাই বা কে! গার্গী যা ভেবেছিল, সেই বিলাস সান্যাল তা হলে আর. গুপ্তা নন! আর. গুপ্তা তা হলে অন্য কেউ। না কি ইন্টারভিউ নিলেন যিনি, তিনিই আর. গুপ্তা! তাঁর সঙ্গে আলফ্রেড ডিসুজা বা আঙ্কেল তরফদারের কী সম্পর্ক!

গার্গী অতঃপর এও ভাবল, তবে কি আলফ্রেড ডিসুজাই এই রেনেসাঁ সংস্থার আসল কর্ণধার!

বুকের ভেতর আরও একবার রক্ত ছলাৎ করে উঠল গার্গীর। কিন্তু তাকে এখন আর এখানে বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না। আগামীকালের উড়ানের প্রোগ্রাম ঠিক আছে কি না সেইটেই জানা দরকার।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে মিমি মুখার্জি ততক্ষণে হেলেদুলে গিয়ে ঢুকল দোতলার কাচ-ঘেরা ঘরটিতে। আজ অবশ্য ফাঁকা, ধু ধু অফিস। দুটো সাদামাটা চেহারার লোক বসে আছে ভেতরে। তাদেরই একজনকে গার্গী জিজ্ঞাসা করল আগামী কালের মুম্বই যাওয়ার কী হবে। লোকটি কথা না বলে তার হাতে ধরিয়ে দিল ছোট্ট একটি কার্ড। তাতে লেখা আছে অনিবার্য কারণে মুম্বইয়ের প্রোগ্রাম পেছুতে হয়েছে। আজ থেকে তিন দিন পর একই সময়ে ছাড়বে রেনেশাঁ সংস্থার বিমান।

সামান্য স্বস্তির শ্বাস ফেলল গার্গী। তার মানে আরও তিন দিন সময় পাওয়া গেল গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। আরও একটু পরিকল্পিত ভাবে এগোতে হবে তাকে। আলফ্রেড ডিসুজাকে প্রথম দিন থেকেই সে পছন্দ করেনি। লোকটা গায়ে-পড়াই শুধু নয়, সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখে কোনও একটা মোটিভ নিয়ে কাজ করে। এরকম একটা লোকের সঙ্গে ফাদারের কী করে যে বন্ধুত্ব হল!

সেই মুহূর্তে আরও একটা ভাবনা তার মাথায়। এর আগে ডিসুজাকে দেখেছে বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে ফাদারের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সেদিন ফাদার গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বালিগঞ্জ ফাঁড়ির ওপাশে নার্সিংহোমটায় তাঁকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল এক বিপরীত তথ্য। ডিসুজাকে ফাদারের যতখানি কাছাকাছি বলে এত দিন মনে হত, আসলে সেরকম নন। হয়তো ফাদার এখন আর তাঁকে পছন্দ করছেন না। সেই কারণেই তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি আহত ফাদারকে দেখতে। তাতে ডিসুজাকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল, ক্ষুব্ধও মনে হয়েছিল বেশ।

নীল অ্যাম্বাসাডারের রহস্যটাও কি কিছু খোল্‌সা হল তার কাছে। তা হলে কি আঙ্কেল তরফদারও জড়িত 'আশ্রয়'-এর কিশোরীদের অন্তর্ধানের অন্তরালে। কিন্তু তা হলে সমুদ্রনীলের সঙ্গে এতগুলি কিশোরীকে দেখা গেছে কেন! সমুদ্রনীলও কি এঁদের সঙ্গে জড়িত!

অনেক অনেক পরস্পরবিরোধী তথ্য মগজে পুরে গার্গী অতঃপর ছুটল আরও কিছু ছোটখাটো তথ্যের পেছনে। তুলিকার হাতব্যাগ থেকে পাওয়া একটা ঠিকানা আগ্রহী করেছিল তাকে। সেই সূত্র থেকে কিছু সংবাদ সেদিন জানতে চেয়েছিল সায়নের কাছে। হয়তো শিগ্‌গিরই জানাবে সায়ন। তুলিকার হ্যাণ্ডব্যাগে আরও দুটো সূত্র কিছু যেন ইঙ্গিত বহন করছে। সেই কাগজগুলো নিয়ে গার্গী প্রথমেই চলে গেল দমদমে এয়ারপোর্ট হোটেলে। তার হাতব্যাগে হোটেল কর্তৃপক্ষের লেখা একটা চিঠি বোধহয় কিছু খবর দিতে চায় গার্গীকে। হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকে সোজা চলে গেল একজন রিসেপশনিস্টের কাছে। কোনও ভূমিকা না করে সরাসরি বলল, দেখুন, আমি 'আশ্রয়' থেকে আসছি। একটা বিল পেমেন্ট হয়নি বলে আপনারা এই চিঠিটা দিয়েছিলেন। ফাদার আমাকে বললেন আপনাদের খাতায় তাঁর সইস্বাক্ষর আছে কি না দেখে যেতে। রেজিস্টারটা একবার দেখাবেন?

—দেখি চিঠিটা?

কাগজটা গার্গী এগিয়ে দিতেই রিসেপশনিস্ট যুবক খুঁটিয়ে পড়ে পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। একজন মাঝারি বয়সের লোক তাঁদের খাতাপত্তর দেখে বললেন, হ্যাঁ, এই বিলটা পেমেন্ট হয়নি।

—দেখি রেজিস্টারটা একবার।

রেজিস্টারটা কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করতেই গার্গী এমন কিছু তথ্য আবিষ্কার করল যা এতকালের মধ্যে সে ভেবে উঠতে পারেনি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে তার ভেতরে। কিন্তু যথাসম্ভব শান্ত থেকে বলল, আমি এগুলো একটু নোট করে নিচ্ছি। আমাদের ফাইলটা কোথায় যে রেখেছেন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক! এখন কোনও হিসেবেই মেলাতে পারছি না আমরা। আর ওই বিলটার একটা ডুপ্লিকেট কপি দিন। মাঝারি বয়সের লোকটি তৎক্ষণাৎ বললেন, হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। একজন মোটামতো মেয়ে আপনাদের ওখান থেকে আসত মাঝে মাঝে। কী যেন নাম—

গার্গী বলল, তুলিকা?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। তিনিও এরকম একবার এসে—

'আশ্রয়'-এক ভয়ঙ্কর সব খবর নিশ্চয়ই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয় না। অতএব তুলিকা যে আর ইহধামে নেই তা এঁদের কাছে না বললেও চলবে। গার্গী খুব মন দিয়ে ফাইলের পুরনো পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে নোট করল কিছু জরুরি তথ্য। তারপর একসময় থ্যাঙ্কস জানিয়ে উঠে পড়ল সেখান থেকে। ডুপ্লিকেট বিলটার কপি পেয়ে বলল, হয়তো বিলটা পেমেন্ট করতে ক'দিন দেরি হবে, কারণ ফাদার—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। উনি তো আমাদের অনেক পুরনো ক্লায়েন্ট।

ফাদার এখানে নিয়মিত যাতায়াত করেন যখন, নিশ্চয়ই সবারই চেনা। তাঁর অসুস্থতার ধরন আর ভাঙল না আপাতত। গার্গীর পরবর্তী গন্তব্য 'কার রেন্টাল'-এর অফিস—যেখান থেকে 'আশ্রয়'-এর জন্য লাক্সারি ট্যাক্সিগুলো প্রায়শ আসে নানান টুকিটাকি কাজে। সেখানে গিয়েও কয়েকটা মিথ্যে বলতে হল তাকে যদিও মিথ্যে বলাটা তার একেবারেই অপছন্দের। কিন্তু এই মিথ্যে ভাষণ তো তদন্তের স্বার্থে।

—দেখুন, 'কার-রেন্টাল'-এর যে শেষ বিলটা আমাদের পাঠিয়েছেন, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের অফিসে। একটা ডুপ্লিকেট বিল দেবেন?

'কার রেন্টাল'-এর ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে বললেন, তার জন্যে আপনি এত দূরে আসতে গেলেন কেন, ম্যাডাম? একটা ফোন করে দিলেই তো হত।

গার্গী হেসে বলল, আসার একটা অন্য কারণও আছে। গত দু'মাসের বিলগুলো একবার দেখতে হবে। আমাদের পেমেন্টের ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলোর ফটোকপি রাখা দরকার ফাইলে।

সব ক'টা বিলের কপি অবশ্য দরকার ছিল না গার্গীর। কয়েকটা তারিখে কোন গাড়ি গিয়েছিল, তাতে কে চড়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিল গাড়িটা, কতক্ষণ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা বিস্তারিত তথ্য নোট করে নিল দ্রুত। সেইসঙ্গে বিলগুলোর কপিও। আপাতত তথ্যগুলো তার কাছে গচ্ছিত থাক। কখন কী দরকার হয় কে জানে।

টানা দু'দিন ধরে এত সব ঘোরাঘুরি নোটানুটির পর নিজের ওপর কিছুটা আস্থা ফিরে পেল গার্গী। এখন গোটা বিষয় কিছুটা পরিষ্কার, কিছুটা ঝাপসাও এখনও। অন্তত সমুদ্রনীলকে খুঁজে পাওয়াটা খুব জরুরি ছিল এই মুহূর্তে। দিন দুয়েক আগেও হোমিসাইড ব্র্যাঞ্চের পুলিস ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে ফোনে বলেছিল, দেখুন না, সমুদ্রনীলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কি না। ওকে পাওয়া গেলে রহস্যের বারো আনা উন্মোচন হত। কিন্তু দ্যুতিমান চ্যাটার্জি বলেছেন সমুদ্রনীল বোধহয় এখন আর কলকাতায় নেই। পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে অনুমান করে আপাতত দূরে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে।

গার্গীর খুবই আফসোস। সমুদ্রনীলকে বেশ কয়েকবার দেখা গিয়েছিল কখনও চৈতালি, বীথি বা রাইয়ের সঙ্গে। যারা দেখেছিলেন, নিবেদিতা ছাড়া কেউই তাদের ভাল করে চেনেন না। গার্গীর চোখে একবারও কেন ধরা দিল না সমুদ্রনীল! তা হলে তো বিষয়টা পরিষ্কার হত।

অতএব গার্গীর সামনে আপাতত দুটি বড় প্রশ্নচিহ্ন। একজন সমুদ্রনীল, অন্যজন বিলাস সান্যাল। এই দ্বিতীয় মানুষটিকে কখনও চোখেও দেখেনি গার্গী। এখন তিনিও যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তাও সে সেদিন জেনেছে। তাঁর সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট তথ্য জানা দরকার। যারা তাঁর সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড ভাবে জানেন, তাদের একজন নিবেদিতা, অন্যজন শতভিষা।

এই দুই বিপ্রতীপ সম্পর্কের ও স্বভাবের নারীকে প্রশ্নমালা উপহার দেওয়ার জন্য পরদিন দুপুরটাই বেছে নিল গার্গী। 'আশ্রয়'-এ গিয়ে দু'জনকে অজস্র জিজ্ঞাসাবাদ করে যে মানুষটির চরিত্র উদঘাটিত হল তা অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত। আরও যেন ঘন হল রহস্য।

## ॥ ২৯ ॥

ফাদার নার্সিংহোমে অন্তরীণ, দশ-বিশ দিনের মধ্যে আশ্রয়-এ ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতএব আশ্রয় চলছে ভারী ঢিমেতালে। আঙ্কেল-ব্রাদার-সিস্টার থেকে শুরু করে সবুজের দল—কারও মন একেবারেই ভাল নেই। বরং সমস্ত কম্পাউণ্ড জুড়ে বিজবিজ করছে একটা হিম আতঙ্ক। হোটেলের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শতভিষা রায়ই শুধু ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন একবার নার্সিংহোমে, একবার তাঁর নতুন চাকরিস্থল 'আশ্রয়'-এ। তাঁর ভূমিকা নিয়ে সবার মধ্যেই একটা অসহ্য প্রশ্ন চিহ্ন! ঠিক এরকমই ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে গার্গী তাঁর ঠোঁটের ডগায় যাবতীয় প্রশ্নাবলী নিয়ে এসে পৌঁছল এক শিথিল দুপুরে।

স্কুলের পিক-আওয়ার, তবু কী আশ্চর্য, কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই কম্পাউণ্ডের ভেতর। হয়তো সব ক্লাস হচ্ছেও না। তবু এসময় তত্ত্বাবধায়কদের কেউ ক্লাসে কেউ টিচার্স রুমেই থাকবে এরকম ভেবে গার্গী সরাসরি ঢুকে গেল সে-ঘরে। বেলা একটাব কাছাকাছি সময়। শুধুমাত্র বিশাখাই বসে আছে ঘর আলো করে। ঠিক বসে নেই অবশ্য। একটা সাদা

কাগজের ওপর হিজিবিজি আঁকছে কী যেন। গার্গীকে দেখে একটু অবাক হল, তুই এ সময়! একটা ঘ্যামা চাকরি করিস, সেখান থেকে ছুটি পাওয়া গেল?

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ছাড়া কী আর পাওয়া যায়। নেহাত বস এখন ইউরোপে সেমিনার করতে গেছে। তাই—

—তা হলে তো তুই এখন একটা ফ্রি বার্ড। যা খুশি করতে পারিস। একদিন এসে থাক না এখানে। 'আশ্রয়'-এর যা পরিস্থিতি তাতে ঠোঁট টিপে থাকতে থাকতে একটা বৃক্ষ হয়ে উঠছি ক্রমশ। বট অথবা অশত্থ নয় অবশ্য, নেহাতই সজনে কিংবা শিউলি। তুই রাতে থাকলে বেশ জম্পেস করে গল্প করতাম রাত জেগে।

গার্গী হেসে উঠে বলল, আইডিয়াটা মন্দ নয়। কত কাল রাত জেগে গল্প করিনি। এখানে থাকার সময় সেই যা রাত জাগতাম—

বিশাখা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বলল, কেন? তোর বরের সঙ্গে কখনও রাত জেগে গল্প করিসনি!

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাহ, আমার বর রাত জেগে বই পড়তে পারে, কিন্তু বউয়ের সঙ্গে গল্প করে না। যাক সে কথা। সত্যি-সত্যি একদিন ইচ্ছে করছে তোদের এখানে এসে এক রাত থাকতে। কিন্তু তোদের এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তো অনেক বদল হয়েছে শুনলাম। নতুন হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে এখানে থাকতে দেবেন তো! খুব কড়া নাকি!

—হুঁ। কড়া বলে কড়া! মেয়েদের একদম পর্দানশীন করে ফেলেছেন। হোস্টেলের দোতলা থেকে নীচে একতলা ক্লাসে যাওয়া ছাড়া এই বিল্ডিঙের বাইরে যাওয়ার কারও দম নেই। এমনকী কম্পাউণ্ডের ভেতর ঘোরাফেরা করতে হলেও তাঁর পারমিশান নিতে হবে। কম্পাউণ্ডের বাইরে কারও যাওয়ার তো প্রশ্নই নেই।

—তা হলে তো বজ্র আঁটুনি বলতে হবে।

—আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম। অত টাইট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গেরো না ফস্কা হয়ে যায় কোনদিন।

—হুঁ, তা তোদের আর সব কোথায়। সবাই ক্লাসে নাকি।

—হ্যাঁ। একমাত্র নিবেদিতা ছাড়া।

—কেন? নিবেদিতা কোথায়?

—মেন্টর'স হাউসে। তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

—বিশ্রাম! শব্দটা যেন 'আশ্রয়'-এর অভিধানে নতুন। গার্গী অবাক হয়, কতদিনের বিশ্রাম?

—যতদিন না ফাদার সুস্থ হয়ে 'আশ্রয়'-এ ফিরছেন।

—হঠাৎ এরকম ব্যবস্থা?

বিশাখা হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামাল, আসলে শতভিষা রায় নাকি নিবেদিতাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কাকে নাকি বলেছেন নিবেদিতাই নাকি তার এক্স-হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এতগুলো মেয়ে হাপিস করে দিয়েছে এখান থেকে।

নিবেদিতার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তো সেই গোড়া থেকে। মাঝখানে কিছুদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। প্রসঙ্গটা একবার মগজের ভেতর খেলিয়ে গার্গী হেসে বলল, অভিযোগ

তো এখানকার অনেকের বিরুদ্ধেই। আচ্ছা, তোরা কি কেউ জানিস, সমুদ্রনীলের বর্তমান আবাস কোথায়?

—পুলিশ তো সমুদ্রনীলকে মাঝে খুব খুঁজে বেড়িয়েছিল। পরে রিপোর্ট দিয়েছে, অ্যাবস্কন্ডিং।

—তোরা তো সমুদ্রনীল সম্পর্কে সব শুনেছিস। তোদের কি বিশ্বাস হয় নিবেদিতা কিংবা সমুদ্রনীল কেউ এরকম কাজ করতে পারে।

বিশাখা গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ, তারপর বলল, আমি এ সব বলাবলির মধ্যে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি আমি এরকম একটা সাংঘাতিক কাজ করিনি।

বিশাখার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে গার্গী বুঝে উঠতে চাইল 'আশ্রয়'-এর ভেতরকার টানাপোড়েন। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য ক্লু বেরুল না ঝগড়ুটে মেয়ে বিশাখার মুখ থেকে। গার্গী যখন এখানে থাকত, তার সঙ্গে বিশাখার কখনও ঝগড়া হয়নি। তবে অন্য সবার সঙ্গেই হত এক-দু'দিন পর-পর। আসলে গার্গী সবার সঙ্গে এত দ্রুত মিশে যেতে পারে, তার স্বভাবসিদ্ধ উইট আর হিউমারে জয় করে নিতে পারে অন্যের মন যে তার সঙ্গে কারও ঝগড়া হওয়াই মুশকিল। শুধু ইদানীং কবি সায়ন্তন ব্যানার্জির উপহার দেওয়া কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ে মনে হচ্ছে লোকটা তেমন সুবিধের নয়।

বিশাখা যখন একেবারেই কুলুপ এঁটে ফেলল ঠোঁটে, তখন তাকে গুডবাই জানিয়ে এসে হাজির হল মেন্টর'স হাউসে।

ভরভরন্ত দুপুর, এ সময় নিজের ঘরের বিছানায় চুপচাপ চোখ বুজে বোধহয় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছিল নিবেদিতা। কিন্তু তার মগজে তখন হাজারো চিন্তার ভিড়, দেবী প্রসন্ন হবেনই বা কী করে। তার সেই ঘুম আর না-ঘুমের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে ঘরে এসে ঢুকল গার্গী কী রে, ঘুমিয়ে মোটা হওয়ার চেষ্টা করছিস নাকি! বেশ তো আছিস, স্লিম-স্লিম ফিগার।

নিবেদিতা তার দুশ্চিন্তার ঘোর ভেঙে উঠে বসল তৎক্ষণাৎ, ওই, তুই এসে যা উপকার করলি!

—কীরকম?

—ভীষণ ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে আছি। এরকম সময়ে তোর মতো এনার্জি টনিক পাওয়া ভাগ্যের কথা। তোর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই মনটা ভাল হয়ে যায়। বলতে পারিস মনের ভেতর একটা সুবাতাসের আগমন ঘটে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। তা হঠাৎ এত মন খারাপের কারণ কী?

—তুই শুনিসনি, হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে ক্লাস নিতে বারণ করেছেন। আমি এখন 'আশ্রয়'-এর কাছে ব্রাত্য।

একটু আগেই গার্গী শুনে এল ঘটনাটা। তবু শোনেনি যেন এমন ভঙ্গিতে বলল, তার কারণ?

—ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর আমার সম্পর্কে একটা প্যানিক জন্মেছে। তাই-ই...

গার্গী গভীর চোখে পরখ করল তার একদা রুমমেটটিকে। সে সময় নিবেদিতাকে কতটা চিনেছিল কতটা চেনেনি তা এখন তার আবিষ্কার করার পালা। কিছু প্রশ্নবাণ এখন তাকে ছুড়তে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে। হেসে বলল, তার জন্যে তোরও কিছু অনিবার্য ভূমিকা

াছে, নিবেদিতা। কিছু রহস্যের আবরণ তুই তৈরি করে রেখেছিস তোর চারপাশে। তাতে ন্দেহের একটা তর্জনী এখন তোর দিকেও।

নিবেদিতা চোখ বিস্ফারিত করে বলল, তুইও এরকম কথা বললি!

নিবেদিতাকে প্রবল উত্তেজিত দেখেও নির্বিকার রইল গার্গী। তাকে জেরা করার এমন ুর্বর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না, তার ক্রুদ্ধ চোখে চোখ রেখে বলল, দ্যাখ নিবেদিতা, আশ্রয়' এখন এমনই বিপর্যস্ত যে, যে-কোনও মুহূর্তে হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে এতদিনের তিল তল করে তৈরি করা প্রতিষ্ঠানটা। কে বা কারা এতগুলো মেয়েকে নিয়ে গেল এখান থেকে, তারা কোথায় গেল, কীভাবে জীবনযাপন করছে এখন তা কেউই জানে না। পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে, বাকি মেয়েদের যেমন কোনও জীবনের নিরাপত্তা নেই, তেমনই টলমল কর্মীদের চাকরিরও। তা ছাড়া আরও নানা ভয়ঙ্কর সব কর্মকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে একের পর এক। সবই তো জানিস—

—তাতে আমি কী করতে পারি?

নিবেদিতাকে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখে গার্গী বলল, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুই ঠিকঠাক উত্তর দে তো—

—কী?

—বিলাস সান্যাল কেন ঘন ঘন আসছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে?

তার প্রাক্তন স্বামীর নাম শুনেই সহসা কেমন কুঁকড়ে গেল নিবেদিতা। তার ক্রোধ, উত্তেজনায় সহসা লোডশেডিং। গলা খাদে নামিয়ে বলল, ও এমনিই আসে। এসে বলে, আমি রিপেন্ট্যান্ট।

—সে কী: হঠাৎ এরকম কথা?

—বলল খুব টেনসনের মধ্যে আছে। আমার কাছে এলে নাকি ওর মনটা শান্ত হয়ে যায়।

—শুধু এই কথা বলতে তোর কাছে আসে?

সামান্য ইতস্তত করে নিবেদিতা বলল, হ্যাঁ।

—তুই কিন্তু কোনও কথা চেপে যাচ্ছিস। এর আগেও অনেক বার কিছু একটা লুকোনোর চেষ্টা করছিস। এখনও তাই। এই জন্যই তো তার চালচলন, আচার-আচরণ সন্দেহজনক ঠেকছে অনেকের কাছে।

নিবেদিতা বিপর্যস্ত হয়ে বলল, বিশ্বাস কর, আমি কোনও খারাপ কাজ করিনি।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে তুই কাউকে কোনও ব্যাপারে সাহায্য করছিস।

নিবেদিতা চোখ নিচু করে বলল, আমি কাউকে কোনও সাহায্য করিনি।

—কিন্তু বিলাস সান্যাল লোকটা একেবারেই সুবিধের নয় তা নিশ্চয়ই তোর চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

—জানি।

—তোকে আচমকা প্রস্তাব দিয়েছিল বিয়ে করার জন্য। কিন্তু বিয়ের কিছুকালের মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তোকে ছেড়ে দিল এভাবে।

—ও তো ছেড়ে দেয়নি। আমি নিজেই ছেড়ে চলে এসেছি।

—কিন্তু কেন!

নিবেদিতা মুখ নিচু করে বলল, ওর সঙ্গে বেশিদিন থাকা যায় না। বিয়ের পর প্র কয়েকদিন এমন ভাব করেছিল যেন আমি ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনও মেয়ে নেই যা ও পছন্দ করে। কিন্তু সে বোধহয় মাস ছয়েক। তারপর ওর জীবনযাপন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে পড়ল। প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরত না। যদি ফিরে আসে, তখন ডেড-ড্রা নেশার ঘোরে বিছানায় শুয়ে ভুলভাল কথা বলত।

—কী রকম কথা।

—অন্য মেয়েদের নাম ধরে ডাকত। তাদের সঙ্গে কথা বলে যেত অনর্গল।

গার্গী আগ্রহী হয়, মনে আছে সে সব মেয়েদের নাম?

—দু-একটা নাম খুব বেশি বলত। তার মধ্যে একটা হচ্ছে শতভিষা।

গার্গী খুব একটা বিস্মিত হল না, বলল, আর কাদের নাম?

—ডলি নামের একটা মেয়েকে খুব ডাকত। কিন্তু সাড়া না পেয়ে হাউমাউ করে কাঁ হঠাৎ।

—ছিল নাকি এরকম কোনও মেয়ে?

—আমি জানি না। শতভিষার কথা পরে জেনেছিলাম। একদিন রাতের বেলা ম অবস্থায় ফিরে আমাকে বলল, শতভিষাকে বিয়ে করব। পারমিশান দাও।

—স্ট্রেঞ্জ!

—হ্যাঁ। বলল, তুমিও থাকবে, সেও থাকবে।

—সে কী কথা?

—তারপর বুঝলাম আর আমার ওর কাছে থাকার কোনও মানে হয় না। পরের দিনই

—বুঝলাম কিন্তু ডলি নামে কেউ কি সত্যিই ছিল?

—বললাম তো জানতে পারিনি। তারপরই আমি চলে আসি।

—তবে শতভিষা যে ছিল তা তো দেখতেই পারছি। কিন্তু শতভিষা কি জানত তে কথা?

—কী জানি! হয়তো পরে জেনেছিল। হয়তো সে কারণেই আমার উপর ওর এত র

—শুধু সেই কারণেই?

—কিংবা হয়তো জানতে পেরেছে আমি ওর কীর্তিকলাপ ধরে ফেলেছি।

গার্গী আশ্চর্য হল, কী কীর্তিকলাপ!

—ওর টেলিফোনে আড়ি পেতে জেনে ফেলেছি কে রোজ ফোন করে ওকে।

—কে ফোন করে রোজ?

—বিলাস সান্যাল!

—মাই গড। ওকেও ফোন করে! কেন?

—তা জানি না। হয়তো ওকেও বলে, আমি রিপেন্ট্যান্ট। যে রকম আমাকেও বলে।

—তাতে কী লাভ ওঁর? যারা ওঁর কাছ থেকে চলে এসেছে, বা বলা যায় চলে আস বাধ্য হয়েছে তাদের সঙ্গে আবার কেনই বা যোগাযোগ রেখে চলেছেন নিয়মিত!

—বললাম না, খুব মিস্টেরিয়াস চরিত্রের। হয়তো একজনের সঙ্গে কথা বল আড্ডা মারছে, তখন সে লোকটি জানতে পারছে না ঠিক এর পরের মুহূর্তে বি সান্যাল কী করবে। হয়তো বিলাস সান্যাল নিজেও জানে না কী করবে এর পর। ভী আনপ্রেডিক্টেবল্।

—তুই কি কিছু অনুমান করতে পারিস শতভিষা রায়ের সঙ্গে কেন যোগাযোগ রাখছে হঠাৎ। এরকম একটা মিস্টেরিয়াস চরিত্রের মানুষ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া নিশ্চয়ই যোগাযোগ করছে না!

—মাইট বি!

—তোর কি মনে হয় বিলাস সান্যাল এত সব কর্মকাণ্ডের একজন হোতা!

—নাথিং ইজ ইমপসিব্‌ল্ ফর হিম।

—তা হলে সমুদ্রনীলের সঙ্গে যে এতগুলো মেয়েকে দেখা গেছে একের পর এক তার কী ব্যাখ্যা হবে?

—মে বি হি ইজ ইন্‌স্ট্রুমেন্টাল—

গার্গী ব্যাপারটা চোখ বুজে ভাবল কিছুক্ষণ। নিবেদিতার অনুমান যথার্থ কি না তা নিয়ে দোলাচলে ভুগল একমনে। হঠাৎ মনে পড়ল আঙ্কেল তরফদারের কথা। তাকে এমন একটা জায়গায় দেখে এসেছে যেখানে তাকে সাধারণভাবে দেখার কথা নয়। সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করল হঠাৎ, আঙ্কেল তরফদারকে তুই তো অনেক দিন থেকেই সন্দেহ করিস, তাই না?

—এখনও করি। আঙ্কেল তরফদার তো খুব ঘোড়েল লোক। এই ক'দিনের মধ্যে শতভিষা রায়ের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। এমনকী শতভিষা রায়ের হুকুম পর্যন্ত ইন টো-টো মেনে চলছেন।

—হুকুম! গার্গী বিস্মিত না হয়ে পারে না।

—হ্যাঁ। শতভিষা রায়ই তো এখন 'আশ্রয়'-এর ডি-ফ্যাক্টো কর্ণধার। ফাদারের অনুপস্থিতিতে সে যা বলছে, তা-ই তো আইন।

গার্গী ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করল। গত চার বছর ধরে 'আশ্রয়'-এর প্রশাসন একরকম ভাবে চলেছে। হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটল যাতে এখানকার সব কুশীলবকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মহিলাকে 'আশ্রয়'-এর কর্ণধার করে দেওয়া হল।

একসঙ্গে অনেকটা প্রহেলিকা মাথায় পুরে নিবেদিতাকে পুনর্বার ঘুমোনোর সুযোগ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল গার্গী। অভ্যেসমতো একবার তাকাল ফাদারের চেম্বারের দিকে। খালিই থাকার কথা তাঁর চেম্বার। কিন্তু মনে হল ভেতরে কেউ আছে। কৌতূহলবশত পর্দা তুলে উঁকি দিতেই ভীষণভাবে আশ্চর্য হল। ভেতরে বসে আছেন শতভিষা রায়। একেবারে ফাদারের চেয়ারেই।

গার্গীর এতদিনকার 'আশ্রয়' সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় এর চেয়ে আশ্চর্যতম দৃশ্য আর কখনও দেখেনি। ফাদারের এতই প্রতাপ 'আশ্রয়'-এর ভেতরে যে এখানকার সর্বস্তরের কর্মীই বেশ ভয় করে চলে তাঁকে। তাঁর চেয়ারে বসা তো দূরের কথা, তাঁর মুখের ওপর কথা বলতেও সাহস করে না কেউ। আর শতভিষা রায় কি না—

গার্গী দুম করে ভেতরে ঢুকে পড়ে বলল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

শতভিষা রায় খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা চিঠি লিখছিলেন, হঠাৎ গার্গীর প্রবেশে চমকে উঠলেন। চিঠিটা টেবিলের ওপর উল্টে রেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী কথা?

—আপনি হয়তো শুনে থাকবেন আমি এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলাম। যে সব সবুজেরা এখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে, তাদের একটা বড় অংশই আমাদের

কয়েকজনের হাতে বাছাই করা। হঠাৎ তাদের কয়েকজন এখান থেকে অন্তর্হিত হতে খুব দুশ্চিন্তায় আছি অন্যাদের সঙ্গে আমিও।

শতভিষা রায় ভুরু কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করছেন গার্গী আসলে কী বলতে চায়।

—এখানে কয়েকদিন যাতায়াত করার সুবাদে বুঝতে পারছি আপনিও এই প্রতিষ্ঠানের একজন শুভানুধ্যায়ী। সেই কারণেই কেউ বা কারা আপনাকে টেলিফোনে প্রায়ই হুমকি দিচ্ছে। ঠিক কি না?

শতভিষা রায়ের এবার চমকে ওঠার পালা। তাঁরা দুটো চোখ আবারও বিস্ফারিত, সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

গার্গী অন্ধকারে যে গুলিটি ছুড়েছিল তাতেই শতভিষা আহত। বলল, আপনাকে কিন্তু খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করতে হবে এরপর। ফাদার কবে ছাড়া পাচ্ছেন নার্সিংহোম থেকে?

—ডাক্তাররা তো চাইছেন পরের সপ্তাহেই ছেড়ে দিতে। কিন্তু ফাদার বলছেন আরও একটু সুস্থ হয়ে তবেই আসবেন এখানে।

গার্গী আবারও গুলি ছুড়ল, উনি নিশ্চয়ই আশঙ্কা করছেন আবও একটা অ্যাটেম্পট হতে পারে ওঁর ওপর, তাই না?

শতভিষা স্থির চোখে তাকাল গার্গীর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, হয়তো।

গার্গী অনুমান করল সে এতক্ষণে শতভিষার আস্থা অর্জন করে ফেলেছে। এখন তাঁকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে যা তার কিছু জ্ঞাতব্যের উত্তর পেতে সাহায্য করবে। ভেতরের ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে বলল, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

'আশ্রয়'-এর মতো এরকম একটা গোলমেলে জায়গায় আপনি হঠাৎ এলেন কেন?

শতভিষা রায় সচকিত হলেন, সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

গার্গী জানত শতভিষাকে চট করে মুখ খোলানো যাবে না, তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। আবার বলল, ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয়ই আপনার বলতে আপত্তি হবে না। ফাদারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী করে?

—সে সব জেনে আপনার কী লাভ? আপনাকে আমি বলতে যাবই বা কেন? শতভিষা যেন অতিমাত্রায় সতর্ক।

গার্গী অপ্রস্তুত হল না, বলল, খুব প্রয়োজন আছে বলেই বলছি। আপনি হয়তো এখনও অনুমান করতে পারছেন না, আপনার জীবন কতখানি বিপন্ন। যে কোনও সময় আপনিও তুলিকার মতো—

শতভিষা রায়কে এতক্ষণে একটু বিবর্ণ দেখা গেল। গার্গীর চোখে চোখ রেখে বললেন, কিন্তু আপনি এত সব খবর জানলেনই বা কী করে।

গার্গী কিছু না ভেঙে বলল, যে ভাবেই হোক জেনেছি। চেষ্টা করছি ভেতরের ব্যাপারগুলো আরও একটু জানার। যদি আমাকে সাহায্য করেন—

শতভিষা সামান্য সময় কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, ফাদার কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছে একজন নির্ভরযোগ্য, বুদ্ধিমতী অথচ ঝাড়া হাত-পা মহিলার খোঁজ

রেছিলেন যাকে উনি 'আশ্রয়'-এর হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে ারেন। পরে ওঁর কাছ থেকে শুনেছি, প্রায় চল্লিশ জনের মতো মহিলাকে ইন্টারভিউ করে ামাকে নির্বাচিত করেন।

গার্গী এ ব্যাপারটা জেনেছিল ফাদারের কাছ থেকে। যে-তথ্যটি জানেনি সেটাই জিজ্ঞাসা রল এবার, আপনাকে নিয়োক করার সময় উনি কি জানতেন আপনি বিলাস সান্যালের চভোর্সি?

শতভিষা রায় একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, জানতেন। হয়তো সেই কারণেই ামার নির্বাচন।

অতঃপর গার্গী একটু ঘুরিয়ে রাখল প্রশ্নটা, আপনি কি তখন জানতেন 'আশ্রয়'-এ এত সব াংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে?

—হুঁ জানতাম। ফাদার বলেছিলেন সব।

—জানতেন এখানে চাকরির মধ্যে এত ঝুঁকি আছে?

—ঠিক এতটা ঝুঁকি আছে তা বুঝিনি।

—এবার কতকগুলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব আপনাকে। তার জবাব আপনি দিতে পারেন, াও দিতে পারেন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিলাস সান্যাল যখন আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব িয়েছিলেন, তখন তাকে ঠিক মতো চিনেছিলেন কি?

—মানে?

—জানতেন তিনি আগেই বিবাহিত?

—না। জানলাম বিয়ের পর। সব কথা জানিয়ে বলেছিলেন তিনি দুজনের সঙ্গেই সম্পর্ক াখতে চান।

—তারপব?

তারপর শতভিষা রায় যে ঘটনা বর্ণনা করলেন তা সত্যিই অদ্ভুত, আশ্চর্য। ব্যাকবণের াইরের সব ব্যাপারস্যাপার।

## ॥ ৩০ ॥

বিলাস সান্যাল সম্পর্কে যতই শুনছে গার্গী, তার কৌতূহল উপচে পড়তে থাকে ক্রমশ। আচ্ছা মিস রায়, বিলাস সান্যাল যে একেবারে ব্যাকরণের বাইরের মানুষ তা প্রথম কবে ুঝতে পারলেন?'

—সে তো বিয়ের পর-পরই। তখন এক সপ্তাহও পার হয়নি, একদিন বললেন, তোমাকে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।' কে নিবেদিতা তখনও জানি না। বললেন, 'সেও আমার আর এক বান্ধবী। তোমারই মতো।' তোমারই মতো শব্দদুটো কানে

খট করে বাজল। বলেছিলাম, 'আমি তোমার বান্ধবী নাকি!' বললেন, 'ওই হল আর কী ম্যারেজ ইজ নাথিং বাট অ্যা ফ্রেণ্ডশিপ বিটুইন অ্যা ম্যান অ্যাণ্ড অ্যা উওম্যান।'

—খুব ইন্টারেস্টিং তো!

—বললেন, 'একজন মানুষ একই সঙ্গে অনেক মেয়ের সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ বজায় রাখতে পারে।' তাতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার এরকম আর কতজন বান্ধবী আছে?' উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইননিউমারেব্‌ল্‌। আমার তো ইচ্ছে করে পৃথিবীর অজস্র মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। কেননা প্রতিটি মেয়েই একে অপরের থেকে আলাদা।' তো সেই দিনই বুঝে গিয়েছিলাম, একজন অদ্ভুত মানুষের পাল্লায় পড়েছি।

—অদ্ভুতই বটে, গার্গী হাসল সামান্য।

—তারপর একদিন বললেন, 'নিবেদিতার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল না ও চলে যাচ্ছে।' আমার মনে হল হয়তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তখন আমাকে ছাড়া আর কাউকে চেনেন না উনি। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই একদম বদলে গেল মানুষটা। রাতে বাড়ি ফিরতেন না। ফিরলেও তখন মধ্যরাত। ডেড-ড্রাঙ্ক অবস্থায় ফিরে ভুল ব বাকি রাত।

গার্গী খেয়াল করছিল নিবেদিতা ঠিক যেরকম বর্ণনা করেছিল, শতভিষা রায় ঠিক এক রকম বলছেন বিলাস সান্যালের আচার-আচরণ। যেন একটা মানুষকেই দু'পাশ থেকে দেখেছে দু'জন। কিন্তু না, একটু পর থেকেই বদলে গেল বিলাস সান্যালের কীর্তি কাহিনী

—আচ্ছা মিস রায়, নেশার ঘোরে কোনও মেয়ের নাম ধরে কি ডাকতেন উনি?

শতভিষা রায় একটু অবাক হলেন। অবাক হওয়ার কথাই, তবু বললেন, হ্যাঁ। বিচিত্রিতা বিচিত্রিতা বলে ডাকতেন।

—আর কোনও মেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি করতেন কখনও?

—হ্যাঁ। অনেককেই খুঁজতেন ঘুমের ঘোরে। তার মধ্যে একটা নাম ঘুরেফিরে আসত

—কার নাম?

—ডলি বলে একটা মেয়েকে ডাকাডাকি করতেন খুব। বলতেন, 'ডলি, তোমাকে আমি বাঁচব না। তুমি ফিরে এসো।'

গার্গী কিছুটা চমৎকৃত, কিছুটা আবার নয়ও। বলল, তাই! আর কোনও অভিজ্ঞতার কথা কি বলবেন?

শতভিষা রায় চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। কিছু যেন ভাবলেন। তারপর হঠাৎ বললেন আসলে লোকটা এতটাই অদ্ভুত যে কোনটা বলব কোনটা না বলব বুঝে উঠতে পারছি না তবে একটা ঘটনার কথা বলি। একদিন রাতে বাড়ি ফিরে চেঁচাতে লাগলেন, 'বিচিত্রিতা বিচিত্রিতা, শোনো।' আমি তো খুবই অবাক! কিছুটা বিব্রতও। এই নামটা এর আগে কয়েকবার শুনেছি ওঁর মুখে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখনই ডাকতে বিচিত্রিতাকে। কিন্তু এদিন বাড়ি ফিরেই বললেন, 'বিচিত্রিতা', পরশু সকালে আমরা নেপা যাচ্ছি কিন্তু । ব্যাগ ব্যাক্স গুছিয়ে নিও।' তারপর নেপালে গিয়ে কোন হোটেলে উঠবে কোথায় কোথায় বেড়াবেন তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন মহাউৎসাহে। আমি হতভ হয়ে শুনে যাচ্ছি কথাগুলো। পরদিন সকালে নেশার ঘোর কেটে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম

বিচিত্রিতা, সত্যিই নেপালে যাচ্ছেন কি না! কিন্তু উনি এমন ভাব করলেন যেন ব্যাপারটা ওঁর মাথাতেই নেই। অথচ তার পরদিন সকালে ব্যাগ নিয়ে বেরোবার সময় বললেন, 'চার-পাঁচ দিন বাড়ি ফিরব না।' নেপাল যাচ্ছেন কি না জিজ্ঞাসা করতে হাসলেন, বললেন, যে লোকটা রাতের বেলা ওই সব প্রোগ্রাম করে, সে তিনি নন, অন্য কেউ। যাই হোক চার-পাঁচ দিন পর ফেরার পরে জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখি নেপালের কোনও এক হোটেলের মোটা অঙ্কের বিল, দু'জনের প্লেনের টিকিট ইত্যাদি। কার সঙ্গে নেপাল গিয়েছিলেন জিজ্ঞাসা করতে বললেন যে-লোকটা নেপাল গিয়েছিল বান্ধবী নিয়ে সে তিনি নন, অন্য কেউ!

—স্ট্রেঞ্জ।

—আমিও ক্রমশ অবাক হচ্ছিলাম। একদিন মধ্যরাতে ঘরে ফিরে বললেন, বিচিত্রিতা, ঢাকুরিয়ায় একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে এলাম। এগারোশো স্কোয়ার ফিট এরিয়া। দক্ষিণ খোলা। চমৎকার লোকেশন। আগামী ছাব্বিশে রবিবার গৃহপ্রবেশ! পরদিন সকালে উঠে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর ছাব্বিশে ভোরে উঠে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন, বললেন, 'ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।' দিন পাঁচেক পর ফিরতে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে। তখন জানাল বিচিত্রিতার কথা। তার সঙ্গে আলাদা একটা ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যে থাকবে। তবে আমিও থাকতে পারি এখানে। বাধ্য হয়ে আমাকে ডিভোর্স চাইতে হল।

কিছুক্ষণ থম হয়ে বিলাস সান্যালের জীবনযাপন বোঝার চেষ্টা করল গার্গী। জীবনের ব্যাকরণ মেনে যে লোকটা চলে না তা বোঝা যায় তার সম্পর্কে নিবেদিতা ও শতভিষা বিচিত্র সব বিবরণ শুনে। কিন্তু তাতেও যেন সম্পূর্ণ বোঝা গেল না লোকটাকে। শতভিষাকে আরও একটু উসকে দিতে চাইল, এ ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছেন কখনও?

—সে অনেক কথা। একবার বিদেশ থেকে আসা একটা চিঠি খুঁজে পেলাম জামার পকেটে। খামের ওপর ঠিকানার জায়গায় লেখা গণেন্দ্রনাথ বাগচি। কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে লোকটা, তোমার পকেটে এ চিঠি কেন?' তো বলল, 'কেউ একজন হবে নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের বাস, সব মানুষকে আমি চিনি না। তোমারও নিশ্চয় সব মানুষ চেনা নয়। কী হবে জেনে?' তার কিছু দিনের মধ্যেই পুরনো দিনের একটা ডায়েরি খুঁজে পেলাম আলমারিতে। তার প্রথম পৃষ্ঠায় নাম লেখা গণেন্দ্রনাথ বাগচির। বেশির ভাগ পৃষ্ঠাই ফাঁকা। মাঝেমধ্যে দু-একটা পংক্তি, ইংরেজিতে। সবটাই প্রায় দুর্বোধ্য। তার মধ্যে ডলি নামের একটি মেয়ের কথা লেখা।

—ডলি! গার্গী এবার বিস্মিত হয়। কতদিন আগের লেখা ডায়েরিটা?

—পাঁচ ছ'বছর আগেকার হবে।

—ডায়েরিটা একবার দেখতে দেবেন?

শতভিষা রায় হাসলেন, সেটা উনি নিয়ে নিয়েছিলেন। কোথায় যে রেখেছিলেন তা জানতে পারিনি তারপর।

—ডায়েরিটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি ওঁকে?

—করেছিলাম। তাতে বললেন, 'তোমার যদি মনে হয় ওই নামটা আমার হলে ভাল হয়, তা হলে মনে করো ওটা আমারই নাম।'

—অদ্ভুত উত্তর তো।

—সত্যিই অদ্ভুত। আমি বলেছিলাম। 'মনে করা এক জিনিস, আর ট্রুথ আর এক জিনিস। এটা সত্যি কি না তাই বলো।' তখন বললেন, 'তা হলে তো তোমাকে অনেক গল্প বলতে হয়। বরং ধরে নাও আমার অনেকগুলো ক্লোন আছে।'

—ক্লোন! গার্গীও এতক্ষণে টাল খেয়ে যায়।

—হ্যাঁ, বললেন, আমার অনেকগুলো ক্লোন একই সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় এদিকে ওদিকে। যখন আমার নাম বিলাস সান্যাল, তখন সেই লোকটা একরকম ভাবছে, একরকম আচার-আচরণ করছে, তার কথনভঙ্গি একরকম। আবার সেই লোকটার একটা ক্লোন আছে যার নাম গণেন্দ্রনাথ বাগচি। তখন সে আর একরকম ভাবছে, তার আচার-আচরণ অন্য ধরনেব, তার কথনভঙ্গি অন্য। আবার সেই লোকটার হয়তো আর একটা ক্লোন আছে যার নাম আর গুপ্তা।

—আর গুপ্তা! গার্গী ছিটকে উঠতে চাইল এতক্ষণে।

শতভিষা বোধহয় অনুমান করে উঠতে পারলেন না গার্গী কেনই বা এতখানি উত্তেজিত আর গুপ্তার নাম শুনে। তিনি আগের কথার খেই ধরে বলে চলেছেন, হ্যাঁ. বললেন, 'যখন আমার ক্লোনটাব নাম আর গুপ্তা, তখন তার ভাবনাচিন্তার পবিধি একেবারে অন্য ধরনের। তার চেহারা, কথাবার্তা, আচার-আচরণও বিলাস সান্যাল বা গণেন্দ্রনাথ বাগচির সঙ্গে মিলবে না।'

গার্গী তখন প্রায় বোবা। শতভিষা রায়ের সঙ্গে কথা বলতে এসে হঠাৎ বিলাস সান্যালকে যে এভাবে আবিষ্কার করতে পারবে তা ভাবতে পারেনি একবারও। জিজ্ঞাসু চোখে শতভিষা রায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কীই বা করতে পারে! কিন্তু শতভিষা রায়কে তখন কথায় পেয়েছে। এরকম একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে কিছুকাল কাটানোর অভিজ্ঞতা হয়তো এতদিন কাউকে বলেননি। হঠাৎই গার্গীকে বলতে আরম্ভ করলেন হুড়মুড় করে।

বুঝলেন, হঠাৎ মানুষটা কীরকম বদলে গেলেন আমার সামনে। সে সময় দিনের আলো নিবে সন্ধে হয়ে এসেছে চারপাশে। আমি খেয়াল করতাম সন্ধের পরই তিনি কীরকম যেন বদলে যান প্রতিদিন। সে দিনও কীরকম উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'দ্যাখো, আমি বিলাস সান্যাল কীরকম ভাবে আর গুপ্তা হয়ে যেতে পারি।' বলতে বলতে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে ফেললেন অদ্ভুত দ্রুততায়। চোখে পরে নিলেন একটা ছোট আকারের চশমা। তারপর চোস্ত্ হিন্দিতে হুড়হুড় করে বলতে শুরু করলেন, দেখিয়ে মেমসাব—

বুঝলেন, তার কথার ভঙ্গি, গলার স্বর, ম্যানারিজম কী আশ্চর্যভাবে বদলে গেল আমার চোখের সামনে। বরাবরই কথার জাদুতে বশ করে ফেলতে পাবতেন যে কোনও মানুষকে। আর গুপ্তা হয়ে আরও ভেলকি দেখিয়ে দিলেন সেদিন। চোখের চাউনিতে কীরকম একটা ক্রুর ভঙ্গিমা, অথচ মুখে একচিলতে হাসি। লোকটিকে দেখে সেদিন কীরকম ভয়-ভয়ই করতে লাগল যেন। তারপর সংবিত ফিরতে হঠাৎ সেলার থেকে একটা স্কচের বোতল খুলে

কিছুক্ষণ খেলেন একা একা। সে রাতে তাঁকে আর চিনতেই পারিনি। একেবারে অন্য মানুষ। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে আবার আগের মতো। যখন আগের দিন সন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনাটা মনেই করতে পারলেন না। অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি! এরকম করেছিলাম বুঝি! তা হলে সে আমি নই। আমার কোনও ক্লোন এসে ভর করেছিল আমার শরীরে।'

গার্গীও হতবাক হচ্ছিল শতভিষা রায়ের মুখে বিলাস সান্যালের বর্ণনা শুনে। আর গুপ্তাই যে বিলাস সান্যালের একটা ভিন্ন সত্তা তা বুঝে ফেলা গেল অবশ্য। তবে রেনেসাঁ বায়ু পরিবহণের অফিসে বিমানসেবিকার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন যে-লোকটি সে নিশ্চয়ই বিলাস সান্যাল, আর গুপ্তা নয়। না হলে বাংলায় কথা বলবেনই বা কেন। হয়তো তিনিই মুম্বই পৌঁছে আবার আর গুপ্তা হয়ে যাবেন পলক না ফেলতে। তবু একটা খচ্‌খচানি রয়েই গেল এই কারণে যে, আর গুপ্তাই যে রঙ্গনাথ গুপ্তা তা এখনও জানা যায়নি। তবু গার্গীর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, ত্রিস্তাকে যে সুপুরুষ লোকটি কানপুর থেকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল মুম্বইতে, সেই রঙ্গনাথ গুপ্তা হয়তো এই আর গুপ্তাই। তবে তা নাও হতে পারে। তবু সন্দেহটা যাচাই করতেই গার্গী আরও একবার অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে, আচ্ছা, আপনি কি ত্রিস্তা নামের কোনও মেয়ের নাম শুনেছেন ওঁর মুখে?

—ত্রিস্তা! শতভিষা রায়ের গলার স্বরে বিস্ময়, কই না তো!

—তা হলে আমার ভুল হচ্ছে, বলে রহস্যটা আর শতভিষা রায়ের সামনে না ভেঙে এবার উঠে পড়ল গার্গী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। পরে আবার দেখা হবে।

শতভিষা রায় এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের ভেতর ছিলেন, গার্গী উঠে পড়তে তাঁর সংবিৎ ফিরল। একটু অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল তাঁকে। বললেন, আচ্ছা, এত সব কথা আপনি জানতে চাইলেন কেন বলুন তো?

গার্গীর যা জানার তার অনেকটাই জানা হয়ে গেছে। গলায় একটু রহস্য মাখিয়ে বলল, কিছু একটা জানার চেষ্টা করছি।

—কী জানতে চাইছেন?

গার্গী হেসে বলল, ঠিক যে-কারণে ফাদার আপনাকে এখানে এনেছেন, হয়তো তার উৎস সন্ধানে যাওয়াই আমার অভিপ্সা।

শতভিষা রায়কে একরাশ কুয়াশার মধ্যে রেখে গার্গী হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ সামলে বেরিয়ে এল বাইরে। দুপুরের তাত কমে এসেছে ততক্ষণে। 'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢিলেঢালা ভাব। ফাদার না থাকলে এরকমই ঢিমেতালে চলে প্রতিষ্ঠানটা। হয়তো এই কারণেই ফাদার সারাক্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন কর্মব্যস্ততায়। তিনি হইহই চেঁচামেচি না করলে কেউ সচল থাকে না। সেই ফাদার এখন গুলিবিদ্ধ হয়ে নার্সিংহোমে শুয়ে। বিপদমুক্ত যদিও। তবু নার্সিংহোমের বাইরে না আসাটাই আপাতত শ্রেয় মনে করছেন। গার্গী বুঝতে পারছে, একটা সাংঘাতিক ভয় গ্রাস করেছে তাঁকে। কেন এই ভীতি তার কিছুটা বুঝতে পারছে, কিছুটা আবার পারছেও না।

ফাদার নেই বলে যেমন কাজের চাপও নেই 'আশ্রয়'-এর কোথাও, তেমনই তাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদে গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক। কেন যেন অনেকেরই মনে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটা হয়তো সত্যিই বন্ধ হয়ে যাবে এবার।

শতভিষা রায়কে একগলা কুয়াশার ভেতর ডুবিয়ে রেখে এলেও গার্গীর নিজের ভেতর থেকে কুয়াশা কেটে গেছে অনেকখানি। তার সামনে এখন অনেকগুলো টুকরো টুকরো ক্লু। সারা মাঠ জুড়ে ছড়ানো ছিটানো ক্লু-গুলো এবার একটা একটা করে গাঁথতে হবে। শুধু সুতো খুঁজে পাওয়াটাই যা বাকি। গাড়িতে অন্তরীণ হয়ে অফিসের দিকে ফিরতে ফিরতে সে তখন ভেবে চলেছে অনেকগুলো অনিবার্য প্রশ্ন। অনিবার্য, কিন্তু অবধারিত।

১. বিলাস সান্যাল সে একজন বিখ্যাত ঠগ তা জেনেও নিবেদিতা বা শতভিষা দু'জনেই এখনও কেন যোগাযোগ রেখেছে তাঁর সঙ্গে?

২. 'আশ্রয়'-এর কিশোরীদের অন্তর্ধানের পেছনে বিলাস সান্যালের কোনও ভূমিকা আছে কি না! নাকি ওগুলো সমুদ্রনীলের একারই কীর্তি!

৩. গোয়ানিজ ডিসুজার সঙ্গে ফাদারের যোগাযোগ আপাতত ছিন্ন কেন!

৪. ডিসুজার সঙ্গে বিলাস সান্যালের একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে। সম্পর্কটা কী ভাবে হল ও কী ধরনের সম্পর্ক।

৫. তুলিকাকে কেন হত্যা করা হল তা এখনও পরিষ্কার নয়। কে হত্যা করল তুলিকাকে?

৬. ফাদারকে গুলি করা হল কেন, কেনই বা তিনি নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেতে চাইছেন না!

৭. শতভিষা রায়কে কেন এতখানি প্রাধান্য দিলেন ফাদার, সেটাও কম রহস্য নয়।

৮. 'আশ্রয়'-এর পাঁচটি কিশোরীর বিনিময়ে সত্যিই কি ছাড়া পেয়েছে ত্রিস্তা!

৯. সমুদ্রনীল ও বিলাস সান্যালের বর্তমান অবস্থান কোথায়?

১০. কাল সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা গার্গীর। সেখান থেকে মুম্বই। মুম্বই গিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়তে পারে সে! সে বিপদ মোকাবিলা করার মতো কোনও উপায় খুঁজে বার করতে পারবে তো!

এ'রকম দশদফা প্রশ্নাবলীতে আক্রান্ত হয়ে শেষ বিকেলের দিকে অফিসে পৌঁছল গার্গী। টেবিলে জমা হয়ে আছে অনেকগুলো ফাইল ও একরাশ চিঠিপত্তর। সেগুলোর দিকে একবার অলস দৃষ্টি ফেলল আনমনা ভঙ্গিতে। তাদের কোম্পানির যাবতীয় দেখভাল করার দায়িত্ব আপাতত তারই। সায়ন নিশ্চিন্তে সেমিনার করে বেড়াচ্ছে ইউরোপে। তার অনুপস্থিতিতে সে এখন অফিসের দায়িত্ব পালন না করে রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সে কথা শুনলে মোটেই খুশি হবে না সায়ন। অতএব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তার সামনে ন্যস্ত সমস্যাগুলোর যথাসম্ভব হিল্লে করে ফেলল একে একে। টেবিল খালি হতেই আবার বুঁদ হয়ে গেল কালকের মুম্বইযাত্রার ভাবনায়। যাওয়ার মধ্যে অনেক হ্যাঁপা, আবার না গেলেও নয়। তৎক্ষণাৎ টেলিকমের বোতাম টিপে যোগাযোগ করল তাদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার সায়ন্তন ব্যানার্জির সঙ্গে, হ্যালো, মি. ব্যানার্জি, হঠাৎই একটা জরুরি কাজে মুম্বই যেতে হচ্ছে আমাকে।

—মুম্বই। কেন ম্যাডাম? সায়ন্তন ব্যানার্জির স্বরে উৎকণ্ঠা।

—সেটা এই মুহূর্তে আপনার জানার দরকার নেই। যেটা আপনাকে করতে হবে তা হল দুটো মোবাইল ফোন জোগাড় করা। তার একটি থাকবে আপনার কাছে, অন্যটা আমার

গেছে। মুম্বই গিয়ে হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয় তা হলে আপনাকে জানাব। যাওয়ার সময় আপনাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে যাব। সেটা অবশ্য কলকাতার নম্বর। যদি আমি মোবাইলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি, তা হলে আপনি কলকাতার এই টেলিফোন নম্বরটিতে যোগাযোগ করে সব জানাবেন।

সায়ন্তন ব্যানার্জি তাঁর মাল্‌কিনের এই অদ্ভুত সংলাপে রীতিমতো ফাঁপরে। গার্গীর অনেক কিছুই তার বড় আশ্চর্য মনে হয়। এবারের আচরণ যেন আরও অভিনব। কোনও চিন্তা না করেই বলল, নো প্রবলেম, ম্যাডাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার হুকুম তামিল করছি।

গার্গী বিচলিত হয়ে বলল, না, না, এটা হুকুম নয়, আপনার সাহায্য চাইছি মাত্র।

টেলিকমের রিসিভার রেখে দিয়ে সামান্য উত্তেজনা বোধ করল গার্গী। সে জানে লোকটা তার কথা মান্য করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে অতঃপর যে—

ভাবনাটা আপাতত মুলতবি রেখে অন্য এক গাঢ় চিন্তায় বুঁদ হতে চাইল। পুলিশ ইনস্পেকটর দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে অনেক দিন কোনও যোগাযোগ হয়নি। 'আশ্রয়'-এর ব্যাপারটা পুলিশের মাথা থেকে নেমে হয়তো নিরাশ্রয় হয়ে গেছে এতদিনে। ঘটনাগুলো ক্রমশ এত জটিল হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, নিশ্চয়ই থই হারিয়ে ফেলেছে ওরা। এয়ারপোর্টের ঘটনাটা ওদের আগাম জানিয়ে রাখবে কি না, জানিয়ে রাখা ভাল কি না তাও এখন তার বিবেচ্য।

কিছুক্ষণ দোনামনা ভাবনার মধ্যে হঠাৎই তার কাছে হাজির হল আর এক অভিনব খবর। কয়েক দিন আগে মুম্বইয়ের ব্যস্ত লোকালয়ে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। পুলিশি তদন্তের ফলে ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে সেখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের রোমাঞ্চকর সব খবর। দুবাইয়ের সঙ্গে মুম্বইয়ের একটি সিনেমাতুতো সম্পর্ক আছে, তার ভেতর-বাহির সবটাই অনৈতিক ও অবৈধ। দুবাই থেকে রিমোট কন্ট্রোলে শাসন করা হয় মুম্বইয়ের রুপোলি পর্দার অনেকখানি জগৎ। এখন বিস্ফোরণের বারুদ খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে এসেছে একটা বিস্ফোরক খবর। বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীরাধার নাম জড়িয়ে গেছে এই আণ্ডারওয়ার্ল্ডের জগতের সঙ্গে।

খবরটা বিস্তারিত পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে গার্গীর।

## ॥ ৩১ ॥

মুম্বইয়ের নামী অভিনেত্রী শ্রীরাধা সম্পর্কে গার্গীর কিছুটা জানা ছিল কিছুটা জানা ছিল বিস্ফোরণের সূত্র ধরে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে শ্রীরাধার ব্যক্তিগত জীবন অনেকটাই ঘন কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশা সরালে কী তথ্য আবিষ্কৃত হবে তা

এখনও কেউ জানে না। গার্গীর উপলব্ধি হল, মুম্বইয়ের এই গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী স দর্শককুল এতকাল এমনই মোহে, সম্মোহে, টান-ভালবাসায় আপ্লুত ছিল যে, আর ডি জনিত কয়েকটা বিস্ফোরণ তাদের ভাবনার জগৎটাকেও চুরমার করে দিয়েছে।

দুবাইয়ের মাফিয়াচক্র খুবই শক্তিশালী, তাদের কৃষ্ণবর্ণ অর্থের জাল যে বহুদূর বিস্তৃত, তার টুকরো-টাকরা খবর কিছু কিছু এসে পৌঁছত এ দেশে। এখন জানা গে মুম্বইয়ের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সেকেণ্ড হোম নাকি দুবাইতেই। বিভিন্ন কারণে— কখনও অকারণেও তাদের ছুটতে হয় অনেক দেশ অনেক সমুদ্র পেরিয়ে সেই বহুখ্যা তেলাক্ত দেশটিতে। এও জানা গেল মুম্বইয়ের ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির বেশ অনেকটাই চলে দুবাইয়ে মাফিয়াচক্রের ভুরুর ইশারায়।

গার্গীর অবশ্য এত সব রুপোলি জগতের গুঞ্জনে কখনও উৎসাহ নেই। তার উপর সে রুপোলি পর্দায় এত কৃষ্ণবর্ণের প্রাদুর্ভাব তা জানাজানি হতে মনের পর্দা থেকে ঘটনাগুলে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইল দ্রুত।

কিন্তু মুছতে চাইলেই কি মোছা যায়। চমকপ্রদ অনেকানেক ঘটনার একটি হচে অভিনেত্রী শ্রীরাধা নাকি বহুকাল ধরে দুবাইয়ের কোনও এক বিখ্যাত মাফিয়া চাঁইয়ের সে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফলে এটা বাস্তব সত্য যে, বিস্ফোরণজনিত অনেক ক্ষতির একটা সম্ভব শ্রীরাধার অভিনেত্রী জীবনের এখানেই সমাপ্তি।

খবরটা শোনার পর থেকেই গার্গীব ভেতরে অসম্ভব তোলপাড়। কিছুতেই ভাবে পারছে না, এ দেশের ফিল্ম অনুরাগী দর্শকদের ঘুম কেড়ে নেওয়া এক অভিনেত্রী জীবনযাপন নিয়ন্ত্রিত হয় সুদূর দুবাই থেকে। তারা আঙুল নাড়লে তবেই নাকি শ্রীরা নির্বাচিত হবেন কোনও বিলিয়ন রুপেয়ার বাজেটের নায়িকার ভূমিকায়।

ঘটনাগুলোর আদি-অন্ত নাড়ীনক্ষত্র ভেবে ভেবে গার্গী যখন ব্যাকরণের ভাষা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তখনই একটা ফোন এল তার চেম্বারে, হ্যালো, আমি নিবেদিত বলছি—

—নিবেদিতা বল, কী খবর?

—খবরটা শুনেছিস তো?

—কোন খবর? গার্গী উৎসুক হল হয়তো 'আশ্রয়' সংক্রান্ত নতুন কোনও খবর পাওয় গেছে এই ভেবে।

—শ্রীরাধার খবর। শুনে অবদি আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

গার্গী যেন বুঝে উঠতে পারল না এই নক্ষত্র নারীকে নিয়ে নিবেদিতার শঙ্কার কী কারণ জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—রিয়াকে ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে তা নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে ভাবছি। এ দিন হয়ে গেল 'আশ্রয়' ছেড়ে চলে গেছে, এখনও পর্যন্ত একবারও চিঠি লেখে আমাদের। হতে পারে খুব বড়লোকের ঘরে মানুষ হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে কনভেন্টে, কি যে-প্রতিষ্ঠানে চার-চারটে বছর কাটাল, সেখানে সে আর কোনও ভাবেই যোগাযো করবে না!

শ্রীরাধার নাম যে মুহূর্তে মুম্বই বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরবর্তী সংবাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, গার্গী এরকম একটা কথাই ভাবছিল তখন থেকে। শুধু রিয়াই তো নয়, শিরিনেরও কোনও খবর পাওয়া যায়নি আজও। যে পাঁচটি কিশোরী 'আশ্রয়' থেকে অপহৃত হয়েছে শুধু তাদের কথাই ভেবেছে এত দিন। যাদের দত্তক দেওয়া হয়েছে তারা ছিল দুশ্চিন্তার বাইরে। রিয়া বা শিরিন সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছে যে, তারা খুবই ঐশ্বর্যের মধ্যে আছে। তাই পুরনো জায়গার কথা আর মনেই রাখেনি তারা। এখন নিবেদিতা আশঙ্কা করছে রিয়া ঠিকঠাক আছে তো শ্রীরাধার জিম্মায়!

কিছুক্ষণ ভেবেটেবে গার্গী বলল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র ফাদারই।

নিবেদিতার স্বরে উষ্মা, ফাদার তো নার্সিংহোমে গিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁকে কে এখন জিজ্ঞাসা করতে যাবে?

গার্গী চিন্তিত গলায় বলল, ফাদারের সঙ্গে 'আশ্রয়'-এর কেউ দেখা করেনি এখনও?

—না। দেখা করা নাকি স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড।

—শতভিষা রায় কি রোজই যাচ্ছেন দেখতে?

—সে তো দু'বেলাই! শতভিষাই তো এখন ফাদারের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। আরও কিছু কি না কে জানে!

নিবেদিতার কথায় যেন অন্য ইঙ্গিত। সে প্রসঙ্গ অবশ্য পরে ভাবা যাবে। আপাতত তার মতামত প্রকাশ করে বলল, রিয়াকে ফিরিয়ে আনাই বোধহয় ভাল। কিন্তু ফাদার একটু সুস্থ না হলে তাঁকে তো আর শ্রীরাধার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা যাবে না।

—ওদিকে রিয়ার গাঁয়ের লোকজন সেদিনও এসেছিল ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে। তারা খুবই ঝামেলা করে গেছে আঙ্কেল চট্টরাজের সঙ্গে। আঙ্কেল চট্টরাজ তো ভাল মানুষ গোছের। গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন খুবই। লোকগুলো নাকি সামনের সপ্তাহে আবার আসবে। এর মধ্যে যদি রিয়াকে এখানে না এনে রাখা হয়, তা হলে ভাঙচুর করতে পারে ফাদারের অফিসঘর। ওদের গাঁয়ের পার্টিও নাকি ঢুকে পড়েছে ঘটনাটার ভেতর। বুঝতেই পারছিস গাঁয়ে এখন পার্টিই সব। তারা একবার মাথা গলালে—

গার্গীর ভেতরও চারিয়ে গেল একটা প্রবল টেনশন। শ্রীরাধার সঙ্গে দুবাইয়ের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে বার্তা পৌঁছে যাবে সুদূর গাঁয়ের দেশেও। তার তাৎপর্য বুঝতেও দেরি হবে না তাদের। ঘটনাটা তালগোল পাকিয়ে কী যে দাঁড়াবে তা গার্গীও ভাবতে পারল না এই মুহূর্তে। অগত্যা বলল, কিন্তু আপাতত তাড়াহুড়ো করে তো কিছু করা যাবে না। ফাদার নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে 'আশ্রয়'-এ না ফিরলে—

নিবেদিত অদ্ভুতভাবে হাসল, ফাদার বোধহয় 'আশ্রয়'-এ আর ফিরবেন না। ফিরলেই তো তাঁকে মুখোমুখি হতে হবে হাজারো প্রশ্নের। এর পর রাই-অতসী-শেফালি ইত্যাদির গাঁয়ের লোকজনও তো আসতে শুরু করবে 'আশ্রয়'-এ। তখন তাদের কী উত্তর দেবেন ফাদার! সোস্যাল ওয়ার্ক করতে গিয়ে ফাদার যে খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু ফাদারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদটা বেশ আশ্চর্যের। তাঁর মাথার

ওপর এখন বিপদের উপর বিপদ। 'আশ্রয়'-এর কেউই আর তাঁকে পছন্দ করেন না। বরাবরই চেঁচামেচি করে, একে ওকে ধমক দিয়ে কাজ করিয়েছেন, হয়তো 'আশ্রয়'-এর স্বার্থেই। তব যিনি ধমক খেয়েছেন তার ভেতরে কিন্তু রয়ে যায় একটুকরো দ্বেষ বা অভিমান। তার ওপর এখন সবার মাথার ওপর শতভিষা রায়কে বসিয়ে দেওয়ায় 'আশ্রয়' সুদ্ধ মানুষ আরও ক্ষোভে, রোষে ফুটছে ভেতরে ভেতরে।

নিবেদিতার সঙ্গে আরও কিছু টুকটাক কথা বলে রিসিভারটা রাখল গার্গী। তার সামনে এখন অনেক চিন্তার ফুলঝুরি। ভাবনাগুলো কেবলই ফুলকি ছড়াচ্ছে মগজের নরম ঘিলুতে প্রতিটি ফুলকিই ছোট ছোট ক্ষত তৈরি করছে স্নায়ুর নরম কোষগুলিতে।

মুম্বইয়ের এত সব তোলপাড় করা ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর কালকের মুম্বই যাত্রা আদৌ হবে কি না তা গার্গীকে ভাবাল আর একবার। রেনেশাঁ বায়ু পরিবহণের পক্ষ থেকে আর কেউ যোগাযোগ করেনি তার সঙ্গে। গার্গীর একটা কনট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে রেখেছিল ওরা সেখানেও কোনও খবর নেই। গার্গী অবশ্য তার অফিসের বা বাড়ির নম্বর দেয়নি। ইচ্ছে করেই। তাতে তার আইডেনটিটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রেনেশাঁ কোম্পানির কাছে। তখন তার গোটা পরিকল্পনাই তো ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু যে-কনট্যাক্ট নম্বরটি সে দিয়ে এসেছিল, সেখানেও কোনও ফোন করেনি এরা অগত্যা ঠিক করল, অফিসের পর আজ একবার যাবে ক্যামাক স্ট্রিটের সেই অফিসটিতে।

হাতের আরও কিছু বকেয়া কাজ দ্রুত সেরে গার্গী আবারও বেরিয়ে পড়ল রেনেশাঁ বায়ু পরিবহনের অফিসে হানা দিতে। তার মধ্যেই অবশ্য বেশভূষা বদলে মিমি মুখার্জি হয়ে গেছে। আজ সেই ঢাউস লিমুনিজটা দাঁড়িয়ে নেই। ক্যামাক স্ট্রিটের অন্যান্য ব্যস্ততা বরাবরের মতোই টায় টায়। একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে সামান্য উৎকণ্ঠা নিয়ে দোতলার সেই অফিসটাতে ঢুকে পড়ল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুম্বই যাওয়া হচ্ছে কি না সেটাও যেমন ভাবনার, তেমনই উদ্বেগ যদি সত্যিই যাওয়া হয় তা হলে কী ঘটনা ঘটবে সেখানে।

কিন্তু রেনেশাঁর অফিসে ঢুকে আজ নতুন এক অভিজ্ঞতা। ভেতরের প্রশস্ত, ফিটফাট ঘরটায়—যেখানে এক সুপুরুষ ভদ্রলোক ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন সেদিন, সেই একই চেয়ারে আজ বসে আছে এক সুবেশা তরুণী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মতো। স্লিম, স্মার্ট চেহারা চোখেমুখে কথা বলে। খুব একটা সুন্দরী, তা নয়, কিন্তু কথায় বার্তায়, চাউনিতে, আলট্রা মডার্ন হাবভাবে নিজেকে স্মার্টতম বলে প্রতিপন্ন করাটা তার ঈপ্সিত। মিমি মুখার্জি নামে আর এক তরুণীকে তার চেম্বারে ঢুকতে দেখে যেন কতদিনের চেনা এমন ভঙ্গিতে বলল হা-ই।

মিমি মুখার্জিও যথাসম্ভব স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল, আশা করি কাল সকালের শিডিউল ঠিক আছে।

—অফ কোর্স। ভোর ছ'টায় এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং।

মিমি মুখার্জি যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল, উফ, নিশ্চিন্ত হলাম। এত টেনসন হচ্ছিল—

—কিসের টেনসন। আলট্রা তরুণী খিল খিল হেসে উঠে মিমি মুখার্জির বাকি টেনসনটুকুও কাটিয়ে দিতে চাইল।

—আসলে কলকাতার বাইরেই কখনও যাইনি তো। প্লেনেও চড়িনি কখনও। ভীষণ নার্ভাস লাগছে।

—নার্ভাস! আলট্রা তরুণীর চোখেমুখে ঘন কৌতুকরস উপচে পড়ে।

—না, মানে, কিউরিয়াসিটিও হচ্ছে খুব। একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করা, বুঝতেই পারছেন—

গার্গী তার স্বরে নার্ভাসনেস ফোটাতে চাইল যথাসম্ভব।

আলট্রা তরুণী হেসে ওঠে আবার, নতুন জীবনে একবার প্রবেশ করলেই দেখবেন জীবনটাই বদলে গেছে আপনার।

সামনে বসা তরুণীর সাদা সাপ্টা বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করল গার্গী, আচ্ছা, কী করতে হবে ওখানে?

—প্রথম ছ'মাস ট্রেনিং। যে কোনও চাকরির ট্রেনিং পিরিয়ডটাই সবচেয়ে সুখের। তখন কাঁধের ওপর কোনও দায়িত্ব থাকে না। একটু খাটুনি হয় ঠিকই, তবে ট্রেনিং শেষ হলে আসল কাজের দায়িত্ব। সেও এক ধরনের এনজয়মেন্ট। আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

—আপনি, মানে আপনিও কি ওই একই কাজ—

—অফ কোর্স। আমি তো ফার্স্ট ব্যাচে ট্রেনিং নিয়েছি। তখন কী ভয় করত আমার!

—হুঁ, প্লেনে চড়তেই তো ভয় করছে আমার। কখনও চড়িনি তো। এ রকম দিনের পর দিন প্লেনে চড়ে বেড়ানো—

—ইট'স নাথিং, আলট্রা তরুণী মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিল গার্গীর আশঙ্কা, বাকি জীবন তো এভাবেই ভেসে বেড়াতে হবে সুখসাগরে।

—আপনি বলছেন খুব লিউক্রেটিভ অফার!

—অফ কোর্স। একবার জয়েন করেই দেখুন না। ইউ উইল হ্যাভ এভরিথিং ইন লাইফ ইউ ওয়ান্ট।

—যা চাইব তাই পাওয়া যাবে?

—সার্টেনলি, রেনেশাঁ এমনই একটা সংস্থা যে তার কর্মীদের জীবনটাই বদলে দেয়। চাকরিতে ঢোকার আগে কী ছিলাম আমি, আর কী হয়েছি! ছ'মাসের ট্রেনিংয়ের পর যে জীবনে আপনি প্রবেশ করবেন তা আপনার কল্পনার বাইরে। অ্যাফ্লুয়েন্স অ্যাণ্ড অ্যাফ্লুয়েন্স অল অ্যারাউণ্ড। আপনার মতো একজন স্মার্ট মেয়ে জীবনে যা যা চাইতে পারে আপনি দেখবেন তার চেয়েও বেশি ঐশ্বর্য আপনাকে ঘিরে আছে।

—আচ্ছা, ওই যে একটা কাগজে সই করলাম যাতে লেখা আছে আগামী পাঁচ বছর বিয়ে করা যাবে না, সেটা কিন্তু বেশ শক্ত শর্ত।

—হ্যাঁ, এই একটা শর্তই যা একটু কঠিন। ট্রেনিঙের পর আপনাকে প্রথমে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্টে সই করানো হবে। পাঁচ বছর পর আপনাকে কন্ট্রাক্ট রিনিউ করতে অনুরোধ করা হবে। আপনি ইচ্ছে করলে রিনিউ করতে পারেন নাও করতে পারেন। রিনিউ না করলে ইউ আর দেন এ ফ্রি বার্ড। ফিরে যেতে পারেন আপনার পুরনো জীবনে। উইথ হিউজ অ্যামাউন্ট অব মানি। তবে পাঁচ বছরে আপনি এত সুখ আর ঐশ্বর্য ভোগ করবেন যে তখন আর পুরনো জীবনে ফিরতেই ইচ্ছে করবে না।

—সত্যিই! মিমি মুখার্জির চোখ আনন্দে চকচক করছে তখন, জানেন, আমার বাবা-মা একেবারেই চান না যে আমি চাকরি করতে এত দূরে যাই।

—ছাড়ুন তো বাবা-মায়ের কথা। তাঁরা তো মেয়েদের আঁচলের তলায় রেখে দিতে চান সারা জীবন। কিন্তু আপনার জীবনটা তো আপনারই। তাই না? আপনার জীবন কীভাবে গড়ে তুলবেন সেটা আপনিই ঠিক করবেন।

মিমি মুখার্জি হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু এত দিনের জন্য সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে সেটাও খুব চিন্তার তো!

আলট্রা তরুণী এবার ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল, এতক্ষণে একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন। যে পরিবারে মানুষ হয়েছেন সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে একটা মায়ার বন্ধন থাকে বটে। সেটা ছিঁড়ে হঠাৎ এত দূর দেশে যাওয়া, এতদিনের জন্য, তাতে মেয়ে হিসেবে আপনার মনে একটা চিন্তা ভনভন করবে তা মোটেই অন্যায় নয়। তবে এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরি আছে।

—থিয়োরি! মিমি মুখার্জির জিজ্ঞাসু চোখ।

—হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে একা আসে, একাই চলে যায় পৃথিবী থেকে। কেউ তার সঙ্গী হয় না। শুধু যে সময়টা পৃথিবীতে বসবাস করে, নানা মানুষ ঘিরে থাকে তার চারদিকে। তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে একজন মানুষের জীবনযাপন। সৃষ্টি হয় মায়ার। কিন্তু মায়া শব্দটাই খুব রিলেটিভ।

মিমি মুখার্জি বড় বড় চোখ করে বোঝার চেষ্টা করে তার সামনে উপবিষ্ট তরুণীর জীবন দর্শন।

—কেন রিলেটিভ তাও ব্যাখ্যা করি। ধরুন একটা বাচ্চা জন্ম থেকেই জানল এই তার বাবা এই তার মা এই তার ভাইবোন। তাদের নিয়েই তৈরি হল তার মায়ার সংসার। সে বড় হল। সাত আট বছর বয়সে হঠাৎ সে জানতে পারল তার চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষগুলো কেউ তার আত্মীয় নয়। তার আসল বাবা-মা তার জন্মের পরই তাকে ফেলে চলে গিয়েছিল অন্যত্র। যাদের কাছে সে মানুষ হয়েছে তারা আসলে তার পালক-পিতা বা পালক-মাতা। এবার সেই আসল বাবা-মা এসে দাবি করল তাদের ফেলে যাওয়া সন্তানকে। তখন কী হবে! সেই বালকটির মায়া কি ট্রান্সফার হয়ে যাবে তার নতুন—মানে আসল বাবা-মায়ের কাছে! মায়া কি এভাবে এক আধার থেকে আর এক আধারে মুহূর্তে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব!

যেন মিমি মুখার্জিকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছে এমন মুখভঙ্গি করে আলট্রা তরুণী তাকিয়ে থাকে। মিমি মুখার্জি তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আত্মস্থ করছে এই উপনিষদের গন্ধ মাখা থিয়োরিটা।

—আসলে মায়া ব্যাপারটাই চোখের ঘোর। সব মানুষের চোখেই এ রকম কিছু মায়াকাজল পরানো থাকে। ইচ্ছে করলেই এই মায়াকাজল মুছে ফেলতে পারে না কেউ। কারণ সাধারণ মানুষ খুব দুর্বল প্রকৃতির হয়। তবে মানুষের যদি প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে, তা হলে এই মায়াকাজল মুছে ফেলা সম্ভব। যেমন আমি একসময় ফেলেছিলাম।

মিমি মুখার্জির চোখ আরও বড় বড়, তার মানে আপনারও অনেক পিছুটান ছিল।

—অবশ্যই ছিল, আলট্রা তরুণীর চোখ দুটো সহসা একঝলক আর্দ্র হয়ে ওঠে। সবার মতো আমারও বাবা ছিল, মা ছিল, ভাইবোন ছিল, আর—

—আর!

—নাহ্, সে সব পুরনো কথা থাক। পাস্ট ইজ পাস্ট। সেই মায়াকাজল মুছে ফেলেই তো একদিন পা দিয়েছিলাম নতুন জীবনে। খুবই সাহসী পদক্ষেপ। অসম্ভব ঝুঁকিও ছিল সেই সিদ্ধান্তে। কিন্তু পরে বুঝলাম পুরনো প্রবাদগুলি এখনও কত জীবন্ত। আবার জানলাম নো রিস্ক, নো গেইন। পুরনো জীবন হেলায় ঠেলে ফেলে যে নতুন জীবন গ্রহণ করেছিলাম তার পাশে পুরনো জীবনটা মনে হয় জোলো, ছেঁড়াখোঁড়া। মুম্বইয়ের জীবনটায় শুধু ঐশ্বর্য আর ঐশ্বর্য।

—তাই! মিমি মুখার্জির চোখেমুখে গাঢ় উত্তেজনা।

—ইয়েস। আমার জীবনটা তো আমারই, তাই না? সো ডোন্ট হেজিটেট, কাল ভোরেই রিপোর্ট করুন এয়ারপোর্টে। ওখানকার রিসেপশনে আমি থাকব।

—থ্যাঙ্কু মিস—

—মিস রায়, বলে আলট্রা তরুণী একঝলক হাসি উপহার দিল মিমি মুখার্জিকে। একদম স্বর্গীয় হাসি। সেই মোহিনী হাসিতে মিমি মুখার্জির মতো একটি তরুণীও যেন ফ্ল্যাট।

—থ্যাঙ্কু, মিস রায়, বলে মিমি মুখার্জি হেলে দুলে বেরিয়ে এল চেম্বারের বাইরে, বারান্দায়, এখানে ওখানে কিছু অচেনা মুখ যা দেখে গা ছমছম করে। যিনি ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন সেই সুপুরুষ আর গুপ্তাকে কোথাও দেখা যায় কি না সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি ফেলতে লাগল মিমি মুখার্জি থেকে গার্গী চৌধুরিতে রূপান্তরিত হওয়া তরুণীটি। কিন্তু না, সমস্ত অফিসটা প্রায় সুনসান। অদ্ভুতুড়ে চেহারার লাগছে সন্ধের নিয়ন আলোয়। হয়তো ইন্টারভিউ নেওয়ার দিনের শশব্যস্ত রূপটা আপাতত অদৃশ্য বলেই আরও নির্জন লাগছে জায়গাটা।

বিল্ডিং থেকে নীচে নেমে ক্যামাক স্ট্রিটের মানুষজন উপচানো রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়িতে চেপে বসল গার্গী। ওপরের অফিস থেকে মিমি মুখার্জি যতখানি নিশ্চিন্ত মুখে নেমে এল, গার্গী চৌধুরি তার থেকে ঢের বেশি দুশ্চিন্তিত। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তার পরেই এক অনির্দেশ্যের পথে উড়ান। সে উড়ানের প্রান্তে কী আছে তা হয়তো দেবাঃ ন জানন্তি। রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে অব্যেসমতো লেটার বক্সটা খুলল গার্গী। ভারী অন্যমনস্ক তার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা। ভারী শ্লথ তার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা। ভারী এলোমেলো তার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চিঠিগুলোর মধ্যে একটা ভারী খাম দেখে উল্লসিত হল সহসা। খামটায় বিদেশি স্ট্যাম্প মারা। এসেছে সায়নের কাছ থেকে। তার ভেতর সায়নের ঝোড়ো হস্তাক্ষরের একটা লম্বা চিঠি। দম বন্ধ করে চিঠিটা পড়তে শুরু করল। আর কী আশ্চর্য, আলফা-বিটা-গামা-ডেল্টার সেই রুদ্ধশ্বাস বিবরণ পড়ে বিছানার ওপর বহুক্ষণ থ হয়ে রইল গার্গী। ঘটনাটা কোডে লেখা। তবু অসুবিধে হল না তার। অর্থাৎ কাল ভোরের উড়ান খুবই ঝঞ্ঝাটবহুল হবে। তা হোক, তবু বিষয়টার গভীরে তো এ ভাবেই ঢুকতে হবে তাকে।

## ॥ ৩২ ॥

সুদূর ইংলণ্ড থেকে পাঠানো সায়নের চিঠিটা একটি রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্পের মতোই। গল্পটা হ্যাম্পশায়ারের। ওখানকার টিভির পর্দায় একজন মহিলার ছবি দেখানো হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে। টিভির ঘোষিকা বারবার বলছিলেন এই মহিলাকে কেউ চেনেন কি না. চিনলে তাঁর নাম, পরিচয় বা ঠিকানা যেন অবিলম্বে জানানো হয় ওখানকার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে।

মহিলা যে একজন এশীয়, সম্ভবত ভারতীয়ই, এ কথাও বলা হয়েছিল ঘোষণায় হ্যাম্পশায়ারের লোকজন ভারী ব্যস্ত তাদের কাজকর্মে। তাদের এত সময়ও নেই টিভির পর্দায় দেখা একটি মহিলার মুখ মনে রাখতে বা তার নাম-পরিচয় ফোনে বা চিঠিতে জানিয়ে দিতে পুলিশের কাছে। কিন্তু ঘোষণার বিবরণটি এতই অদ্ভুত ছিল, এতটাই চমকে দেওয়ার মতো যে হ্যাম্পশায়ারের বাসিন্দারা নড়েচড়ে বসল রীতিমত।

ঘটনাটা হল এরকম ঃ হ্যাম্পশায়ারের এক অভিজাত এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি করোটি ও কিছু হাড়গোড়। রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট পার্ক করার উদ্দেশ্যে খোঁড়া হচ্ছিল জায়গাটা। হঠাৎ এরকম একটা আবিষ্কারে বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল এলাকায়। পুলিশকে খবর দিতে তারা করোটি ও হাড়গোড়গুলো তুলে নিয়ে যায় তাদের সদর দপ্তরে। করোটিটা কার তা জানা না গেলেও এটা কোনও খুনের কেস এ রকমই মনে হয়েছিল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ ইনস্পেক্টর রবার্ট এলিংহ্যামের। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন করোটিটা কোন দুর্ভাগার তার উৎস সন্ধানে।

রবার্ট এলিংহ্যাম খুবই দক্ষ ও চতুর পুলিশ ইনস্পেক্টর। তাঁর অধীনে যে মার্ডার-স্কোয়াডটি আছে তাতে পঞ্চাশ জন গোয়েন্দা সারাক্ষণ ব্যস্ত এলাকার যে কোনও অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ঘটনার তদন্তে। করোটিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথমেই সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। ল্যাবরেটরির প্যাথলজিস্ট জানালেন করোটিতে পাওয়া গেছে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন। তার অর্থ ভারী কিছু একটা দিয়ে বারবার আঘাত করায় মৃত্যু হয়েছিল তার। পরীক্ষান্তে আরও জানা গেল করোটিটা কোনও মহিলার। তাঁর বয়স তিরিশের মধ্যে।

রবার্ট এলিংহ্যাম তখন করোটিটা পাঠালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনির্ভাসিটির রিচার্ড নিয়েভের কাছে। তাঁর বিশেষত্ব হল তিনি মানুষের করোটি দেখে তার মুখাবয়ব তৈরি করে দিতে পারেন হুবহু। পারেন, কেননা মানব করোটির গঠনের তারতম্য অনুসারেই নির্ণীত হয় তার মুখের চেহারা।

রিচার্ড নিয়েভের তৈরি মুখাবয়ব হাতে পাওয়ার পর রবার্ট এলিংহ্যাম সেটির ফটো তুলে পাঠিয়ে দিলেন টিভির পর্দায় দেখানোর জন্য। টিভির পর্দায় দেখানোর পর ফোন ও চিঠি মিলিয়ে তিনটি খবর পেলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর। প্রথম চিঠিটা এল হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথ এলাকা থেকে। সেখানকার একজন ডাকপিওন চিঠি দিয়ে জানালেন মহিলাটিকে তিনি চিনতেন। তাঁর নামে প্রায়ই চিঠি আসত ইণ্ডিয়া থেকে। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকতেন পোর্টসমাউথের একটা তিনতলা বাড়ির দোতলায়। চিঠিতে তার ঠিকানাও নিখুঁত ভাবে লিখে দিয়েছেন ডাকপিওনটি।

দ্বিতীয় খবরটি এল গ্রেঞ্জ রোড থেকে ফোন মারফত। জানিয়েছেন একজন বৃদ্ধা বাড়িওয়ালি। তাঁর দাবি মেয়েটি তাঁর বাড়ির একতলায় বসবাস করত তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর নাম বয়স ইত্যাদিও জানিয়ে দিয়েছেন বিশদ বর্ণনা করে। তবে মেয়েটি কিছুদিন পরেই তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়। কেন গিয়েছিল তার কারণ অবশ্য তিনি জানেন না। তবে তার স্বামী এতে ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছিল।

তৃতীয় খবরটি এল হ্যাম্পশায়ারের আর এক অভিজাত এলাকা সাউদ্যাম্পটন থেকে। চিঠির প্রেরক জনৈক নীল হাটন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। তাঁর দাবি মেয়েটি তাঁর এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে থাকত। ক্লায়েন্ট বয়সে প্রৌঢ়। খুবই অর্থবান মানুষ। কিন্তু একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়ে শরণাপন্ন হয়েছিলেন আইনজীবীর। মেয়েটি বয়সে তরুণী। তার সঙ্গে প্রৌঢ়ের কী সম্পর্ক ছিল তা তিনি বলতে পারবেন না। তবে দুজনে প্রায়ই গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোতেন। নানারকম পার্টিতে যেতেন প্রতি সপ্তাহে। সেখানে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচতেন। দুজনেই প্রচুর মদ্যপান করে গভীর রাতে ফিরতেন বাড়িতে। বাড়ি ফেরার পর দুজনের মধ্যে মারামারি হত প্রায়শ। মেয়েটি মদ্যপান করার পর নাকি হিংস্র হয়ে উঠত, প্রৌঢ়কে হুমকি দিত খুন করবে বলে। বাধ্য হয়ে প্রৌঢ় থানায় একটি ডায়েরিও করে রেখেছিলেন মেয়েটির নামে। তারপর দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কয়েক মাস পর।

তিনটি খবর আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে ভারী বিভ্রান্ত বোধ করলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর রবার্ট এলিংহ্যাম। একটি মেয়ে তিন জায়গায় তিন জনের সঙ্গে বসবাস করেছে বাস্তবে তা তো আর সম্ভব নয়। তবু তিন জায়গাতেই তাঁদের খোঁজখবর করে দেখতে হবে কোন খবরটি ঠিক।

সেই মতো তাঁর গোয়েন্দাবাহিনী হানা দিল তিনটি ঠিকানাতেই। তত্ত্ব তালাশ করে যে খবর তাঁরা পৌঁছে দিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টরের কাছে তা আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ়প্রতিম। তিনটি দলই এসে জানাল, মেয়েটি সত্যিই তিন ঠিকানাতেই বাস করেছে তার বিভিন্ন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে। তবে প্রত্যেক দলই জানিয়েছে মেয়েটির বসবাসের কাল কোনও জায়গাতেই বেশি দিনের নয়। তিন পুরুষ সঙ্গীর বিবরণ ঠিক এ রকম ঃ

১. পোর্টসমাউথ এলাকায় যে তিনতলা বাড়িটির দোতলায় থাকত মেয়েটি, তার স্বামী সাধারণ ঘরের পুরুষ। উচ্চতায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো। ভারী অমায়িক। কথা বলতে পছন্দ করত খুব। আড্ডা দিতে তার জুড়ি নেই। তার পেশা সম্পর্কে তেমন খোলসা করে বলতে পারেননি বাড়িওয়ালা বা তার প্রতিবেশীরা। তবে বেশির ভাগ সময়েই বাড়িতে থাকতেন, সন্ধের পর বেরিয়ে যেতেন স্বামী-স্ত্রী। ফিরতেন অনেক রাতে। পার্টিফার্টিতে যেতেন এমন মনে হয়েছে বাড়িওয়ালা বা প্রতিবেশীদের।

২. গ্রেঞ্জ রোডে খবর নিয়ে জানা গেছে, মেয়েটির স্বামী চল্লিশ-উত্তীর্ণ এক ভারী চেহারার পুরুষ। উচ্চতা বড়জোর পাঁচ ফুট চার। খুব গম্ভীর স্বভাবের, কিন্তু স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন। কোনও প্রাইভেট কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করেন এমনই জেনেছিল পাড়া প্রতিবেশী। চাকরি ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় চলে যাবেন মনঃস্থির করেছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না দেশে ফেরার। মেয়েটি আসলে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বিলাসব্যসনে জীবন যাপন করাই ছিল ঈপ্সিত।

৩. সাউদ্যাম্পটনের আইনজীবী খবর দিলেন যে মেয়েটির, সে ছিল ভারী ছটফটে। জীবন যাপনেও ভারী এলোমেলো। যে পুরুষটির সঙ্গে থাকত, তিনি প্রৌঢ়, মাঝারি উচ্চতার।

একটা বড় কোম্পানির কর্ণধার। তা ছাড়া কিছু ছোটখাট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তাঁর কাজে। ফলে মেয়েটিকে সঙ্গ দিতে পারতেন না তেমন। তবে সময় পেলেই তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন।

পুলিশ ইনস্পেক্টর রবার্ট এলিংহ্যাম তিনটি পরস্পর বিরোধী রিপোর্ট পড়ে বুঝে উঠতে পারলেন না, তিনটি মেয়ে আলাদা আলাদা, না এক। পুরুষ তিনটির নাম অবশ্য জানা গেল তদন্ত থেকে, কেননা তাঁরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেখানকার ভাড়ার রসিদ ঘেঁটে আবিষ্কার করা গেল তাঁদের নাম ও অন্যান্য পরিচয়। কিন্তু মেয়েটির নাম পরিচয় তেমন পরিষ্কার ভাবে বলতে পারলেন না কেউই। কোথাও জানা গেল, তার নাম ডায়ানা, কেউ বলল ডালিয়া, কেউ বলল শুধু ডি। তবে মেয়েটির ফটো দেখে তিন জায়গার মানুষই জানালেন সে ওখানেই থাকত।

কিন্তু একই সঙ্গে তিন জায়গায় বসবাস করবে মেয়েটি তাও নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তখন গোয়েন্দাবাহিনী আবার ছুটল ঠিকানাগুলিতে মেয়েটির বসবাসের কাল নির্ণয় করতে। সেটা বার করাও খুব কঠিন। কারণ দেখা গেল সেই ঠিকানায় তার পুরুষ সঙ্গীরা যে সময়ে ওখানে বাস করেছেন তার পুরো সময় যদি মেয়েটি ওখানে বাস করে থাকে, তবে মেয়েটি একই সময়ে তিন জায়গায় বসবাস করেছে যা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। তবে তিন জায়গা থেকেই একটি তথ্য মিলল যে মেয়েটি সেই পুরুষের কাছে খুব বেশি দিন থাকেনি।

অনেক তথ্য ঘেঁটেঘুঁটে পুলিশ ইনস্পেক্টর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা এরকম ঃ মেয়েটি সাউদ্যাম্পটনের প্রৌঢ়ের সঙ্গে থাকত একেবারে প্রথম দিকে। বসবাসের সময়কাল মোটামুটি দু' বছরের মতো। গ্রেঞ্জ রোডে বসবাস করেছিল ঠিক তার পরের এক বছর। সব শেষে বাস করেছিল পোর্টসমাউথের যুবকের সঙ্গে। সেখানে তার বসবাসের সময়সীমা ন' মাসের মতো।

গোয়েন্দাবাহিনী আরও যে তথ্য সংগ্রহ করল তাতে জানা গেল সাউদ্যাম্পটনের প্রৌঢ় মানুষটি কোন দেশীয় তা ঠিক আবিষ্কার করা যায়নি, কারণ তিনি ইংরেজি বলতেন যে রকম অনর্গল, তেমনই স্পানিশ, ইতালি, এমনকী নানাবিধ এশীয় ভাষাও। চিনা ভাষাতেও নাকি খুবই স্বচ্ছন্দ। কিন্তু বাকি দুই পুরুষ যে ভারতীয় তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েটির সম্ভাব্য ঠিকানাও পাওয়া গেল দক্ষ গোয়েন্দাবাহিনীর তদন্তের ফলে। ইণ্ডিয়া থেকে আসা তার নামের চিঠির সূত্র ধরে। ল্যাবরেটরির প্যাথলজিস্টরা মেয়েটির করোটি পরীক্ষান্তে জানিয়েছিলেন ভারী কোনও কিছুর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছিল। সে কারণে বিষয়টি ওখানেই আর চাপা থাকেনি। গোয়েন্দাবাহিনী অনুমান করেছিল খুনই করা হয়েছে মেয়েটিকে। খুন করে পুঁতে রাখা হয়েছিল এমন একটি নিরিবিলি পথের পাশে যেখানে সচরাচর নজর পড়বে না কারও। মেয়েটির ঠিকানা অনুসরণ করে গোয়েন্দাবাহিনীর একটি টিম ভারতবর্ষে এসে যে-কাহিনী আবিষ্কার করেছে তাও রোমাঞ্চকর। খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই তরুণী প্রথম বয়সে ভালবেসেছিল একই শহরের এক মেধাবী যুবককে। যুবকটি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পরীক্ষান্তে স্কলারশিপ পেয়ে সে পড়তে যায় ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাওয়ার সময় কথা দিয়ে যায় দেশে ফিরে এসে বিয়ে করব মেয়েটিকে। ইংলণ্ডে পাড়ি দেওয়ার পর হয়তো কোনও কারণে যুবকটি আর চিঠি দিয়ে উঠতে পারেনি। কিছু দিন অপেক্ষা করার পর যুবকটির কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় মেয়েটি আর রাজি হয়নি অপেক্ষা করতে। চরম বেহিসেবির মতো কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করে একদিন পাড়ি দিল ইংলণ্ড অভিমুখে।

এ সব ক্ষেত্রে যা হয়, মেয়েটি তার প্রেমিকের কাছে হঠাৎ ওভাবে উপস্থিত হতে ভীষণ হকচকিয়ে গেল সেই যুবক। সে তখন হস্টেলে থাকে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার, তুমি এখানে? কারও বাড়িতে বেড়াতে এসেছ নাকি?

তরুণী সরাসরি বলেছিল, কারও বাড়িতে আসতে যাব কেন? তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে? যুবককে খুবই দিশেহারা দেখিয়েছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, এভাবে খবর না দিয়ে কেউ আসে নাকি!

যুবকটি কিন্তু মেয়েটিকে তাব কাছে আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। তার বক্তব্য ছিল এভাবে কোনও মেয়েকে হোস্টেলে থাকতে দেওয়া যায় না। মেয়েটির যুক্তি ছিল তারা দুজনে বিয়ে করে ম্যাঞ্চেস্টারেই থাকবে যতদিন না যুবকটির পড়া শেষ হয় ও তারা দেশে ফেরে।

যুবকটি তাতেও রাজি হয়নি। মেয়েটিকে বলেছিল তখনই দেশে ফিরে যেতে। একরকম অপমান করেই হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেয় তাকে।

ঘটনাটা এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত কবে সায়ন অতঃপর লিখেছে, মেয়েটির করুণ জীবনকাহিনী এখানকার সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে বেশ গুরুত্ব দিয়ে। অপমানিত, হতাশ তরুণী হস্টেলের বাইরে বেরিয়ে বসে ছিল রাস্তার পাশের একটি পার্কে। সেদিন মেঘলা দিন ছিল, বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হয। ঝুপঝুপ করে বরফ পড়তেও শুরু করে সন্ধের পর। একটি ভারতীয় মেয়েকে এভাবে অসহায় ভিজতে দেখে এক প্রৌঢ় গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ান সেখান। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন তার জীবনের করুণ ঘটনাক্রম। বিচলিত প্রৌঢ় তাকে সেখান থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসেন তাঁর বাড়িতে।

শুনে হয়তো অবাক হবে গার্গী, এই প্রৌঢ়ই সেই তিন ব্যাঙ্ক-প্রতারকের একজন। যে বাড়িটিতে তিনি থাকতেন, সেখানকার এক পুরনো গৃহভৃত্য কাহিনীর এইটুকু জানাতে পেরেছে গোয়েন্দাবাহিনীকে। পুলিশের অনুসন্ধান তাতে আরও ঘনীভূত হয়। তদন্তের ফলে জানা যায় যে তিন পুরুষের কাছে মেয়েটি পর্যায়ক্রমে বসবাস করছিল তারা সেই বিখ্যাত ট্রায়ো—আলফা, বিটা আর গামা। আর বুঝতেই পারছ মেয়েটি সেই ডেল্টা। একটি বিপর্যস্ত তরুণী কীভাবে তিন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কাটাল, সে কাহিনীও রোমহর্ষক। আপাতত জানাই পুলিশ এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে তিন প্রতারকের সন্ধানে। কিন্তু তিন জনেই কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিন্ত নয়। প্রতারণার ঘটনাটা অনেক দিনের পুরনো। সম্ভবত ভারতবর্ষেই পালিয়ে গেছে তারা। ঘটনাটা যেহেতু ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিলাসবহুল শহরে, ইংলণ্ডের পুলিশের তত মাথা ব্যথা নেই সেই প্রতারণার ব্যাপারে। তবে ডেল্টা নাম্নী যুবতী খুনের মামলাটাই এখন তাদের শিরঃপীড়ার কারণ। পুলিশ অবশ্য সন্দেহ করছে, শেষ যে ব্যক্তির সঙ্গে ডেল্টা বসবাস করেছে, খুনি সে-ই। কারণ করোটি ও হাড়গোড়ের অবশিষ্ট পাওয়া গেছে হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথ এলাকায়...

সায়নের বিশাল ঘটনাবহুল চিঠিটা পড়তে পড়তে ভারী আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও সংবাদপত্রে কোনও ভারতীয়-সংক্রান্ত ঘটনা এত প্রাধান্য পায় না। এই বিষয়টি নিয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে ঘটনাটির বৈচিত্রের কারণেই। সবশেষে সায়ন লিখেছে, তোমাকে ঘটনাটা এত দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে লিখলাম তোমার অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের কথা ভেবে। এ কাহিনী থেকে হয়তো আমার গোয়েন্দা স্ত্রীরত্ন কোনও শিক্ষণীয় তথ্য পেলেও পেতে পারেন।

চিঠিটা বার দুই পড়ে ঘটনাগুলো কিছুক্ষণ ভাবল গার্গী। কাল ভোরেই তাকে রওনা দিতে হবে এক অজানা উড়ানে সামিল হয়ে। তার সঙ্গে সায়নের এই চিঠিটা কোনও গূঢ় ইঙ্গিত নয় তো! ডেল্টা নামের সেই বেহিসেবি তরুণী অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে যে ভয়ঙ্কর পরিণতিতে পৌঁছেছে, সায়নের চিঠি হয়তো বহন করছে তারই ইশারা। গার্গীকে সতর্ক করে দিতেই বোধহয় চাইছে সায়ন।

কিন্তু গার্গী তার সিদ্ধান্তে অটল। কাল ভোরের উড়ান কিছুতেই মিস করতে চাইছে না সে। নিশ্চিত কিছু একটা প্রাপ্তি আশা করছে উড়ান-এপিসোড থেকে।

অতএব গার্গী প্রস্তুত হচ্ছিল অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই বিছানায় যাবে বলে। সে সময় রাত্রির নিশুতি ভেঙে ফোনের পিঁক পিঁক পিঁক শব্দ, হ্যালো।

—নিবেদিতা বলছি। এইমাত্র থানা থেকে খবর এল সমুদ্রনীলকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ।

—তাই নাকি! গার্গী ছিটকে ওঠে, কোত্থেকে ধরল, কীভাবে? কখন?

—তা বলেনি। শুধু জানিয়েছে বমাল ধরা পড়েছে সে।

—বমাল।

—হ্যাঁ। যাদের অপহরণ করেছিল 'আশ্রয়' থেকে, সেই মেয়েদেরও পাওয়া গেছে তার সঙ্গে।

—সবাইকে পাওয়া গেছে ! গার্গী আশ্চর্য হচ্ছিল।

—হয়তো সবাইকে নয়। কাউকে কাউকে। কিন্তু দারুণ খবর, তাই না?

—অবশ্যই।

—দুই আঙ্কেল গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। অনেক দিন পর আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে। কী বল?

গার্গী অবশ্য অতখানি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলার পর সে পরক্ষণেই বোতাম টিপে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করল, হ্যালো, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে একবার দেবেন?

একটু পরেই ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জির গলা পাওয়া গেল, হ্যাঁ, বলুন মিসেস চৌধুরী...

—সমুদ্রনীলকে ধরতে পারলেন তা হলে?

—হ্যাঁ। এটা একটা বড় সাকসেস আমাদের। ওকে ধরার জন্য কী ভাবে যে জাল ছড়িয়েছিলাম ভাবতে পারবেন না!

—ওর সঙ্গে মেয়েরা সবাই ছিল?

—সবাইকে এখনও পাওয়া যায়নি। আপাতত একজনকেই পাওয়া গেছে। আশা করছি বাকিদের আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। কালপ্রিটকে যখন পেয়েছি...

—সমুদ্রনীলের সঙ্গে কাকে পেলেন, মি. চ্যাটার্জি?

—মেয়েটার নাম বলল রাই।

—রাই! গার্গী নিশ্চিন্ত হল তার অনুমানে। তারপর হেসে বলল, বাকিদের কিন্তু চট করে পাবেন না, মি. চ্যাটার্জি।

—কেন! কেন পাব না? দ্যুতিমান উত্তেজিত।

গার্গী হেসে আরও কিছু বলল সাফল্যে উল্লসিত পুলিশ ইনস্পেক্টরকে। তাঁর সাফল্যের বেলুনটা তার কথার টুকরো টুকরো ইঙ্গিতে ফুটো করে দিয়ে হাসল এক ঝলক, বলল, ঠিক আছে। ঠিক ঠিক সময়ে আবার দেখা হবে, মি. চ্যাটার্জি।

রিসিভার রেখে গার্গী তখনও নিজের মনে হাসছে। কাল সকালের উড়ানের কথা ভেবে উৎকণ্ঠাও হচ্ছে কম নয়।

তার এখন একটাই চিন্তা। কী হবে কাল! তার পরিকল্পনা সব হুবহু মিলবে তো! নাকি 'আশ্রয়'-এর অন্তর্হিত মেয়েদের তালিকায় যুক্ত হবে আর একটি নাম—গার্গী চৌধুরি!

## ॥ ৩৩ ॥

খুব ভোরে উঠে শরৎ বসু রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় গার্গী মনে মনে ভাবছিল, আজ তার একটা বড়সড় পরীক্ষার দিন। যে বিশাল চক্র তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের উড়ানে সামিল হতে, তার ল্যাজামুড়ো কোনওটাই তার কাছে পুরো পরিষ্কার নয়। কিন্তু তাদের র‍্যাকেটটা যদি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতেই হয়, তা হলে এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি তাকে আজ নিতে হবে।

এর আগেও সে আরও অনেকগুলো ছোটবড় রহস্যের সমাধান করেছে। অনেকবারই তাকে কিছু ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। বিপদেও পড়েছে বহুবার। তারপর অনেক বিপত্তি পেরিয়ে একসময় সমাধানেও পৌঁছেছে সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু আজকের ঝুঁকিটা বোধহয় একটু বেশিই।

রতনকে বলেছিল খুব ভোরবেলায় তাকে পৌঁছতে হবে এয়ারপোর্টে। রতন ভারী সময়ানুবর্তী, যথেষ্ট দক্ষও স্টিয়ারিং হাতে। এখন ভোরের হাওয়ায় তাকে নিয়ে দ্রুত পার হয়ে চলেছে বিজন সেতুর ঢেউ। ওপারে আর এক কলকাতা। নতুন গড়ে উঠতে থাকা কলকাতা। ঢেউয়ের ওপারে আর এক সমুদ্র। তবে নিউ দিল্লির মতো তার নিউ ক্যালকাটা নামকরণ হয়নি ভাগ্যিস।

সেই আধুনিক কলকাতার প্রান্ত ঘেঁষে বয়ে যাওয়া ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে একটু পরেই তুফান তুলল রতনের পায়ের নীচের অ্যাকসিলেটর। ভোরের সরলসোজা পিচ রাস্তা এখনও ঠিক আড়মোড়া খেয়ে জেগে ওঠেনি। তার আগেই একটা গাড়ি এমন পথ তোলপাড় করে কেন ছুটে চলছে জানতে আগ্রহী হচ্ছিল ইস্টার্ন বাইপাসের ধুলোগুলোও। আসলে তারা তো জানে না একটু পরেই গার্গী সামিল হতে যাচ্ছে এক আশ্চর্য উড়ানের।

'আশ্রয়'-এর ঘটনাগুলো তখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যাচ্ছে তার মগজের ঘিলুর ভেতর। যেন ভাবনাগুলো এক-এক চিলতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। তারা শাঁসে জলে বেড়ে উঠে মিশছে একে অপরের সঙ্গে। সবগুলো একসঙ্গে জোড়া লাগালে হয়তো গোটা আকাশটাই ভরে যাবে কালো মেঘে। হয়তো ঝড় ওঠার আগের আকাশ সেটাই।

ঠিক ছ'টায় রিপোর্টিং। কব্জিতে নজর রেখে গার্গী দেখল সাড়ে পাঁচটা। যে রকম টর্নেডো গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে রতন, তাতে গার্গীও নিয়মানুবর্তিতার নমুনা বজায় রাখতে পারবে নিশ্চিত। এ সব রাস্তায় এত ভোরে যারাই গাড়ি নিয়ে ছুটছে, বেশির ভাগ মানুষেরই গন্তব্য এয়ারপোর্ট। রতন তাদেরকেও টপকে ছুটে চলেছে হু হু। যেন সবার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে গন্তব্যে।

গার্গী অবশ্য এই মুহূর্তে আর ঠিক গার্গীর চেহারায় নেই। তার শাড়ি-পরিহিতা বাঙালি ললনার শোভন অবয়বটি আপাতত অদৃশ্য। পরিবর্তে রংচটা জিন্‌সের চাপা প্যান্টের ওপর ধবধবে সাদা টি-সার্ট পরে সে এখন মিমি মুখার্জি। হাতের ছোট্ট ভ্যানিটিব্যাগের বদলে কাঁধে চামড়ার বড়সড় ব্যাগ। রঙিন কাপড়ের একটি স্যুটকেসও সঙ্গে। কী হবে, কী হবে গন্তব্যে পৌঁছলে সেই ভাবনাটাই আপাতত কামড় দিয়ে চলেছে কাঠপিঁপড়ের মতো।

সায়ন এই মুহূর্তে কলকাতায় নেই বলেই যা একটু চিন্তা। সায়ন জানতেও পারছে না গার্গী কী ভীষণ ঝুঁকি নিতে চলেছে। এ প্রায় আত্মহত্যার সামিল। মাত্র আর কিছুক্ষণ পরেই নির্ণীত হবে তার ভবিতব্য। তার চারপাশের পৃথিবী ছেড়ে সে কোথায়, কোন অপার্থিব লোকে গিয়ে পৌঁছবে তার কিছুই জানে না। যেন কয়েকটা ট্যাবলেট মুখে পুরে এক গ্লাস জল খেয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়া। কোনও দিন সেই ঘুম আর ভাঙবে না এই জেনে। নাকি ঘুম ভাঙেও। ঘুম ভাঙার পর দেখবে সে আর সে নেই। গার্গী চৌধুরি রূপান্তরিত হয়ে গেছে অন্য একটি সত্ত্বায়। হয়তো সে ভয়ঙ্কর কোনও সত্ত্বা। তার এই নিজস্ব সত্ত্বাটাই আর খুঁজে পাবে না। হয়তো তার জন্যে অপেক্ষা করছে কোনও সাংঘাতিক পরিস্থিতি।

গার্গী আর ভাবতে পারল না। একবার মনে হল রতনকে বলে, 'রতন, ঘুরিয়ে নাও গাড়ির মুখ। যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, আর যেতে হবে না।' কিন্তু তার মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুল না। কেউ যেন তার গলার টুঁটি টিপে ধরেছে। যেন তাকে যেতে হবেই। কোনও গত্যন্তর নেই। তার ভবিতব্য লেখা হয়ে রয়েছে অন্য ভাবে। সে এখন একটাই চিন্তায় আন্দোলিত, যা হোক একটা কিছু হয়ে যাক। হয় এস্পার না হয় ওস্পার। শৈশব থেকেই সে ভেতরে লালন করে আছে একটা অদ্ভুত জেদ। যা মনস্থ করে, সে দিকে ছুটে যাওয়াই তার লক্ষ্য। সায়ন অনেকবার তাকে বুঝিয়েছে, 'জেদ ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু জেদের অন্তিম লক্ষ্য বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত। কী করছি, কী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে শুধু জেদের বশে কোথাও ছুটে চললাম, তা আত্মহত্যার সামিল জেনেও, সেটা বোধহয় ঠিক নয়।' গার্গী নিশ্চিত, সায়ন কলকাতায় থাকলে তাকে এভাবে অন্ধের মতো অন্ধকারের দিকে ছুটে যেতে দিত না।

কিন্তু ছুটে না গিয়েও বা গার্গী কী করে! 'আশ্রয়'-এর অদ্ভুত সব ঘটনার ভেতর এমন ভাবে ঢুকে পড়েছে, তার অন্তিম পর্ব না দেখা পর্যন্ত তার নিস্তার নেই। তার কৌতূহল বরাবরই অপরিসীম! এত এত ক্লু এখন তার হাতের মুঠোয়, এত বিচিত্র সব চরিত্র তার চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে নির্বিঘ্নে, তাদের মুখোশ খুলে না দিয়ে সে নির্বিকার দেখে যাবে তাও তো পারবে না।

এলোপাতাড়ি এমন সব ভাবনার মধ্যে কখন যে রতন ভি আই পি রোড শেষ করে ঢুকে পড়েছে এয়ারপোর্টের রাস্তায়, তা খেয়ালই হয়নি এতক্ষণ। চমক ভেঙে দেখল সামনেই ঝকঝকে এয়ারপোর্ট তার রাজকীয় চেহারা নিয়ে অপেক্ষমাণ। প্রতি মুহূর্তে সে গিলে নেয় অজস্র যাত্রী। নানা দেশের, নানা গন্তব্যের। একটা লম্বা উড়ানের পর তাদের উগরে দেয় বহু

দূরে। প্রায়শ সমুদ্রের পর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। আজ গার্গীকেও সেভাবে গিলে নেবে তার কালো গহ্বরের ভেতর।

কার পার্কিঙের প্রশস্ত জায়গাটিতে গাড়ি থামতেই—গার্গী নয়, নেমে এল মিমি মুখার্জি নামের প্রায়-আধুনিকা তরুণীটি। কাঁধে ব্যাগ, হাতে সুটকেস। তার চলনের ঢংটিতেও বদল ঘটেছে। সে নামতেই রতন জিজ্ঞাসা করল, চলে যাব, না অপেক্ষা করব, ম্যাডাম।

গার্গী থমকাল একলহমা। ভাবল। তারপর বলল, চলে যাও।

লাউঞ্জের দিকে একটু এগোতে দেখল প্ল্যাকার্ড হাতে একজন লোক ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে। তাতে লেখা, রেনেশাঁ। তার কাছেই জনা পনেরো ঝকঝকে তরুণী উৎসুক মুখে দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল এরাও তার মতো মুম্বই অভিযানের শরিক। মিমি মুখার্জির সঙ্গে এদের একটাই তফাত, মিমি জানে এই গন্তব্যের শেষে অপেক্ষা করে আছে কী নিয়তি, অন্যেরা কেউই জানে না।

থিতু হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সে জরিপ করতে লাগল হবু বিমানসেবিকাদের চেহারা, মুখচোখ। যে সুপুরুষ ব্যক্তিটি ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের দিন উপস্থিত ছিলেন ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে, বোঝাই যাচ্ছে তাঁর চোখ জহুরির চোখ। কয়েকশো তরুণীর কথাবার্তা, ফিগার, চালচলন, শুনে-দেখে তিনি যাদের নির্বাচিত করেছেন 'বিমান সেবিকা' পদের জন্য, প্রত্যেকেই দীর্ঘাঙ্গী, চটুল, উচ্চাভিলাষী। মুখে ইংরেজি বাংলা হিন্দির খই। যত সময় যাচ্ছে, তাদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমে। গার্গী তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোয় সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল ষোলোয়। তারপর প্রতিমুহূর্তে এক-একটি প্রসাধনে-ওতপ্রোত তরুণী হাজির হয়ে বাড়িয়ে চলেছে সংখ্যাটি। ষোলো থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে তিরিশ। একসময় তিরিশ থেকে চল্লিশে পৌঁছয় সংখ্যাটা।

মিমি মুখার্জির ছদ্মবেশে গার্গী তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, রেনেশাঁ এয়ারলাইনসের হাঁ-টা ঠিক কত বড়। কতগুলি তরুণী সে একেবারে হজম করতে পারবে। কী 'উজ্জ্বল' ভবিষ্যৎ সে গড়ে দিতে পারবে এতগুলি নিরীহ অথচ উচ্চাকাঙক্ষী তরুণীকে।

সকালের আলো তখন থিকথিক করছে এয়ারপোর্টের বাইরে। লাউঞ্জের ভেতর নিয়নের আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে সকালের আলো। সেই সঙ্গে এতগুলি উজ্জ্বল তরুণীর চোখ-ধাঁধানো ছটায় সমস্ত লাউঞ্জে দ্বিগুণ আলোর ঝলকানি। ঠিক সেই মুহূর্তে আরও এক পশলা আলো ছিটিয়ে সেখানে হাজির হল অন্য এক তরুণী—গতকাল সন্ধেয় ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে দেখা সেই আলট্রা-মডার্ন, ছটফটে মেয়েটি। তার পরনে পা পর্যন্ত ঘন নীল রঙের গাউন, ওপরে সাদা টপ। তাতে বেশ আকর্ষক হয়ে উঠেছে তার অনতিস্লিম চেহারাটা। যেন তার উপস্থিতিতে একটা মেমসাহেব-মেমসাহেব ব্যাপার। লাউঞ্জে উদিত হয়েই মিষ্টি হাসির গোলাপজল ছেটাল, হা-ই।

তরুণীগুচ্ছও চোখেমুখে দ্বিগুণ সুগন্ধি ছেটায়, গুড মর্নিং, ম্যাডাম।

—মর্নিং টু অল। আমরা এবার যাত্রার জন্য তৈরি। রানওয়েতে বিমানও প্রস্তুত। আমাদের সংস্থার কর্ণধার এখনই এসে পৌঁছবেন। এসে পড়বেন আমাদের সংস্থার উপদেষ্টাও। তার পরেই আমরা পাড়ি দেব মুম্বইয়ের পথে। ততক্ষণে আসুন আমরা বিমানে যার-যার সিটে গিয়ে বসি। এর মধ্যে আপনাদের লাগেজগুলোর চেকিং হবে। চেকিং শেষ হলে ঠিক ঠিক সময়ে সেগুলো পৌঁছে যাবে বিমানে। আসুন।

আলট্রা-তরুণীর পিছু পিছু অতঃপর রানওয়ের দিকে সারবন্দি যাত্রা। একটা বাস আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল রানওয়ের এ প্রান্তে। তাতে উঠে বসতেই বাসটা চলতে শুরু করল।

ভাবী বিমানসেবিকারা তখন উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, কৌতূহলে টগবগ করছে। সমবেত কলস্বর উপচে পড়ছে বাসের জানলা ভেদ করে। কাছেই অপেক্ষমান মাঝারি আকারের বিমানটির সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে উঠে বসতেই কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। স্ফূর্তি, আকাঙক্ষা, বিভ্রম সব মিলেমিশে একাকার। সেই স্তব্ধতা ফেটে উদ্দাম কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ার আগেই শোনা গেল মাথার ওপর ছোট ছোট অ্যামপ্লিফায়ারে ভরাট গলার কণ্ঠস্বর ঃ লেডিজ—

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান' নয়, শুধুই 'লেডিজ'। কেননা এখনও পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষের চেহারাও চোখে পড়েনি কারও। আলট্রা-তরুণী, কাল সন্ধেয় যে নিজেকে 'মিস রায়' বলে পরিচয় দিয়েছিল, সে-ই সম্ভবত পরিচালনার দায়িত্বে আছে। সিঁড়ি বেয়ে বিমানে ওঠার মুখেই একজন তত-তরুণী নয় বিমানসেবিকা। ঠোঁটে পুরু করে লিপস্টিক মেখে চোখে আইলাইনার ইত্যাদিতে জবরজং হয়ে অপেক্ষা করছিলেন তরুণীদের জন্য। লিপস্টিকের সঙ্গে পরা ছিল হাসির চশমা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে খুনখারাবি-রঙের গোলাপফুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'উইশ য়্যু হ্যাপি জার্নি।' এখন আবার ভারী কণ্ঠস্বরে কোনও অদৃশ্য পুরুষ বলতে শুরু করলেন, লেডিজ, ইউ আর অল ওয়েলকাম টু দ্য ফ্যামিলি অব রেনেশাঁ...

কণ্ঠস্বরে এমনই একটা আন্তরিকতা তার সঙ্গে এমনই কথার জাদু যে তাতে একটা সম্মোহনের রেশ ছুঁয়ে গেল সবার ভেতর। কণ্ঠস্বর তখন সুন্দর উচ্চারণে বলে চলেছে, আর একটু পরেই শুরু হবে আমাদের উড়ান। কিন্তু এটা শুধু উড়ানের শুরুই নয়, জীবনের শুরুও। বাকি জীবন এভাবেই ভেসে বেড়াতে হবে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। সে জীবনের সর্বত্রই শুধু ঐশ্বর্য আর ঐশ্বর্য। রেনেশাঁ আপনার জীবনটা ভরিয়ে রাখবে এত বৈভবের ভেতর যে কিছুদিন পরে আপনার আর মনেই থাকবে না আপনি কী ছিলেন, কোন জায়গা থেকে উঠে এসেছেন, আপনার কোনও পিছুটান ছিল কি ছিল না। কিছুকাল পর আপনার হয়তো মনে হতে পারে আগের জীবনে ফিরে গিয়ে কী আর লাভ!

মিমি মুখার্জি ওরফে গার্গীর কাছে তখন বক্তব্যের সবটাই যেন দ্ব্যর্থবোধক। প্লেনের ভেতর ঠাসাঠাসি তরুণীরা তখন সোনাহেন মুখ করে শুনে চলেছে গমগমে কণ্ঠস্বরের বাণী। এক-পৃথিবী ঐশ্বর্যের খবরে সবাই রুদ্ধশ্বাস। দীর্ঘ উড়ানের আগে সিলভার টনিক দিয়ে তরুণীদের মাথা ঘোরানোর আয়োজন। তার মধ্যেই হাসির চশমা পরা সেই বিমানসেবিকা প্লেটে ভরে নিয়ে এলেন চকোলেট-টফি আর তুলো। সবাই হাতে হাতে তুলে নিচ্ছে সেগুলো। মিমি মুখার্জিও তুলে নিল। তার মধ্যেই তার সতর্কদৃষ্টিতে ধরা পড়ল সেই সব মুখ যাদের সে আশা করেছিল বিমানের ভেতর দেখতে পাবে। আশা করেছিল, না আশঙ্কা করেছিল!

গম্ভীর কণ্ঠস্বর তখন আরও শোনাচ্ছে, লেডিজ, রেনেশাঁ সম্পর্কে আপনারা অনেকেই তখন খোঁজখবর নিয়েছিলেন। রেনেশাঁ কাদের সংস্থা, কতদিনের সংস্থা, রেনেশাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি কতটা! আমাদের কাছে যারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছি। কেউ কেউ আবার আমাদের জবাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি, তারা বাইরের অনেক ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে খবর জানতে চেয়েছিলেন রেনেশাঁ সম্পর্কে। সব খবর নেওয়ার পরও যখন এত জন তরুণী আমাদের সংস্থায় যোগ দিতে আগ্রহী, তাতেই বোঝা যাচ্ছে রেনেশাঁর গুডউইল যথেষ্ট। রেনেশাঁ সম্পর্কে বাকি তথ্য পেয়ে যাবেন গন্তব্যে পৌঁছলে। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট তথ্য জানাই। আপনারা জানেন রেনেশাঁ শব্দের অর্থ নবজাগরণ। রেনেশাঁয় জয়েন করলেই আপনারা যে নতুন জীবনে জেগে উঠবেন এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

আপনাদের নতুন জীবনকে স্বাগত জানাই। আপাতত কথা থামাচ্ছি, কারণ আমাদের বিমানেব ক্যাপ্টেন এখনই এসে পৌঁছবেন। তিনি বিমানে উঠলেই শুরু হবে উড়ান। ও. কে.।

ভরাট কণ্ঠস্বর থেমে যেতেই বিমানের ভেতর কিছুক্ষণ থমথম। তারপর শুরু হল গুঞ্জন। তরুণীরা একে অপরের সঙ্গে কথা শুরু করেছে। মিমি মুখার্জির পাশেই বসেছে কুড়ি-একুশ বছরের এক তরুণী। বেশ মড চেহারা। তার সঙ্গে একটু কথা বলেই কিন্তু মিমি মুখার্জি বুঝে গেছে, খুবই নার্ভাস বোধ করছে মেয়েটি। তার নাম রবিনা মল্লিক। উত্তর কলকাতার এক বনেদি ঘরে তার জন্ম ও বসবাস। দেখতেও ভারী সুন্দর। কোথাও একটা আভিজাত্যের ছাপ লুকোনো আছে চেহারায়। কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের পরে, লেখাপড়ায় আর বেশি দূর এগোতে পারেনি বলে মনমরা হয়েছিল। সে সময় রেনেশাঁর বিজ্ঞাপনের উত্তরে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ। তার মা-বাবা চাননি এ ভাবে মেয়ে চলে যাক কোনও অনির্দেশ্যের পথে। কিন্তু রবিনা নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে ঘর বাঁধতে চায় না। মাত্র পাঁচটা বছর। তার পরেই তো এক তাল ঐশ্বর্যে ওতপ্রোত হয়ে ফিরে আসবে কলকাতায়। তার এখন কীই বা বয়স।

হয়তো এ রকমই সাধারণ জীবনযাপন থেকে উঠে এসেছে বাকি মেয়েরাও। চেহারা, মুখচ্ছবি দেখে বোঝা যায় কারও ভরণপোষণের চিন্তা ছিল না। সবাই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ঘরের তরুণী। সবারই ভেতর কিছু উচ্চাশা ছিল। কিছু ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাও ছিল। না হলে এমন সব কড়া শর্তে এ রকম অনিশ্চিত উড়ানে সামিল হলই বা কেন!

প্লেন ছাড়তে তখনও বোধহয় কিছু দেরি। তাতে গুঞ্জন আরও বাড়ল। সাউণ্ড বক্সে কণ্ঠস্বর থেমে যাওয়ার পর সবাই আশা করেছিল হয়তো এখনই শুরু হবে যাত্রা। কিন্তু দেরি দেখে আবার গল্পগুজবে ব্যস্ত। অচেনা তরুণীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয় করে নিচ্ছে যার যার মতো। আবিষ্কার করছে একে অন্যকে। কিছুটা অসহিষ্ণুও হয়ে পড়েছে কেউ কেউ।

তাদের কোলহল থামাতেই একটু পরে মিস রায় নামের আলট্রা-তরুণী একটা ছোট্ট ঠেলাগাড়ি নিয়ে এল কোত্থেকে। তাতে ঠাণ্ডা ও উষ্ণ—দু'রকম পানীয় ভর্তি গ্লাস। যে যেমন খুশি নিতে পারে. সঙ্গে পাতলা কাগজের ন্যাপকিন। উষ্ণ পানীয় দেখে অনেকেই ঘাবড়ে গেল। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দ্রুত তুলে নিল ঠাণ্ডা। কেউ বা অতি আধুনিকা প্রমাণ করতেই তুলে নিল উষ্ণ।

আলট্রা-তরুণী এক সময় এসে পৌঁছল মিমি মুখার্জির কাছেও। মিমি এক লহমা তাকাল তার দিকে, ঠাণ্ডা পানীয় তুলে নিয়ে হাসল এক ঝলক। মুখে উচ্চারণ করল, থ্যাঙ্কু, মিস রায়।

—থ্যাঙ্কু, মিসেস চৌধুরি, বলে একটা হাত মোছার পাতলা ন্যাপকিন তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল পেছনের রোয়ে।

'মিসেস চৌধুরি' শুনে মিমি মুখার্জি কিছুক্ষণ হতভম্ব। পেছন ফিরে একবার দেখলও মেয়েটিকে। ও কি ভুল করল, নাকি সত্যিই চিনতে পেরেছে গার্গীকে। কিন্তু গার্গীকে তো ওর চেনার কথা নয়।

পরমুহূর্তে কাগজের ন্যাপকিনটায় চোখ রাখতেই হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। কাগজটিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঃ আপনি যে খুবই দুঃসাহসী, ভীষণ ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন তা আমাদের জানা ছিল। কিন্তু আপনি নিজেকে যতটা চালাক মনে করেন,

ততটা মোটেই নয়। তার প্রমাণ আপনার আমাদের উডানে চড়তে রাজি হওয়া। আপনি এখনও জানেন না কোন্ বাঘের গুহায় আপনি ঢুকে পড়েছেন। আপাতত এই বিমানের গন্তব্য দুবাই। যেখানে পৌঁছলে আপনি আর পুরনো জীবনে ফিরতে পারবেন না। সত্যিকারের রেনেশাঁ হবে আপনার। ইতি ত্রিস্তা রায়।

## ॥ ৩৪ ॥

ত্রিস্তা রায়ের কয়েক পঙক্তির মারাত্মক চিঠিটা তখন স্তম্ভিত করে রেখেছে গার্গীকে। চেহারাটা যতদূর সম্ভব বদলে নিজেকে গার্গী চৌধুরি থেকে রূপান্তর করেছিল মিমি মুখার্জিতে। কিন্তু রেনেশাঁ-চক্রের চোখে ধরা পড়ে গেছে সেই ছদ্মবেশ। 'আপনি এখনও জানেন না কোন বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছেন' পঙক্তিটি তার রক্তের ভেতর ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের মতো আগুনের আতঙ্ক ধরিয়ে দিচ্ছে।

তার হাতে তখন ঠাণ্ডা পানীয়ের গেলাস। যেন কিছুই হয়নি এমন নির্বিকার চুমুক দিতে গিয়ে বুঝল ঠাণ্ডা কখন যেন পরিণত হয়েছে উষ্ণে। এই মুহূর্তে এমনই মনে হচ্ছে তার। বুকের ভেতর শুরু হয়েছে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি। বাঘের গুহায় পা দেওয়ার পর ভেতরে বাঘ গজরাচ্ছে জানতে পারলে এমন থরথর কাঁপ তো স্বাভাবিকই।

ককপিটের ভেতর যে ব্যাঘ্ররাজ অবস্থান করছেন, সন্ধান পেয়েছেন শিকার (সে আবার শিকারিও) তাঁর নাকের ডগায় তা তো একটু আগেই বুঝে ফেলেছে গার্গী।

তবু যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ প্রমাণ করতে চাইল নিজেকে। ভাবলেশহীন মুখে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে পানীয়ের গেলাসটিতে। ঠাণ্ডা পানীয় জিবের ওপর দিয়ে কণ্ঠনালীতে নামছে পোড়াতে পোড়াতে। পাকস্থলীতেও উষ্ণ প্রতিক্রিয়া। কান দিয়ে নাক দিয়ে হলকা। ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর। তবু পর পর চুমুক দিয়ে গার্গী স্বাভাবিক রাখতে চাইছিল নিজেকে।

কিন্তু পারছিল না পুরোপুরি। হঠাৎ মনে হল যে অঙ্ক কষে আজকের উড়ানে সামিল হয়েছে, হয়তো তার উত্তর মিলবে না। প্রথম লাইনেই তো ভুল ধরা পড়ল। তার ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছে রেনেশাঁ-চক্রের লোকেরা।

ঘন নীল গাউন, সাদা টপ পরিহিতা ত্রিস্তা রায় তখনও পেছনের সারিতে ঠাণ্ডা কিংবা উষ্ণ পানীয় পরিবেশন করে চলেছে। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে অন্য মেয়েরা হইহল্লা করছে বেশ। যারা উষ্ণ পানীয় নিয়েছিল, তারা গেলাস শেষ করে আবার ভরে নিচ্ছে উষ্ণে। বেশ ফুর্তিতে আছে সবাই। একটু আগে মাথার ওপর সাউণ্ড বক্স থেকে যে সিলভার টনিকের আভাস দেওয়া হয়েছে হয়তো তাতেই নেশাটা ধরে গেছে সব্বার। এখন তার সঙ্গে পানীয় যোগ হতেই মাতাল।

কিন্তু প্লেনটা তখনও দাঁড়িয়ে। হিসেব মতো এতক্ষণে তাদের উড়ান শুরু হওয়ার কথা। কিংবা সময় অতিক্রান্ত উড়ানের। কেন যে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে এত বড় বায়ুযানটা তা বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। উড়ানের দেরি হচ্ছে বলেই পানীয়ের গাড়ি আরও একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল ত্রিস্তা রায়। পানও তো একসময় শেষ হল। তবুও ছাড়ছে না কেন বিমানটা!

মেয়েরা কেউ কেউ অসহিষ্ণু। তারা গুঞ্জন, ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। অবশ্য সে শব্দ মোটেই উচ্চকিত নয়। সবে তো চাকরির শুরু। এখনই অসহ্য হলে চলবে কেন!

উড়ানের দেরি হচ্ছে বলে একটু পরেই আবার সেই ভরাট কণ্ঠস্বর ঃ লেডিজ, আমাদের যাত্রায় সামান্য বিলম্ব হচ্ছে কারণ মি. পাইলট এখনও তাঁর আসন গ্রহণ করেননি। আমরা খবর পেলাম তিনি একটু আগেই লাউঞ্জে পৌঁছে গেছেন। কফি খাচ্ছেন। কফি শেষ হলেই এসে যাবেন ককপিটে। প্লিজ বিয়ার উইথ আস।

কণ্ঠস্বর থেমে গেল যাত্রীদের মনে সামান্য স্বস্তি ছড়িয়ে। গুঞ্জনের মাত্রাও একটু কমে এল। গার্গী অনুভব করছে, প্লেন ভর্তি যাত্রিণীরা এখন উড়ানের জন্য উন্মুখ। কত দ্রুত গিয়ে সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে হাবিডুবি খাবে তারই নেশায় মাতাল একগুচ্ছ নিরীহ তরুণী।

একমাত্র গার্গীর ভেতরে তখনও অন্তহীন কাঁপ।

কিন্তু পাইলটের কফি পানও যেন অনন্তকাল ধরে চলেছে। কেউ-কেউ উঁকিঝুঁকি মারছে রানওয়ের দিকে। জানলা দিয়ে টার্মিনাল পর্যন্ত দেখা যায়। এক কাপ কফি খেতে তো এত সময় লাগার কথা নয়।

রেনেশাঁ-কর্তৃপক্ষও বোধহয় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ সাউণ্ড বক্সে সেই পুরুষ কণ্ঠস্বর, ত্রিস্তা, তুমি কি একবার যোগাযোগ করবে ক্যাপ্টেন ভরদ্বাজের সঙ্গে?

পানীয় বিতরণ শেষ করে ত্রিস্তা রায়ও তখন ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। গার্গীও চোখ রাখল কব্জিতে। বেলা প্রায় আটটা। সাতটা পনেরোতে বিমান রওনা হবে এমনই শোনা গিয়েছিল প্রথমে। খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল ত্রিস্তাকে। যেন তার উৎকণ্ঠা এখন গার্গীর চেয়ে অনেক বেশিই।

পুরুষ-কণ্ঠস্বরের আদেশ মান্য করতেই ত্রিস্তা তক্ষুনি নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়িটা তখনও লাগানো। যাত্রীরা উঠে যাওয়ার পর সিঁড়ি-সহ বাসটা ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু কী কারণে যেন তখনও যায়নি। হয়তো বিমানের চালক চখনও ককপিটে আসন গ্রহণ করেননি জেনেই।

ত্রিস্তা কিছুটা নামল সিঁড়ি বেয়ে। টার্মিনালের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। তারপর কী ভেবে আবার এসে ঢুকে পড়ল বিমানের ভেতর। গার্গীর দিকে হঠাৎ তাকাল এক ঝলক। সে চাউনিতে লাভার উদগীরণ। যেন পারলে তাকে ভস্ম করে দেয়।

গার্গী তখনও ঘামছে ভেতরে ভেতরে। বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘের গায়ের গন্ধ পাওয়ার পর কাঁপা ছাড়া আর কীই বা উপায়! কিন্তু ত্রিস্তার দিকে সে তাকিয়ে থাকে এক আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে। যেন এ পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে, তার জন্য গার্গী কী করতে পারে। পাইলট যে আসছে না তার জন্য গার্গীর কী ভূমিকা! পাইলট এসে ককপিটে ঢুকলে সেও তো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে উড়ে যেতে প্রস্তুত।

পাইলটের সন্ধানে না গিয়ে ত্রিস্তা যে আবার বিমানে ফিরে এল তাতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন রেনেশাঁ-কর্তৃপক্ষ। রেনেশাঁর কর্ণধার ও উপদেষ্টা। একটু পরেই সাউণ্ড বক্সে শোনা গেল, কী হল, ত্রিস্তা, ফিরে এলে কেন!

ত্রিস্তা দিশেহারা হয়ে ছুটে গেল সামনের কেবিনের দিকে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

হবু বিমানসেবিকারা এ বার কিছুটা বিভ্রান্ত। তারা এতক্ষণে বেশ রঙিন মেজাজে ছিল। এখন উপলব্ধি করছে, কোথাও একটা গোল বেধেছে। কিছুক্ষণ থম হয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী ঘটেছে আদতে। নিজেদের মধ্যে কিছু ফিসফাসও। বিমানটা চালিয়ে নিয়ে যাবে যে পাইলট সে-ই যদি না আসে তো রাশি রাশি ঐশ্বর্যের জগতে তারা যাবেই বা কী করে।

ত্রিস্তা সেই যে কেবিনে ঢুকল আর বেরুল না। সাউণ্ড বক্স থেকেও আর কোনও শব্দ নেই। এ যেন এক ঈশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা। কফি পান শেষ করে ঈশ্বর এসে ঢুকবেন ককপিটে। মানুষের কাছে কে যে কখন ঈশ্বর হয়ে দেখা দেয়।

গার্গীও তখন আর এক ঈশ্বরের কথা ভেবে চলেছে। ঘুর খাচ্ছে এক ভীষণ সংকটের আবর্তে। চারপাশে ঘুলিয়ে উঠছে সেই সংকটের ফেনা। কালো ফেনায় ভরে উঠছে চার পাশ। এক বুক শঙ্কা নিয়ে সে এখন ঈশ্বরকেই ডেকে চলেছে। ঈশ্বর যদি আর কিছুক্ষণের মধ্যে আবির্ভূত না হন তা হলে—

ঈশ্বর অবশ্য সেই মুহূর্তেই দেখা দিলেন না। তাঁর পরিবর্তে দুই মূর্তিমান বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে। তাদের পেছনে ত্রিস্তা। আরও দুজন লোক। পাঁচ জনেরই চোখ আছড়ে পড়ল গার্গীর দিকে। সে চাউনিতে ক্রোধ, আগুন আর প্রতিহিংসা মিলেমিশে প্রায় অগ্ন্যুৎপাত। তার গরম ফেনায় মাখামাখি হতে হতে গার্গী দেখল পাঁচ জনে বিমানের দরজা খুলে নেমে গেল সিঁড়ির দিকে। নামার আগে ছুড়ে গেল কয়েকটি শব্দ, উই উইল নট স্পেয়ার ইউ, মিসেস চৌধুরি!

গার্গী চুপচাপ হজম করল কথাটা। পাঁচ জনে ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে অপেক্ষমান বাসে উঠতেই সেটি চলতে শুরু করল টার্মিনালের ঠিক উল্টোদিকে।

গার্গী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নজর রাখছিল ঘটমান দৃশ্যের দিকে। বাসটা হু-হু করে ছুটছে। রানওয়ের অন্য প্রান্তে পৌঁছতেই হঠাৎ কেন যেন দিক বদল করে ফেলল। যেন ও দিকে যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু প্রান্ত বদল করে যে দিকে ছুটল সে দিকেও যেতে পারল না। আবারও গতিপথ পাল্টাতে হল। সে প্রান্তে পৌঁছেও কিন্তু নিস্তার নেই। সেখানেও কী দেখে আবার দিক বদল করল বাসটা। আবার ছুটে চলল অন্য দিকে। যেন একটা ইঁদুর ছুটোছুটি করছে পালাবে বলে।

বিমানের ভেতর তরুণীরা তখন আরও বিভ্রান্ত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কী এমন ঘটে গেল যে কেবিন থেকে পাঁচ জনে বেরিয়ে বাসে উঠে ক্রমাগত লাট খাচ্ছে রানওয়ের ভেতর! কেউই বুঝে উঠতে পারছে না তারা পাইলটকেই খুঁজছে এ ভাবে, না অন্য কোনও কারণ! সেই কাকভোরে উঠে ঘুমচোখে সবাই রওনা দিয়েছে। জীবনটাকে নতুন ভাবে জাগাবে, গড়ে তুলবে এক সোনালি ভবিষ্যৎ, হাবুডুবু খাবে সুখে, আরামে, ঐশ্বর্যে। তার বদলে সহসা এ কোন ছন্দপতন!

বাসটা অবশ্য এ ভাবে বেশিক্ষণ চরকি হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারল না। ইঁদুর কলের মধ্যে ইঁদুর ধরা পড়ে যে ভাবে ছুটোছুটি করতে করতে থেমে যায় ক্লান্ত হয়ে, সে রকমই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায় টার্মিনাল থেকে অনেকটা দূরে। তৎক্ষণাৎ সুদৃশ্য যানটিকে ঘিরে ধরল এক দঙ্গল পুলিশ।

পুলিশ নয়, গার্গীর কাছে ওরাই তখন ঈশ্বর। তার শরীর থেকে হু-হু করে নেমে গেল কাঁপের পারদ। এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে সে ভাবেনি। কালপ্রিটরা একসঙ্গে বিমান থেকে হুড়মুড় করে নেমে গিয়ে বাসটায় উঠবে তা ধারণাই ছিল না তার। ভেবেছিল হয়তো বিমানের মধ্যেই একটা শো-ডাউন হবে। পুলিশের সঙ্গে কালপ্রিটদের লড়াই হবে। তাতে হয়তো গুলিগোলাও চলতে পারত। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হত তা অনুমানও করতে পারেনি।

তবু বিমানের ভেতর আরও কালপ্রিট আছে কি না সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয়। জানলা দিয়ে নজর করে দেখল, দুটো গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে আসছে তাদের দিকে। সঙ্গে সিঁড়িওয়ালা একটা বাস।

এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিত গার্গী। তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বিমানের ভেতর কেউ থাকলে তারা বিনা বাধায় ধরা পড়ে কি না সেটাই এখন দেখার।

বাসটা বিমানের কাছে এসে সেঁটে গেল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। সিঁড়িটা লাগাতেই হুড়মুড় করে বেয়ে উঠলেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার। সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। সবারই সতর্ক ভঙ্গি। তাদের পেছন পেছন আরও অনেক সশস্ত্র উর্দিধারী। স্পেশাল ফোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে নিশ্চয়ই। গার্গীর রণকৌশল তা হলে ক্লিক করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের ভেতর পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। তারা দাপিয়ে বেড়াল ককপিট থেকে বিমানের লেজ পর্যন্ত। কোথাও কোনও প্রতিরোধ না পেয়ে একজন ভারী চেহারার পুলিশ অফিসার বললেন, অপারেশন ইজ ওভার।

পুলিশ অফিসারদের মধ্যে দ্যুতিমান চ্যাটার্জিও ছিলেন। এক দঙ্গল তরুণীর মধ্যে গার্গী চৌধুরিকে খুঁজে বার করে বললেন, থ্যাঙ্কু, মিসেস চৌধুরি। আপনার একটা ফোন থেকেই এত বড় একটা র‍্যাকেট ধরা গেল তা হলে।

গার্গী হেসে বলল, আপনি তো তখন বিশ্বাসই করতে চাননি আমার কথাগুলো।

—না, মানে, দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে সামান্য অপ্রস্তুত দেখায়, আপনি তো ফোনে কোনও কিছুই পরিষ্কার করে বলতে চাইলেন না। বারবার বললেন সব কথা ওখানে গেলেই শুনতে পারবেন। বুঝতে পারবেন ঘটনাটা।

গার্গী আবার হাসল, সব কথা তখন বলার সময় ছিল না, মি. চ্যাটার্জি। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলাতে হচ্ছিল আমাকে। বুঝতেই পারছেন, সমস্ত ছকটা আমাকে একাই করতে হয়েছিল। সাহায্য করার জন্য কাউকেও পাইনি। আপনারাও তেমন গুরুত্ব দেননি আমার কথায়। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অনেক ছক বেঁধে এগুতে হয়েছে আমাকে। তবেই না এতজন কালপ্রিটকে একসঙ্গে বাক্সবন্দি, স্যরি বাসবন্দি করতে পারলাম।

—কিন্তু কী সেই ছক তা কিন্তু তখনও বলেননি আমাদের।

—সে সব কথা এবার বলব। কিন্তু এখানে বিমানবন্দি হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছি না। আগে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে চলুন।

—কোথায় যেতে চান?

—'আশ্রয়'-এই। 'আশ্রয়' থেকেই যখন ঘটনার সূত্রপাত।

বিমানভর্তি তরুণীরা তখনও কেউ বুঝে উঠতে পারছে না গার্গী ও দ্যুতিমান চ্যাটার্জির রহস্যময় সংলাপের কার্যকারণ। তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের রেখাটা অবশ্য মিলিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। তবে অন্তত এটুকু বুঝেছে কয়েক জন প্রতারকের পাল্লায় পড়েছিল তারা। তাদেরই আর এক সহযাত্রিণী গার্গী চৌধুরির পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে প্রতারকরা। কিন্তু সব কথা তো তারা জানে না।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা, মি. চ্যাটার্জি। ফাদারকে নার্সিং হোম থেকে 'আশ্রয়'-এ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।

—ফাদারকে! দ্যুতিমান চ্যাটার্জি ইতস্তত করলেন, উনি তো অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন, কমপ্লিট বেড রেস্ট। নার্সিংহোম থেকে ছাড়বে না ওঁকে।

গার্গী হেসে উঠল, আপনি ওঁকে গিয়ে জানান, যারা ওঁকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল, যাদের ভয়ে উনি নার্সিংহোমে বসবাসের কাল ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন, তারা আপনাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। তা হলেই উনি 'আশ্রয়'-এ ফিরে আসবেন।

—সে আবার কী কথা!

—হ্যাঁ, মিস্টার চ্যাটার্জি। ফাদার গুলিতে আহত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর ক্ষত প্রায় নিরাময়ের মুখে। বাকিটা উনি 'আশ্রয়'-এ থেকেই সুস্থ হতে পারেন। নার্সিং হোম ছেড়ে উনি ফিরতে চাইছেন না, কারণ ওঁর আশঙ্কা, 'আশ্রয়'-এ ফিরলেই আবার ওঁর ওপর আক্রমণ হবে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে, আপনি এত কথা জানলেন কীভাবে! আর এত বড় একটা ফাঁদ পাতলেনই বা কোন সাহসে!

—সেই গল্পই তো এ বার আপনাদের শোনাতে চাই। কিন্তু কাহিনীটি এত লম্বা, তার মুড়ো এক দেশে তো ল্যাজা আর এক দেশে যে, সে সব শোনাতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। এই তরুণীদেরও শোনাতে ইচ্ছে করছে গল্পটা। এরা সবাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাদের অ্যাম্বিশান এতই আকাশছোঁয়া যে, কোন গহন সুড়ঙ্গের পথে ছুটে চলেছিল তা ভাববার মতো বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। বৃত্তান্তটা শোনা দরকার এদেরও।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পুলিশদের সঙ্গে তখন ওতপ্রোত হয়ে আছে এয়ারপোর্টের পুলিশরাও। সবাই ভিড় করে আছে রেনেশাঁর বিমানটির চার পাশে। আসল ঘটনাটা সবাই এখনও জানে না। অনেক পুলিশ কর্মীই শুধু জানে, খুব ভোরে একটা বড় ধরনের অপারেশন হবে এয়ারপোর্ট এলাকার মধ্যে।

গার্গীর ইচ্ছে অনুযায়ী অতঃপর সবারই গতিমুখ 'আশ্রয়'-এর দিকে। বিমান থেকে অত যাত্রিণীকে নামিয়ে 'আশ্রয়'-এ পৌঁছতে অনেকখানি বেলা। তরুণীরা অনেকেই যার যার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে তাদের যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে। তাদের বাড়ির অনেক অভিভাবক-অভিভাবিকাও ছুটতে ছুটতে চলে এসেছেন কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

এতজন তরুণীকে 'আশ্রয়'-এ ঢুকতে দেখে সেখানে শোরগোল উঠল, চল, চল, নিশ্চয়ই চৈতালি শেফালিরা ফিরে এসেছে।

—চল, চল সবাই—

কিন্তু তরুণীদের মধ্যে তাদের কাউকে না পেয়ে সবাই বিস্মিত।

গার্গী মুখ অন্ধকার করে বলল, না, ওদের সবাইকে এখনও পাওয়া যায়নি। যাবে কি না তা বলতে পারবে একমাত্র তাদের ভবিতব্যই।

'আশ্রয়'-এর স্কুল-বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় প্রেয়াররুমটা বেশ প্রশস্ত। স্কুল-সংক্রান্ত মিটিংগুলো সাধারণত এই ঘরটাতেই হয়ে থাকে। আজও গার্গী সবাইকে জড়ো হতে বলল প্রেয়াররুমে।

মেন্টর'স হাউস থেকে ততক্ষণে নেমে এসেছে নিবেদিতা, বিশাখা, তিয়াসা, নির্মাল্য। তারা ক্লাস নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। হঠাৎ নীচে হই-চই শুনে নেমে এসে তাজ্জব।

বাইরে থেকে এসে পৌঁছেছে সুছন্দা, রূপায়ণ আর অরণি। তারাও হকচকিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কী হয়েছে?

প্রেয়াররুমের এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আঙ্কেল তরফদার। তাঁর মুখেচোখে কালচে ছোপ। ভয়ে শুকিয়ে গেছে তাঁর অভিব্যক্তি। অন্য পাশে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে আঙ্কেল চট্টরাজ।

হোস্টেলের ছেলেমেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে। তাদের সবারই অবাক চাউনি। কিশোরী আর বালিকারা কী ভাবে যেন জেনে গেছে অপরাধীরা ধরা পড়ে গেছে, কারও আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। তারা স্বস্তিতে। হারানো সহপাঠিনীদের পাওয়া যায়নি শুনে অবশ্য হতাশ।

ফাদার এসে পৌঁছলেন একটু পরেই। কালপ্রিটরা গ্রেফতার হয়েছে জানার পরেও নাকি তিনি আসতে চাইছিলেন না। শেষে ডাক্তাররা তাঁকে ছুটি করে দিতেই চলে এসেছেন অনেকটা বাধ্য হয়ে। তবু তাঁর মুখের আতঙ্ক কাটেনি। শর্তভিষা রায় তাঁকে বসার ব্যবস্থা করে দিতে একটু বেশিই ব্যস্ততা দেখালেন। ফাদারকে অবশ্য অসুস্থ দেখাচ্ছে খুবই। তিনি চাইলেন বাংলোয় বিশ্রাম নিতে। একঘর পুলিশ আর চেনা-অচেনা কৌতূহলী মানুষের দিকে চোখ রেখে গার্গী তখন শুরু করল এক আশ্চর্য কাহিনী। কাহিনীর শুরু যেদিন নিবেদিতার সঙ্গে নিউমার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে হারিয়ে গেল চৈতালি। তারপর একে একে কত অঘটন। আর তার বীজ নিহিত ছিল কোন দূর আঁধারের গভীরে। সে এক অদ্ভুত, ভীষণ বৃত্তান্ত।

## ॥ ৩৫ ॥

ঘর ভর্তি কৌতূহলী মানুষজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুড়ে গার্গী তখন বলে চলেছে তার তদন্তের ফলাফল। তার স্বরে যথেষ্ট প্রত্যয়। তার বাচনভঙ্গিতে খুবই দৃঢ়তা। চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। প্রশস্ত ঘরটির এক প্রান্তে চেয়ারে ন্যস্ত করেছে নিজেকে, সামনের টেবিলে দু'হাতের কনুই রেখে একটু ঝুঁকে বলতে শুরু করল—

আপনারা সবাই জানেন 'আশ্রয়'-এর কর্ণধার, যাঁকে ফাদার বলে আমরা সম্বোধন করি, সেই ড. ইন্দ্রনীল বটব্যাল কী অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন এই সুন্দর প্রতিষ্ঠান। অবশ্য শুধু তিনিই নন, দুই আঙ্কেল, এত জন তত্ত্বাবধায়কও দিনরাত ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন এখানকার সবুজ কিশোর-কিশোরীদের। গত চার বছর ফাদার-আঙ্কেল-ব্রাদার-সিস্টারদের তত্ত্বাবধানে, সাহচর্যে, ভালবাসায় তারা বেড়ে উঠেছে 'আশ্রয়'-এর চার দেওয়ালের মধ্যে। খুবই নিরিবিলি, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর পরিবেশ। যেন ঈশ্বর বিরাজ করতেন এখানে।

হঠাৎ সেই ঈশ্বরের রাজত্বে কোত্থেকে ঢুকে পড়ল একটা নিষ্ঠুর শয়তান। গোলাপের মতো সুন্দর কিশোরীরা কিভাবে যেন উধাও হয়ে গেল একে-একে। কয়েক দিনের মধ্যে এতদিনকার সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে শুরু করল এক উটকো খরার হলকায়। তছনছ হয়ে গেল ফাদারের এতদিনকার লালন করা স্বপ্ন।

ফাদার প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, এইসব সবুজদের কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি খুবই সাধারণ, অপাঙক্তেয় পরিবেশ থেকে, এদের শরীরে আমি বইয়ে দেব নীল রক্ত। এরা পরে মাথা উঁচু করে বলতে পারবে 'আমরা 'আশ্রয়ে' মানুষ হয়েছি।' এদের চোখে-মুখে ঝরে পড়বে আভিজাত্যের অহঙ্কার।

সেই নির্দিষ্ট অভিমুখেই এগোচ্ছিলেন ফাদার। সাফল্যও হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাঁকে। হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে কোন ভাইরাস ঢুকে 'আশ্রয়'-এর শিরায় বইয়ে দিল নীল রক্তের পরিবর্তে নীল বিষ। 'আশ্রয়' হয়ে উঠল নিরাশ্রয়। শুধু নিরীহ, নিষ্পাপ কিশোরীদের অপহরণ করেই সে ক্ষান্ত ছিল না, প্রথমে হত্যা করল তুলিকা নামের এক তত্ত্বাবধায়ককে, তারপর গুলিতে আহত করল ফাদারকে। ফাদার প্রাণে বেঁচে গেছেন এই যা রক্ষা। নইলে তাঁকেও এতদিনে মুখোমুখি হতে হত তুলিকার।

এই সময়কালের মধ্যে যা-যা ঘটনা ঘটেছে তা সবাই মোটামুটি জানেন। যে-কথাগুলো জানেন না, যা বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, সেই তথ্যই এবার বলতে চাই একে-একে। অনেকেই বুঝতে পারছিলেন না কেন এত সব ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে চলেছে, কে বা কারা ঘটাচ্ছে, এগুলো কি ঘটতেই থাকবে আরও বহুকাল, যতকাল না পর্যন্ত 'আশ্রয়' একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে। তুলিকাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আপনারা চাইছিলেন চৈতালি, শেফালি, বীথি ও অতসী আবার ফিরে আসুক। 'আশ্রয়' হয়ে উঠুক আবার আগের আশ্রয়।

কে বা কারা এ রকম নিষ্ঠুর আচরণ করছিল তা ভেবে আমিও প্রথম থেকেই ধন্দে। এই প্রতিষ্ঠানে আমি যুক্ত ছিলাম একেবারে গোড়ার দিকে। এই সবুজের কেউ কেউ আমারই নির্বাচন। এদের বেশির ভাগের সঙ্গে কেটেছে আমার অনেকগুলো সুন্দর দিন। তত্ত্বাবধায়করা সবাই ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। সে কারণেই 'আশ্রয়'-এর জটিলতা খুলতে আমার এত আগ্রহ ছিল।

কিন্তু ঘটনাগুলোর মধ্যে যত ঢুকছিলাম, ততই হারিয়ে যাচ্ছিল খেই। এক ঘটনার সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না আর এক ঘটনা। যাদের ওপর সন্দেহ হচ্ছিল, তারা প্রায় সবাই আমার আপনজন।

আমি প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা ভাবে সাজাচ্ছি সন্দেহের কারণগুলো। তালিকাটা শেষ হলে আমি উন্মোচন করব রহস্যের মূল কারণ।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ হাত তুলে কিছু বলতে চাইল। গার্গী তর্জনী তুলল, এ সময়ে প্লিজ খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ কোনও প্রশ্ন করবেন না। তাতে আমার খেই হারিয়ে যেতে পারে। প্রথমে ধরুন নিবেদিতার কথা। নিবেদিতার উপর সন্দেহ হয়েছিল অনেকগুলো কারণে। যেমন—

১. 'আশ্রয়'-এ থাকাকালীন নিবেদিতাকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনেছি। ও আমার রুমমেট ছিল। নিবেদিতা কী পারে, কতটুকু পারে তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু নিবেদিতার পর পর এমন কতকগুলো কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল যে, আমারও মনে হতে লাগল

কেন এ রকমটা করছে নিবেদিতা। যে-মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল বিয়ের এক বছরের মধ্যেই, তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কারণ যে-পুরুষটি, তিনি বারবার কেন দেখা করতে আসছেন নিবেদিতার সঙ্গে। বহুবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কিন্তু নিবেদিতা কখনও ভাঙেনি আসল কারণটা।

২. নিবেদিতার সঙ্গে নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে চৈতালি যখন নিখোঁজ হল, ফাদার সন্দেহ করেছিলেন নিবেদিতাকেই। একটা নীল অ্যামবাসাডার কয়েকদিন ধরে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল 'আশ্রয়'-এর কম্পাউণ্ডের বাইরে। নির্মাল্যই নাকি তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছিল। 'আশ্রয়'-এ আজও কানাকানি হয় নির্মাল্যর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিবেদিতার। সেই নির্মাল্যই যখন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছে, ধরে নেওয়া যায় নীল অ্যামবাসাডারের কথা নিবেদিতাও জানে। সেই গাড়িটাই যখন নিউ মার্কেটে চুপচাপ অপেক্ষা করছিল, তখনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল নিবেদিতার। হয়তো ইচ্ছে করেই সতর্ক হয়নি। চৈতালিকে একা রেখে গিয়েছিল যাতে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে পারে কেউ।

৩. চৈতালি নিখোঁজ হওয়ার পর অতসী একদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে বারান্দায় কাকে হাঁটতে দেখে 'চৈতালি, চৈতালি' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। চৈতালি নাকি ঘুমের ভেতর ও রকম ভাবে হাঁটত। অতসীর চেঁচামেচিতে সে পালিয়ে যায়। তার একটু পরে আঙ্কেল তরফদার দেখেছেন নিবেদিতা মেন্টর'স হাউসের বারান্দা থেকে তাকিয়ে আছে হোস্টেলের দিকে। ঘটনাটা শুনে অনেকেরই চোখে ঘনিয়ে এসেছিল সন্দেহ। হয়তো নিবেদিতাই ঘোরাঘুরি করছিল ওভাবে।

৪ নিবেদিতার সঙ্গে একদিন কথা কাটাকাটি হয় বিলাস সান্যালের। নিবেদিতা বলেছিল, 'তুমি এর মধ্যে একদম মাথা গলাবে না।' সংলাপটি সন্দেহজনক।

৫. নিবেদিতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল 'আশ্রয়'-এর অনেকেই। এমন কী ছোট-ছোট সবুজরাও—যারা তাদের অনায়াস সারল্য দিয়ে বুঝে ফেলে কে ভাল কে মন্দ। তারাও তটস্থ হয়ে থাকত নিবেদিতার ভয়ে। হোস্টেলের কিশোরীরাও তার কাছে নাচ শিখতে চায়নি। ছোট-ছোট বাচ্চারা তাকে দেখত আতঙ্ক-মাখানো চোখে। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর হলেও সত্যি।

৬. নিবেদিতা যে-রাতে হোস্টেলে থাকতে গিয়েছিল মেয়েদের পাহারা দিতে, সেই রাতেই অন্তর্হিত হয়েছিল শেফালি আর বীথি। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে, যে সব রাতে এই ঘটনাগুলো ঘটছিল, তার ঠিক আগে বা পরে বিলাস সান্যাল ফোন করতেন তাকে। এমন কী তুলিকা খুন হওয়ার আগের রাতেও বিলাস সান্যালের ফোন এসেছিল নিবেদিতার কাছে।

৭. তুলিকা খুন হওয়ার পর তার ঘরে যাদের হাতের টাটকা ছাপ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আছে নির্মাল্য আর নিবেদিতা। যে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আঘাতে খুন করা হয়েছিল তুলিকাকে, সেটিও নিবেদিতার। এ সময় একটা ব্যাপার চোখে পড়েছিল অনেকের। নিবেদিতার সঙ্গে নির্মাল্যর সম্পর্কটা একটু কানাকানি হতেই ওরা সাবধান হয়েছিল। পাশাপাশি ঘরে থাকা সত্ত্বেও কথা বলত না পারতপক্ষে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটা যোগাযোগ যে ছিলই সেটা জানা গেছে পরে। নিবেদিতা-নির্মাল্য জুটিকে সন্দেহ করেছে কেউ কেউ।

৮. নিবেদিতা সম্পর্কে আরও একটা সন্দেহের কারণ হোস্টেলের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শতভিষা রায়ের সঙ্গে তার বিবাদ। শতভিষা রায় যে ভাবে সবুজদের কড়া হাতে আগলে

রেখেছেন, তাতে হয়তো অসুবিধা হচ্ছিল নিবেদিতার। তাই সে চাইছিল শতভিষা রায়কে যে কোনও ভাবে এখান থেকে সরিয়ে দিতে।

সব মিলিয়ে নিবেদিতা চরিত্রটি কিন্তু বেশ রহস্যজনক। অথচ নিখুঁত ভঙ্গিতে অভিনয় করে গেছে সবার চোখের সামনেই। সে এত সব জঘন্য কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল কি না সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আসুন আমরা উন্মোচন করি আর একটি সন্দেহভাজন চরিত্র— আঙ্কেল রণধীর তরফদারের।

গার্গী তার বক্তৃতায় সামান্য পজ দিয়ে একঝলক তাকাল এককালের রুমমেট নিবেদিতার দিকে। নিবেদিতার চোখে তখন বিস্ময় মাখানো যে-দৃষ্টি, তার একটাই অর্থ ঃ দাউ টু-উ-উ, গার্গী!

সে অনুযোগকে আমল না দিয়ে গার্গী শুরু করল আঙ্কেল তরফদারকে সন্দেহ করার কার্যকারণ।

—দেখুন, আঙ্কেল তরফদার আমার বহু দিনের চেনা একটি মানুষ যিনি কাজের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস, তাঁর বরাদ্দ কাজগুলো করেন বেশ মন দিয়ে। এত দিন মনে হত, তিনি কাজ-পাগল, নিরীহ একটি লোক, কোনও সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু 'আশ্রয়'-এর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর অন্তরালে তাঁর হাত থাকার সম্ভাবনা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অপহরণের কাজে তাঁর জড়িত থাকার সপক্ষে যে-কারণগুলো আমারা আবিষ্কার করেছি, সেগুলো এভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

১. যে নীল অ্যাম্বাসাডারটিকে 'আশ্রয়'-এর সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত প্রায়ই, যে-গাড়িতে করে অপহরণ করা হয়েছিল চৈতালিকে, সেই গাড়িতে চড়ে একদিন আঙ্কেলকে 'আশ্রয়'-এর গেটে নামতে দেখে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। গাড়িটা কেন ভেতরে ঢোকালেন না সেটাও যেমন প্রশ্ন, তেমনই তাঁর অনেক আচার-আচরণও ভারী অদ্ভুত।

২. আঙ্কেলের জন্য মেন্টর'স হাউসে একটা ঘর নির্দিষ্ট থাকলেও তিনি সাধারণত সেখানে রাতে থাকতেন না। শুধু সেই সব রাতে থাকতেন, যখন ফাদার কোনও কাজে বাইরে যেতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 'আশ্রয়'-এর সমস্ত অপকর্মগুলো ঘটে যাচ্ছিল ফাদার যেদিন থাকছিলেন না ও তাঁর পরিবর্তে চার্জে থাকছিলেন আঙ্কেল তরফদার। অতসী যে রাতে অপহৃত হয়, সে রাতে প্রথমে তিয়াসাকে মাঝরাতে ডেকে তোলেন আঙ্কেল। তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রেখে আঙ্কেল অত রাতে গেলেন মেয়েদের হোস্টেলের দিকে। তাও প্রধান সিঁড়ি দিয়ে না নেমে ব্যবহার করেছেন তাঁর ঘরের সামনে দু নম্বর সিঁড়িটা। যেটা এতকাল তালা বন্ধ ছিল। তাঁর প্লি, তিনি তুলিকাকে মনে করিয়ে দিতে গিয়েছিলেন তার ও বিয়ার পরদিন কাকভোরে এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা। তুলিকাকে খবরটা না দিয়েই কিন্তু তিনি ফিরে এসেছিলেন। তা হলে প্রশ্ন তাঁকে অত রাতে কেন দেখা গিয়েছিল হোস্টেলের দিকে যেতে!

৩. আঙ্কেলের ব্যক্তিগত জীবন খুব পরিষ্কার নয়। তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা যে-বাড়িতে থাকেন সেখানে রাতে থাকেন না, থাকেন তাঁর বউদির সঙ্গে। শুধু তাই নয়, বউদিকে নিয়ে রবিবার দিন বেরোন। কখনও তাঁদের দেখা যায় এয়ারপোর্ট হোটেলে অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অ্যাটাচি নিতে। তার ভেতর কী আছে সেটাও রহস্য। সেগুলো তিনি পৌঁছে দেন বিভিন্ন রোড সাইড হোটেলে—যে হোটেলে রাতের বেলা নিষিদ্ধ কাজকর্ম চলে। এমন কী নিষিদ্ধপল্লীতেও দিয়ে আসেন সেই অ্যাটাচি ভর্তি বস্তুটি।

৪. তুলিকার সঙ্গে আঙ্কেলের কথা কাটাকাটির মুহূর্তে তুলিকা তাঁকে হুমকি দিয়েছিল, 'আপনার প্রেজেন্ট হিস্ট্রি আমি জানি।' কী ইতিহাস তা অবশ্য জানা যায়নি। শুধু এটা জানা গেছে, কয়েক বছর আগে তাঁর দাদাকে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছিল মৃত অবস্থায়। কেউ কেউ বলেন আঙ্কেলই দাদাকে ওভাবে খুন করে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন বউদির প্ররোচনায়। সুতরাং 'আশ্রয়'-এর ঘটনাবলীতে আঙ্কেলের রহস্যজনক ভূমিকাও প্রশ্ন তুলেছে সবার ভেতর।

৫. শেফালি আর বীথি যে রাতে অপহৃত হয়, আঙ্কেলকে দেখা গিয়েছিল ঘটনার পরেই বিষেন সিংকে বলে গেট খোলাতে। বাইরে একটা নীল অ্যাম্বাসাডারে করে দুষ্কৃতীদের পালিয়ে যেতেও নাকি দেখেছিলেন। আবার রাইকেও তিনি গেটের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন ও তারপর অন্তর্হিত হয় রাই।

৬. যে রাতে তুলিকা খুন হয়, সে রাতে ফাদারের অনুপস্থিতিতে আঙ্কেল 'আশ্রয়'-এ তাঁর ঘরে রাত্রিবাস করেছিলেন। তুলিকা খুন হওয়ার পর আবিষ্কার করা গেল আঙ্কেলের ঘরের সামনে দু' নম্বর সিঁড়িটার তালা খোলা। সিঁড়ির দরজার চাবি থাকে আঙ্কেলের কাছে। তা হলে প্রশ্ন এই যে, কী এমন কারণ ঘটেছিল যার কারণে আঙ্কেল সে রাতে সিঁড়ির দরজা খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আঙ্কেল তরফদার কাছেই দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে গার্গীর কথা শুনছিলেন। এ সময় প্রতিবাদ করে বললেন, সে রাতে মোটেই ওই তালা আমি খুলিনি।

—ঠিক আছে আঙ্কেল, আপনার প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি। এবার আমি বলব তুলিকার কথা। তুলিকা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তবু তার তখনকার অনেক আচরণ সবারই চোখে সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছিল। সবাই জানেন তুলিকা ছিল ফাদারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। স্কুলে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া কম্পাউন্ডের মধ্যে সারাক্ষণ ঢাউস আকারের ম্যাক্সি পরে ঘুরে বেড়ায়। তাতে তার স্বাস্থ্যল চেহারাটা যেমন বেঢপ লাগত, তেমনই তার জীবনযাপনও ছিল ভারী অগোছালো। ফাদারের অনেক আদেশনামা প্রচারিত হত তুলিকা মারফত। ফাদারের কোনও সিদ্ধান্ত তুলিকাই এমনভাবেই তার কলিগদের কাছে পেশ করত যেন সব সিদ্ধান্ত এখানকার সবার সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হয়। কোনও কোনও রাতে 'বাইরে কাজ আছে' বলে বেরিয়ে রাতে মেন্টর'স হাউসে ফিরত না। ফাদার তাকে অবশ্য বকাবকি করতেন, কিন্তু তাঁকেও গ্রাহ্য করত না। তুলিকার বিরুদ্ধে যে ক'টি অভিযোগ এ পর্যন্ত শোনা গেছে সেগুলি হল ঃ

১. ফাদার যখন ট্যুরে বাইরে যেতেন, তুলিকা টেলিফোনে কারও সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলত। কার বা কাদের সঙ্গে কথা বলত তা জানা যেত না। মনে হত কোনও একটা গ্যাঙের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। সম্ভবত 'আশ্রয়'-এর বাইরে ওকে যেতে হত এ রকমই কোনও গ্যাং-এর নির্দেশ মতো। রাতে ফিরতে পারত না হয়তো তাদেরই কারণে। ফাদারের অনুপস্থিতিতে তুলিকার তৎপরতা আরও বেড়ে যেত। ফাদারের প্রিয়পাত্রী বলে তার কাজকর্মে বাধা দিতে পারত না কেউ। এই গ্যাং-এর হাতেই কি তুলিকা তুলে দিত কিশোরীদের।

২. আঙ্কেল তরফদার একদিন তুলিকাকে হুমকি দিয়েছিলেন, 'তোমার পাস্ট হিস্ট্রি সব জানি।' এই অতীত ইতিহাস যে ভাল নয় তা পরে জানা গেছে। এক প্রৌঢ় শিক্ষকের সঙ্গে তুলিকা পালিয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসার পর তার বাবা আর তাকে আশ্রয় দেননি। নিরাশ্রয় তুলিকাকে 'আশ্রয়'-এ আশ্রয় দিয়েছিলেন ফাদার। ফলে ফাদারের উপর তার একটা দুর্বলতা

ছিল। ক্রমে ফাদারের ওপর কর্তৃত্বও করতে থাকে। হয়তো ফাদারের প্রশ্রয়ের সুযোগে সে পাচার করেছিল কিশোরীদের।

৩. নাকি তুলিকার জীবনের আরও কোনও অন্ধকার দিক কেউ জানত! সে-ই ব্ল্যাকমেল করছিল তুলিকাকে! তবে তুলিকা এখন সব অভিযোগের বাইরে। তাকে হত্যা করা হল কেন সেটাও যেমন সবাই জানতে চান, তেমনই এ তথ্যও জানতে ইচ্ছুক তাকে 'আশ্রয়'-এরই কেউ খুন করেছে, না বাইরের কেউ!

তুলিকা প্রসঙ্গ এখানেই মুলতবি রেখে গার্গী এবার ঢুকে পড়ল সমুদ্রনীল এপিসোডে।

—আপনারা সমুদ্রনীলকে সবাই জানেন একজন নিরীহ, শান্ত সঙ্গীত-প্রেমিক হিসেবে। তার আর একটা পরিচয়ও মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেছে 'আশ্রয়'-এ—সে ভালবাসত ত্রিস্তা নামের একটি তরুণীকে। ত্রিস্তা কানপুরে চলে যাওয়ার পর সমুদ্রনীলের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগই করেনি। তাতে সমুদ্রনীল এতটাই মুষড়ে পড়েছিল যে, সারাক্ষণ তার চারপাশে বিজবিজ করত বিষণ্ণতা। তার কথাবার্তায়, ব্যবহারে, অভিব্যক্তিতে, গিটারের সুরে সবসময় বেজে উঠত শুধু দুঃখ। ঠিক এই সময় রাই নামের এক কিশোরী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার সঙ্গে সবে একটু ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে, ঠিক সে সময় রাইকেও আর পাওয়া গেল না 'আশ্রয়'-এ। সমুদ্রনীল ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে তুলিকার ওপরই থিতু হয় তার যাবতীয় আক্রোশ। ঠিক এই সময় খুন হয় তুলিকা।

সমুদ্রনীলের ওপর তখনও আমার নজর ছিল না। কিন্তু তারপর দু-দুটো তথ্য আমার হাতে আসে যাতে তার ওপর ঘন হয় সন্দেহ। একটি তার ডায়েরি, অন্যটি সেই ডায়েরির মলাটের ভেতর পাওয়া একটা চিঠি। চিঠিটা ত্রিস্তার লেখা।

—ত্রিস্তার লেখা! তত্ত্বাবধায়করা অনেকেই এক সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, কী ছিল সেই চিঠিতে?

—সে এক ভয়ঙ্কর চিঠি। আমি কল্পনাও করতে পারি না সমুদ্রনীল যাকে প্রাণের প্রাণ ভালবেসেছিল, সেই মেয়ে এতখানি বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে! তার চিঠিতে লেখা ছিল জনৈক রঙ্গনাথ গুপ্তার ফাঁদে পা দিয়ে কানপুর থেকে মুম্বই গিয়েছিল আরও বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে। কিন্তু মুম্বইতে গিয়ে জানতে পারে এক প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। তাকে প্রায় গৃহবন্দি করে রেখে জানানো হয় কোনও এক অভিজাত বারে তাকে মনোরঞ্জন করতে হবে খদ্দেরদের। দু'বছর সেখানে কাজ করার পর সে সমুদ্রনীলকে একটা চিঠি লেখে। এই পাপের জীবন থেকে মুক্তির একটাই শর্ত দিয়েছে রঙ্গনাথ গুপ্তা। খুব কঠিন শর্ত। ত্রিস্তার মুক্তির বিনিময়ে 'আশ্রয়' থেকে পাঁচটি কিশোরী পাচার করে দিতে হবে রঙ্গনাথ গুপ্তার কাছে।

—সে কী! উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল গার্গীর কথা। হঠাৎ চমকে উঠল এ রকম একটা সাংঘাতিক বার্তা শুনে। যেন মুম্বই শহরের আর একটা আর ডি এক্স ভরা খাম বিস্ফোরণ ঘটাল কলকাতা শহরে!

—বিস্মিত হওয়ার কথাই। আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম চিঠিটা পড়ে। ততদিনে 'আশ্রয়' থেকে একে একে পাঁচটা কিশোরী উধাও। সমুদ্রনীলকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। সে এ রকম একটা কাজ করতে পারে তা আমার ধারণার অতীত। কিন্তু ধারণাটি আরও দানা বাঁধল যখন আমার কানে এল কিশোরীরা অপহৃত হওয়ার পর তার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চৈতালি, বীথি ও রাইকে দেখা গেছে। শুধু কিশোরী অপহরণ করেই যে সে শান্ত হয়েছে তা নয়, তার বিরুদ্ধে তুলিকাকে হত্যা করারও কিছু প্রমাণ আমার হাতে এসেছে।

আঙ্কেল চম্পক চট্টরাজের মতো নিরীহ মানুষও এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন কী বলছ কী তুমি?

গার্গী বিচলিত না হয়ে বলল, দেখুন আঙ্কেল, এত এত ঘটনা ঘটে চলেছে 'আশ্রয়'-এ, তার উৎস সন্ধানে নামলে এ রকম অনেক চমকে ওঠার মতো ঘটনা কানে শুনতে হবে, চোখে দেখতে হবে। চমকে ওঠার তো এখনও অনেকটাই বাকি। সমুদ্রনীলের পক্ষে যে তুলিকাকে হত্যা করা সম্ভব তার জন্য এই প্রমাণগুলো হাজির করছি ঃ

১. রাই অন্তর্হিত হওয়ার পর সমুদ্রনীলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তুলিকার। সমুদ্রনীল বলে, 'তোমাদের জন্যই রাইকে এভাবে চলে যেতে হল।' পরে একবার বলেছে, 'এরপর আরও অনেক ঘটনাই ঘটতে থাকবে 'আশ্রয়'-এ।'

২. তুলিকা খুন হওয়ার পর তার ঘরের মেঝেয় গিটারেব একটা পিক খুঁজে পেয়েছিলাম যেটা সমুদ্রনীলের। হয়তো পিকটা আঙুলে পরা অবস্থায় সে গভীর রাতে গিয়েছিল তুলিকার ঘরে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দিয়ে তার মাথায় ঘা মারার ফুরসতে পিকটা খসে যায় তার আঙুল থেকে।

৩. তুলিকার ঘরে যাদের হাতেব টাটকা ছাপ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজন সমুদ্রনীল।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি এই সময় বললেন, তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রনীল কালপ্রিট। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তা হলে আজ সকালে এয়ারপোর্টের রানওয়ের ভেতর যাদের ধরা হল তারা কারা?

—একটু সবুর করুন, মি. চ্যাটার্জি। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। 'আশ্রয়'-এব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েক জন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি এখনও। এমনও হতে পারে আরও অনেক চমক অপেক্ষা করে আছে আপনাদের সামনে।

—চমক! দ্যুতিমান চ্যাটার্জিকে অধৈর্য দেখাল।

—হ্যাঁ। মূল গল্পটা কোথা থেকে কোথায় যাবে তা এখন কেউই অনুমান করতে পারবেন না। তার আগে প্রথমে আমরা বিশ্লেষণ করি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ফাদাব সম্পর্কে। আমাদের অনেকের মনে সন্দেহ বাসা বাঁধছিল, এই অপহরণ পর্বে ফাদারের কি কোনও ভূমিকা আছে! ফাদার কি সত্যিই বুঝে উঠতে পারছিলেন না কেন হচ্ছে এ সব! কারাই বা করছে! নাকি ফাদার সব জেনে বুঝেও চুপ করে ছিলেন!

## ॥ ৩৬ ॥

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলার পর গার্গী থামল একটু। সময় নিল ফাদার সম্পর্কে তার বক্তব্য কীভাবে পেশ করবে ভেবে। সে সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, আপনি কি ফাদারকেও সন্দেহ করছেন?

গার্গী হেসে বলল, দেখুন, 'আশ্রয়'-এ এত-এত ঘটনা ঘটে চলেছে ফাদারের নাকের ডগা দিয়ে, সেখানে ফাদারের কোনও ভূমিকা আছে কি না তা তো যে কোনও তদন্তকারীকে

খতিয়ে দেখতেই হবে। তবে ফাদার ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, এটা ভাবা স্বাভাবিক, কারণ যতগুলো ঘটনা ঘটেছে সবই ফাদারের অনুপস্থিতিতে। তা ছাড়া তাঁর জড়িত না থাকার আরও একটা বড় কারণ, এত বড় প্রতিষ্ঠানটা তাঁর নিজের হাতে গড়া। ইংলণ্ডে লোভনীয় কেরিয়ারের হাতছানি উপেক্ষা করে যখন ফিরে এলেন এ দেশে, সিদ্ধান্ত নিলেন সমাজসেবায় কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন, তাঁকে তো বাহবা দিতেই হবে। 'আশ্রয়'-এর গড়ে ওঠার ইতিহাস তো অনেকেই জানেন।

আঙ্কেল চটুরাজ বলে উঠলেন, জানি বলেই তো তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ ঘটে না।

—ঠিকই বলেছেন, আঙ্কেল। ধনী পরিবারের সন্তান ড. ইন্দ্রনীল বটব্যাল। অর্থের অভাব নেই। বিদেশে থেকে পায়ের ওপর পা ন্যস্ত করে কাটিয়ে দিতে পারতেন আরামের জীবন। সে সময় তাঁর মাথায় একটা ভূত চাপল। তিনি দেশে ফিরে তৈরি করবেন দুঃস্থ, অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সুন্দর, নিরিবিলি আশ্রম। 'আশ্রয়'ই সেই আশ্রম। তবে 'আশ্রয়' গড়ে তোলার পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ইন্দ্রনীল বটব্যালের জীবনের করুণ কাহিনী। তিনি ইংলণ্ডে থাকতে প্রেমে পড়েছিলেন এমন এক নারীর যার জীবন-ইতিহাসটিও নানান টানাপড়েনে ভর্তি। এক বছরও ফাদারের ঘর করেনি সেই মেয়ে, তার আগেই চলে গিয়েছিল আর এক পুরুষের প্রেমে পড়ে।

ঘটনাটা ইন্দ্রনীল বটব্যালের কাছে ছিল খুবই অসহনীয়। হয়তো তাকে ভুলতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশে ফেরার। দেশে এসে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলাম তারা জানি কী ভাবে জলের মতো টাকা খরচ করে বালিগঞ্জের এই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে গড়ে তুলেছেন তাঁর স্বপ্নের আশ্রম। গত চার বছর ভীষণ পরিশ্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছেন ফাদার, সে কথা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

কিন্তু গোলমাল শুরু হল যেদিন এই প্রতিষ্ঠানের চার বছর পূর্তির পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। নিবেদিতাকে পাঠালেন চৈতালিকে নিয়ে নিউমার্কেট থেকে ফুল কিনে আনতে। সেখানে চৈতালির হারিয়ে যাওয়া থেকেই 'আশ্রয়'-এর যাবতীয় বিপত্তি। একের পর এক কিশোরী হারিয়ে যেতে শুরু করল শুধু নয়, দুটি কিশোরীকে দত্তকও দিয়ে দিলেন ফাদার। দত্তক দিয়েছিলেন কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে তা সেই মুহূর্তে মনে হয়নি, কিন্তু 'আশ্রয়'-এর চার বছরের জীবনযাপনে সহসা শুরু হল ছন্দপতন। তাতে নিশ্চিন্তে মানুষ হতে থাকা সবুজদের জীবনে দেখা দিল নিরাপত্তাহীনতা। এখানকার কর্মীরাও উপলব্ধি করলেন খুব বেশি দিন আর চাকরি করতে পারবেন না এখানে।

ফাদার অবশ্য ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পুলিশকে ডেকে সব ঘটনা বিবৃত করে তাদের হাতেই ছেড়ে দিলেন অন্তর্হিত কিশোরীদের খুঁজে আনার ভার। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি কারা করছে কাজগুলো, তাদের মোটিভই বা কী!

আসলে ব্যাপারটা একটু শক্তই ছিল, কারণ সরষের মধ্যে ভূত থাকলে সে ভূত তাড়ানো বেশ কঠিন। আমিও প্রথম থেকে বেশ ধন্দে ছিলাম। অনেকেরই ওপর সন্দেহ হচ্ছে, অনেকের আচরণই বেশ ঘোরালো, তাদের মধ্যে কে বা কারা নিঃসাড়ে ঘটনাগুলো ঘটিয়ে ফেলছে তা বুঝতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ।

কিছুদিনের মধ্যে কতকগুলো ঘটনা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল। কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণগুলোর। সেগুলো যদি এভাবে সাজাই ঃ

১. তুলিকা নামের একজন তত্ত্বাবধায়ক হঠাৎই বেশ কর্তৃত্ব পেয়ে গিয়েছিল 'আশ্রয়'-এ। তুলিকাকে আমরা সবাই অনেক দিন থেকে চিনি। তার জীবনের পূর্ব-ইতিহাস কিছু অন্ধকারে মোড়া। ফাদার সে সময় তাকে এখানে পুনর্বাসিত না করলে সে হয়েতা আরও অন্ধকারে তলিয়ে যেত। সেই তুলিকা প্রায় কর্তৃত্ব করত স্বয়ং ফাদারের ওপর। ফাদার খুবই রাশভারী। দাপুটে ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে গোটা 'আশ্রয়'। একমাত্র তুলিকাই তাঁকে ভয় পায় না। উপরন্তু ফাদারই তুলিকাকে প্রশ্রয় দেন। তুলিকা প্রথম জীবনে যথেষ্ট দাগা খাওয়ার পরও নিজেকে সংযত করতে পারেনি। রাতে ঘরে ফিরত না মাঝেমধ্যে, জীবনযাপনে ছিল যথেষ্ট বেহিসেবি, উচ্ছৃঙ্খল। ফাদার সব জানতেন, বকাঝকাও করতেন সবার সামনে, কিন্তু তুলিকাকে বাগে আনতে পারেননি কখনও। তেমন ভাবে চেষ্টাও করেননি হয়তো। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কী এমন কারণ যার জন্য তুলিকাকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ফাদার!

২. 'আশ্রয়'-এর নিশ্চিন্ত জীবনে হঠাৎই উদিত হয়েছিলেন আলফ্রেড ডিসুজা নামের এক গোয়ানিজ। লোকটির চেহারা কিম্ভুতকিমাকার, পোশাক আশাক বিসদৃশ, তেমনই তার আচরণ। সারাক্ষণ মুখে আলতো হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়। সেইসঙ্গে কোনও একটা মোটিভ নিয়ে কারও সঙ্গে মেশে, কথা বলে। এ ধরনের লোককে দেখলেই বোঝা যায় তার উদ্দেশ্য ভাল নয়। লোকটি যখন হ্যান্ডশেক করতে তার থাবার মতো হাতে তুলে নিত আমার হাত বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার ভেতরের মানুষটার স্বরূপ। আমার সঙ্গে মাত্র একদিন আলাপের পরই তিনি আমার অফিসে গিয়েছিলেন। একটা দশ কোটি টাকা ঋণের প্রকল্পে আমাকে বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসেবে সই করাতে। ঘটনাটা বিস্মিত করার মতো। সেই লোকটির হাতে প্রথমে রাইকে তুলে দিতে চেয়েছিলেন ফাদার। রাই অস্বীকার করায় তাঁকে দেওয়া হল শিরিন নামের অন্য একটি মেয়ে। প্রশ্ন হল, আলফ্রেড ডিসুজার মতো ধুরন্ধর লোকের হাতে একটি নিরীহ কিশোরীকে কেন তুলে দিলেন ফাদার!

৩. আর এক বিচিত্র চরিত্র বিলাস সান্যাল। তার ঘন ঘন 'আশ্রয়'-এ আগমন ও নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা কি ফাদারের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল! কম্পাউন্ডের ভেতর এত এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, সেখানে বাইরের লোক বিলাস সান্যাল কেন আসে, প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তার, তা কি একবারও মনে হয়নি ফাদারের! অন্তত নিবেদিতাকে ডেকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারতেন কেন লোকটা আসে, এখনও কেন তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে নিবেদিতার—যখন লিখিত পড়িত ভাবে ডিভোর্স হয়ে গেছে তাদের!

৪. মুম্বইয়ের শ্রীরাধা রিয়াকে পছন্দ তরে তাকে দত্তক নিলেন, আর ডিসুজা শিরিনকে দত্তক নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লিতে কনভেন্টে পড়তে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রিয়া ও শিরিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফাদার। কিন্তু তাদের গাঁ থেকে যখন ফেরত নিতে এল রিয়া ও শিরিনকে, ফাদার তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বন্ধ করতে চাইলেন মুখ। রিয়া বা শিরিনকে একবারের জন্যও আর কলকাতা আনতে পারলেন না এটা খুবই আশ্চর্য লেগেছিল। নিবেদিতা চেয়েছিল মাত্র কয়েক দিনের জন্য রিয়াকে 'আশ্রয়'-এ আনতে। 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ করতে রিয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তখনও ফাদার জানিয়েছিলেন রিয়াকে ছাড়বেন না শ্রীরাধা। এটাও যেন মনে হচ্ছিল ছন্দহীন একটা ব্যাপার।

৫. একদিন কাগজে দেখলাম ডিসুজা প্রযোজনা করছেন একটা বিশাল বাজেটের ছবি। তাতে অভিনয় করছেন শ্রীরাধা। মহরতের খবরটা পড়ে তেমন চমকে উঠতাম না যদি না ঠিক তার আগেই ফাদার জানাতেন তিনি টেলিফোন করেছিলেন শ্রীরাধার বাড়িতে, আর সেখান থেকে জানা গেছে শ্রীরাধা বেশ লম্বা ট্যুরে পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকা। এ ক্ষেত্রে হয় শ্রীরাধার বাড়ি থেকে মিথ্যে খবর দেওয়া হয়েছে, নচেৎ ফাদারই ঠিক কথাটা বলছেন না। অর্থাৎ কোথাও একটা গোপনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে সংবাদটিতে।

৬. সন্দেহটা আরও ঘন হল যে দিন খবর পাওয়া গেল মুম্বইতে পর পর বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাতে মুম্বই চিত্রজগতের অনেক অন্ধকার দিক সহসা ফুটে উঠেছে দগদগে আলোর মতো। জানা গেল শ্রীরাধা যতটাই গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী, তাঁর জীবনের একটা দিক ততটাই অপরিচিত। তাঁর সঙ্গে একটা অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে দুবাইয়ের কুখ্যাত মাফিয়াচক্রের। দুবাই নামটা শুনেই ছাঁত করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। সেই মুহূর্তে একটাই ভাবনা চিড়িক মেরে উঠেছিল, রিয়া ভাল আছে তো!

ঠিক এ রকমই কয়েকটা ভাবনায় আমি তখন জেরবার। একটা সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো দ্রুত পৌঁছতে চাইছিলাম কোনও সরল সমাধানে। আমার সামনে তখন অনেকগুলো চরিত্র। অনেক বিপ্রতীপ ঘটনা। অনেক দোলাচল। প্রত্যেকেরই সম্পর্কে কিছু সন্দেহ গিজগিজ করছে মগজের কুঠুরিতে। মনে হচ্ছিল এঁদের যে কেউই হতে পারেন এত সব কাণ্ডের হোতা।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি বললেন, কিন্তু সবাই নিশ্চয়ই নয়।

—না, তা নয়। অঙ্কটা তাই মিলছিলও না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কষছি তো কষেই চলেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে দিল তুলিকা।

—তুলিকা!

—হ্যাঁ, তুলিকাই একদিন ঈশ্বর-প্রেরিতের মতো আমার গাড়িতে উঠে বসে আমাকে ধরিয়ে দিল এত সব রহস্যের যাবতীয় ক্লু।

—তুলিকার কাছেই শুনতে পেলেন সব!

—না, তুলিকা নিজের মুখে বলেনি। জীবিত তুলিকা কিছুই বলেনি কেন ঘটছে ঘটনাগুলো। ক্লু-গুলো আসলে বলে দিল তার ফেলে যাওয়া একটা ভ্যানিটি ব্যাগ।

সবাই তখন উদগ্রীব হয়ে রয়েছে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কী করে ক্লু ধরিয়ে দিল গার্গীর হাতে।

— হ্যাঁ, তুলিকা সেদিন রাতেই খুন হয়ে যায়। তখনও ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দেখিনি তার ভেতর কী আছে। কয়েক দিন পর কৌতূহল হতে ভ্যানিটি ব্যাগটা বিছানার ওপর উল্টে দিতেই হঠাৎ আবিষ্কৃত হল রহস্যের সূত্রগুলো। আশ্চর্য হয়ে তখন ভাবছিলাম কোনও জীবিত ব্যক্তি নয়, এক মৃত ব্যক্তি এ ভাবে এত বড় একটা রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করতে পারে! আর সে কিনা তার নিজেরই অপরাধমূলক কাজগুলো ধরিয়ে দিতে সাহায্য করল!

—আপনি কি বলতে চাইছেন সব কাণ্ডের হোতা তুলিকাই! তা হলে সে খুন হলই বা কেন! কে খুন করল তাকে!

গার্গী হাসল, তুলিকা একাই অপরাধী নয়, তার পেছনে আরও কয়েকজন।

—কারা তারা?

—তারা কেউ নেপথ্যে কেউ সামনে। তাদেব কথাই এবার বলব একে-একে। তবে তুলিকা মারফতই মেয়েরা পাচার হয়েছিল একে-একে। পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় একদিন একটা অদ্ভুত উত্তর পেয়েছিলেন বিলাস সান্যালের কাছ থেকে, 'একজন তত্ত্বাবধায়কই এ সব করছে।' তখন ঠিক বিশ্বাস হয়নি কারও। পরে অঙ্ক কষে দেখলাম, তুলিকাই—

—কিন্তু তা হলে সমুদ্রনীলেব সঙ্গে এতগুলো কিশোরীকে দেখা গেল কী করে! নিবেদিতার আচরণও তো সন্দেহের বাইরে নয়। তা হলে কি এরা সবাই মিলেই?

—যাদের সম্পর্কে আমার সন্দেহ হয়েছিল সেগুলো এক-এক করে বলেছি, তাদের মধ্যে কেন একা তুলিকাকেই দোষী সাব্যস্ত করলাম তাই এবার বলব। এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই নিবেদিতাকে চিনি। সি ইজ এ গুড সোল। তবু তার নিজেরই কারণে সে আজ সবার সন্দেহের লক্ষ্যবস্তু। চৈতালি নিখোঁজের ব্যাপারে তার কোনও দোষ ছিল না। সে জানত না তাকে ঘিরে পাতা হয়েছিল ষড়যন্ত্রের জাল। ফাদার নিবেদিতাকে বলেছিলেন ফুল কেনার সময় চৈতালিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। তুলিকা উপস্থিত ছিল সে সময়। যারা নীল অ্যাম্বাসাডার নিয়ে ঘোরঘুরি করছিল 'আশ্রয়'-এর গেটের সামনে, তাবা খবরটা পেয়ে গেল পর মুহূর্তে। ফাদার যদি ফুল আনার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠানের কোনও গাড়ি দিয়ে দিতেন, তা হলে নিশ্চিত চৈতালিকে হারানোর সুযোগ ঘটত না। কিন্তু অত ফুল কেনাব পর ট্যাক্সি খুঁজতে গিয়েই নিবেদিতাকে অরক্ষিত রেখে যেতে হল চৈতালিকে। তারপব যা ঘটার ঘটে গেল।

তার কয়েক দিন পরেই অতসী বাতে ঘুম ভেঙে কাউকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'চৈতালি চৈতালি'। সবাই অবশ্য সন্দেহ করেছিল নিবেদিতাকেই। আসলে সে তুলিকা। তার ওপর নির্দেশ ছিল মেয়েদের হোস্টেলে বাতে গিয়ে কিশোরী পাচার করতে। একদিন রাতে তুলিকা হোস্টেলে ঘুমিয়েছিল রিয়াকে ভোরবেলা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে বলে। ঠিক সেই রাতেই নিখোঁজ হয়েছিল অতসী। অর্থাৎ সেই ভোরে তুলিকা শুধু রিয়াকে নয়, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল অতসীকেও ওদের প্লেনে তুলে দিয়ে এসে 'আশ্রয়'-এ ফেরে। 'অতসীকে পাওয়া যাচ্ছে না' শুনে রীতিমত আকাশ থেকে পড়েছিল। আবার শেফালি আর বীথি যে রাতে উধাও হয়েছিল, তুলিকাকেই কিন্তু দেখা গিয়েছিল কম্পাউন্ডের ভেতর হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল একটা গাড়ি। তাতে দুজনকে তুলে দিয়ে ফিরে আসে হোস্টেলের দিকে। তার ঠিক পরে আঙ্কেল তরফদারও ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলেন গেটের দিকে। বোধহয় গাড়ির শব্দ শুনেই। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটা বেরিয়ে গেছে। তাদের ধরতে তো পারলেনই না, উপরন্তু দোষী সাব্যস্ত হলেন তুলিকার কাছে। গেটম্যান বিষেন সিংকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন ঘটনাটা। বেচারি চাকরি হারানোর ভয়ে কিছুই বলতে পারেনি এতদিন।

এর সঙ্গে আরও একটা তথ্য খেয়াল রাখতে হবে। রাইকে ডিসুজার কাছে দত্তক দিতে তুলিকাই চাপাচাপি করেছিল বেশি। রাই রাজি না হওয়াতে সে-ই প্রস্তাব করে শিরিনের নাম।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, কিন্তু এগুলো হয় তো সবই আপনার মন গড়া গল্প। বাকি যাদের সন্দেহভাজন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে কী ব্যাখ্যা দেবেন? রাইকে পাওয়া গেল সমুদ্রনীলের হেপাজতে, তাই বা সম্ভব হল কী ভাবে?

—হ্যাঁ, সে প্রশ্নের উত্তরও আপনাকে দেব, মি. চ্যাটার্জি। সমুদ্রনীল সম্পর্কে সবার মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা সমুদ্রনীলের দোষেই। এই কম্পাউন্ডের অনেকেই জানেন ত্রিস্তা চলে যাওয়ার পর খুবই যন্ত্রণার মধ্যে ছিল সমুদ্রনীল। সে সময় রাই আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। হতাশ সমুদ্রনীল প্রথমে তাকে আমল দেয়নি তেমন, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাইকে নিয়েই ঘর বাঁধবে। ঠিক এই সময় ঘটনা পরম্পরায় জানা গেল রাইয়ের ওপর দৃষ্টি পড়েছে তুলিকাদের। রাইকে যদি এখনই না সে উদ্ধার করে, তা হলে রাইও একদিন রাতে উধাও হয়ে যাবে তার বাকি বান্ধবীদের মতো। সমুদ্রনীলেরই পরমার্শ অনুযায়ী রাই এক সকালে আঙ্কেল তরফদারের অনুমতি নিয়ে গেটের বাইরে যায়। সমুদ্রনীল সেখান থেকে তাকে নিয়ে রেখে আসে কোনও নিবাপদ আস্তানায়। কয়েক দিন পর সে নিজেও চাকরিটা ছেড়ে দেয়।

নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে সমুদ্রনীল একদিন রাইকে দিয়ে ফোন করাল 'আশ্রয়'-এ। রাই খোঁজ করল তার নীলদার, জানাল সে বন্দি হয়ে আছে বহুদূরে, কোনও দুর্বৃত্তের অধীনে। সবাই বিভ্রান্ত হল তাতে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভ্রান্তিও সমুদ্রনীল ঘটিয়েছে। তাতে রাই নিরাপদ থাকবে এই ভেবেই হয়তো। প্রথমে রেস্তরাঁয় খাওয়ার সময় তার সঙ্গে যে কিশোরীকে দেখা গিয়েছিল। তার নাম বলেছিল চৈতালি। শিয়ালদহের মেসে যাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছিল তার নাম লিখেছিল বীথি। আমি নিশ্চিত চৈতালি বা বীথি নয়, তার সঙ্গে ছিল রাই-ই। সাদা পোশাকের পুলিশ কিংবা মেসের লোকজন কেউই চৈতালি বা বীথিকে চেনে না। তাই সমুদ্রনীল বা রাই যে নাম বলেছে তাই বিশ্বাস করেছে তারা। নিবেদিতা কিন্তু ঠিকই চিনেছিল বাসে বসে থাকা রাইকে। সমুদ্রনীল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে রাইয়ের সঙ্গে তা জানার সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল আমার হিসেব।

—ঠিক আছে, এটা না হয় মানলাম, কিন্তু নিবেদিতা সান্যাল কিংবা আঙ্কেল তরফদারের ভূমিকার কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?

—নিবেদিতা সম্পর্কে একটাই প্রহেলিকা তা হল, তার প্রাক্তন স্বামী বিলাস সান্যাল কেন দেখা করতে আসতেন তার কাছে। এ প্রশ্নটা কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি রেখে আমি আগে আঙ্কেল তরফদারের কথা বলি। আঙ্কেলের পারিবারিক জীবন একটু গোলমেলে যেহেতু তিনি রাত্রি যাপন করেন অন্যত্র। কিন্তু অনুসন্ধানের পর পুলিশ তাঁর সম্পর্কে যেটুকু খবর উদ্ধার করেছে তাতে দেখা যায় তিনি নিতান্তই একজন ছাপোষা গেরস্ত। 'আশ্রয়' থেকে তাঁর যা রোজগার, তাতে সম্ভবত দুটি সংসার চালানো যায় না। সে কারণেই তাঁকে আরও নানা পার্টটাইম চাকরিতে ব্যস্ত থাকতে হয় সকাল-বিকেল। বিশেষ করে রবিবারে যে কাজটি করেন তা থেকে সম্ভবত একটা ভাল রোজগার তাঁর।

পুলিশ ইন্সপেক্টর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানতে পেরেছেন তিনি কিসের ব্যবসা করেন?

—হ্যাঁ। বিদেশ থেকে আনানো এক ধরনের কনট্রাসেপটিভের। পুলিশের ভয়ে আপাতত তাঁর ব্যবসা বন্ধ। তাই আপনারা চেষ্টা করেও জানতে পারেননি। তার আগেই এক রবিবারে তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে যা জানলাম তা খুবই অদ্ভুত। বিদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। সেখান থেকে অ্যাটাচি ভর্তি হয়ে আসে ট্যাবলেটের স্ট্রিপ। সেগুলো জোগান দেন কিছু রোডসাইড হোটেলে, কিছু নিষিদ্ধপল্লিতে। তাঁর খবিদ্দাববাও স্বাভাবিক কারণেই গোপন

রাখতে চান ব্যাপারটা। এমনকী তুলিকাও তাঁর খদ্দের। আঙ্কেলের এই গোপন ব্যবসার কথা সবাইকে জানিয়ে দেবে বলে প্রায়শ তুলিকা হুমকি দিত। ছাপোষা আঙ্কেল তাতে ভয় পেতেন তুলিকাকে। ব্যবসাটা কারও কাছে প্রকাশ করতে চান না পাছে সবাই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে কিংবা নিচু চোখে দেখে।

আঙ্কেলের নীল অ্যাম্বাসাডারে চড়াটাও সন্দেহের কারণ। আসলে ওটা 'কার রেন্টাল'-এর গাড়ি। হয়তো বিল হত 'আশ্রয়'-এর নামে। তাই এই গাড়ির ব্যবহার সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখতেন আঙ্কেল। কয়েক দিন আগে তাঁকে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ঢুকতে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। আসলে ডিসুজার প্লেনে খাবার দেওয়ার বরাত পেয়েছিলেন বলেই তাঁর যাওয়া। এগুলোই তাঁর পার্টটাইম রোজগার।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি এতক্ষণে বললেন, ফাদারের বিষয়ে আপনি কিন্তু কিছুই বলেননি। তা ছাড়া আজ সকালে ইঁদুরকলের ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করা হল যদের, তারাই বা অপরাধী সাব্যস্ত হল কী ভাবে?

—হুঁ। এইবার আমি আসল গল্পে ঢুকব। তুলিকাকে অপরাধী বলে সনাক্ত করলেও সে নিতান্তই কারও হাতের বোড়ে। রাজা, মন্ত্রী, কোটাল সবাই রয়ে গেছে অন্তরালে। সেই কাহিনীর আসল সূত্র সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে—ইংলন্ডে। আলফা-বিটা-গামা-ডেল্টার কাহিনী। বলতে পারেন এই রহস্যের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

## ॥ ৩৭ ॥

হোস্টেলের প্রেয়ার রুমটিতে তখন একঘর লোক টান টান হয়ে শুনছে গার্গীর বিশ্লেষণ। তখনও কেউ অনুমান করতে পারছে না কলকাতার বালিগঞ্জে ঘটতে থাকা একরাশ অপরাধকর্মের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ইংলন্ডে। থমথমে মুখগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে গার্গী শুরু করল পুনর্বার ঃ

—আপনি হয়তো ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছেন, মি. চ্যাটার্জি, এই প্রতিষ্ঠানের ফাদার, অর্থাৎ ডা. ইন্দ্রনীল বটব্যালের জীবনের একটা অংশ কেটেছে ইংলন্ডে। যাকে বলে উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রা, সে রকমই একটা মহৎ কাজে ধনী পরিবারের সন্তান ইন্দ্রনীল গিয়ে ঠেক খেলেন এক কালে বিলেত নামে পরিচিত দেশটায়। করলেনও পড়াশুনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, সেখানে পরিচিত হলেন আর এক ভারতীয় আলফ্রেড ডিসুজার সঙ্গে। বলতে পারেন তার খপ্পরে পড়লেন। নিশ্চয়ই শুনেছেন, ডিসুজা সবাইকে বলতে ভালবাসেন যে, তিনি এক ক্যানাডিয়ান ধনকুবের জ্যাকোয়াস লেডাকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ অলঙ্কৃত করেন কিছুকাল। যে চাকরিতে তাঁর কাজ ছিল কী উপায়ে তাঁর বসের জীবনযাপন আরও সুখে আরও বৈচিত্রে ভরপুর করে তোলা যায়। জ্যাকোয়াস লেডাকের ঐশ্বর্যের কোনও অভাব ছিল না, অভাব ছিল বয়সের। তখন তিনি ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি যাঁর মনে ভোগের লালসা

চূড়ান্ত ভাবে বর্তমান। কিন্তু বুঝতে পারছেন খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন না, তার আগেই জীবনকে উপভোগ করে নিতে হবে টায়-টায়।

পরবর্তী কথা শুরু করার আগে কয়েক মুহূর্ত থেমে গার্গী সাজিয়ে নিল তার বক্তব্য।

—দেখুন, গল্পটা যেভাবে সবার কাছে বলে থাকেন ডিসুজা, আসল ঘটনাটা তার থেকে একটু অন্য রকম। বস্তুত ডিসুজার আগাপাস্তলা শরীরটা শুধু মিথ্যেয় ভর্তি। তাঁর আসল পরিচয় পেলে বেশ চমকে উঠবেন সবাই।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, কী পরিচয় ওঁর?

—ডিসুজা একজন কুখ্যাত ব্যাঙ্ক ফ্রড যিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নামী ব্যাঙ্ককে একেবারে ফতুর করে দিয়ে এসেছেন কয়েক বছর আগে। আর যাকে তিনি জ্যাকোয়াস লেডাক বলে পরিচয় দেন, সেই লোকটি আসলে ওই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, যাঁর মাথায় টুপি পরিয়ে একের পর এক লোন স্কিম মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। যদি ধরে নিই জ্যাকোয়াস লেডাক নয়, তার নাম মি. এক্স। আলফ্রেড ডিসুজার নামও নিশ্চয়ই সেখানে অন্য কিছু ছিল। অন্য নামেই অপকর্মগুলো করে, কোটি কোটি ডলার সাইফন করে পালিয়ে যান অন্য দেশে লুকোতে। তখনকার নাম হয়তো ছিল মি. আলফা।

আলফ্রেড ডিসুজা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওই ব্যাঙ্কে সামান্য কাজে নিযুক্ত হয়ে ক্রমে নজরে পড়ে যান ব্যাঙ্কের খোদ চেয়ারম্যান মি. এক্সের। চেয়ারম্যানের বয়স হয়েছে, জীবন ঢলে পড়েছে মৃত্যুর দিকে, সে সময় আলফা তাকে চেনালেন কী ভাবে ষাটোর্ধ্ব বয়সেও নতুন ভাবে ভোগ করা যায় জীবনটা। শুধু ভোগের অনুপান জোগান দিয়ে যাওয়াই তাঁর কাজ। শ্রেষ্ঠ নারী থেকে শ্রেষ্ঠ সুরা, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সেরা জায়গাগুলোতে অবসর বিনোদনের সুযোগ করে দিলেন ষাটোর্ধ্ব মানুষটাকে। তার বিনিময়ে মি. এক্সের টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে সিদ্ধ করতে লাগলেন তাঁর মনস্কাম। বিভিন্ন সংস্থার নামে মঞ্জুর করানো প্রকল্পের ডলার আসলে জমা হয় তাঁরই নামে ও বেনামে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললেন, তা হলে আপনি কি বলতে চান যে-গোয়ানিজ লোকটিকে আজ সকালে এয়ারপোর্টে গ্রেফতার করেছি তিনিই সেই বিখ্যাত প্রতারক যাব খোঁজে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে ইন্টারপোলের একটা দল!

—এক্জ্যাক্টলি, গার্গী হেসে বলল, তাকে গ্রেফতার করার ফলে হয়তো আপনার একটা প্রমোশন হয়ে যেতে পারে, মি. চ্যাটার্জি। যাই হোক, আসল কথায় ফিরে আসি। ডা. ইন্দ্রনীল বটব্যালের ইংলণ্ড বসবাসের দিনগুলিতে তাঁর বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও পথ-নির্দেশক হিসেবে সহসা দেখা দিলেন এই আলফ্রেড ডিসুজা বা মি. আলফা। ইন্দ্রনীলের অর্থের অভাব তেমন ছিল না। তবু যাঁরা অর্থবান, তাঁদের অর্থের লালসা দিনে দিনে বাড়ে। তিনিও মি. আলফার পাল্লায় পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই ব্যাঙ্কটি থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিলেন কয়েক কোটি ডলারের প্রকল্প। অবশ্যই নিজের নামে প্রকল্পটি জমা দেননি। ধরা যাক বটব্যাল হয়ে গেলেন মি. বিটা। মি. আলফার সঙ্গে তাঁর একটাই শর্ত, এভাবে ফোকটে পেয়ে যাওয়া প্রকল্পের টাকার একটা মোটা অংশ কাটমানি হিসেবে জমা করতে হবে মি. আলফার অ্যাকাউন্টে।

—কী বলছেন আপনি! কেউ যেন অস্ফুটে বলল।

ফাদারের নামে এ রকম একটা বিশ্রী কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ার সমস্ত 'আশ্রয়' যে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তা গার্গী বুঝে ফেলল শ্রোতাদের মুখচোখের দিকে তাকিয়ে।

সে কথায় আমল না দিয়ে গার্গী ততক্ষণে আবার শুরু করেছে, মি. আলফা এ ভাবে কত জনের নামে কত স্কিম স্যাংশন করিয়ে তা থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ জমা করেছিলেন নিজের অ্যাকাউন্টে, সেই জটিল তত্ত্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা সেই দেশটির মানুষের মাথাব্যথা থাকতে পারে, আমাদের নেই। শুধু এর সঙ্গে আর একটা তথ্য যোগ করা জরুরি যে, আর একজন ভারতীয়, তিনিও মি. আলফার স্নেহধন্য হয়ে এ রকমই কোষাগার লুণ্ঠনের শরিক হয়েছিলেন। তাঁরও সে সময় পরিচয় ছিল ইংলণ্ডবাসী হিসেবে। পোশাকি নাম ছিল গণেন্দ্রনাথ বাগচি, কিন্তু ব্যাঙ্কফ্রডের সময় হয়তো নাম নিয়েছিলেন মি. গামা।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির এই বিশাল চক্রটির কাজকর্ম অচিরেই জানাজানি হয়ে গেল সে দেশে। তাতে তিন জনেই পালিয়ে এলেন তাদের আদত বসবাসের জায়গা ইংলণ্ডে। কিছুকাল ছদ্মবেশ ত্যাগ করে থাকলেন। আলফা হয়ে গেলেন আলফ্রেড, বিটা হয়ে গেলেন বটব্যাল, গামা হলেন গণেন্দ্রনাথ বাগচি। আপাতদৃষ্টিতে সবাই ধনীঘরের সন্তান, যে যার জীবনযাপনে ব্যস্ত, স্থানীয় বাসিন্দাদের তেমন মাথা ঘামানোর সুযোগও নেই কোন পল্লিতে কোন ভারতীয় কী করে, তাদের অতীত ইতিহাসই বা কী! তোলপাড় যা হওয়ার তা হচ্ছে সেই ব্যাঙ্কটিতে বা তাদের দেশে। প্রতারকদের অবশ্য খোঁজাখুঁজি চলছে যথারীতি।

ঠিক এ রকম সময় এক ভারতীয় তরুণী তার প্রেমিকের খোঁজে হাজির হন ইংলণ্ডে। খুবই দুঃসাহসী অভিযান। এ রকম দুঃসাহসীদের প্রায়শ চরম মূল্য দিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও দিতে হল ভাল মতো। প্রেমিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়েটি যখন পার্কের মধ্যে একা-একা কাঁদছে, সে সময় আলফ্রেড ডিসুজার চোখে পড়ল তাকে। একজন ভারতীয় তরুণীকে এ ভাবে অসহায় বসে থাকতে দেখে ও তার করুণ বৃত্তান্ত শুনে আলফ্রেড তাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। মেয়েটির তখন এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। আলফ্রেড তখন প্রৌঢ়, হাতে কোটি কোটি ডলার, এর আগে তাঁর বসকে শিখিয়েছেন কী ভাবে উপভোগ করতে হয় জীবনটা। এখন তাঁর নিজেরও তো ইচ্ছে করে জীবনটা ভাল করে চেখে দেখতে।

মেয়েটির নাম ধরা যাক ডেল্টা। প্রেমিকের খোঁজে তার অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় তাকে বাধ্য হতে হল এক প্রতারকের খপ্পরে জীবনযাপন করতে। সে জীবন নিশ্চয়ই খুব সুখের জীবন নয়। আলফ্রেড অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন তরুণীটিকে ডলার দিয়ে মুড়ে রাখতে। ডি নামে ডাকতেন, বেড়াতে নিয়ে যেতেন এখানে ওখানে, কিন্তু আর পারলেন না। অল্পবয়সী মেয়েটির সঙ্গে একদিন আলফ্রেডের বাড়িতেই আলাপ হল ইন্দ্রনীল বটব্যালের। তিনি তত যুবক নন, তবু তাঁর ব্যাচেলার জীবনের আকর্ষণও কম মনে হল না ছটফটে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণীর কাছে। আলফ্রেড ডিসুজার সাউদ্যাম্পটনের ঘর থেকে সে একদিন ডেরা বদল করল গ্রেঞ্জ রোডের ইন্দ্রনীল বটব্যালের ফ্ল্যাটে। ডিসুজার প্রবল বাধা সত্ত্বেও। ব্যাপারটা নিয়ে ডিসুজা বেশি হইচইও করতে পারলেন না যেহেতু তাঁর নামে ঝুলছে গ্রেফতারি পরওয়ানা। ইংলণ্ডে বসবাস করছেন ফেরারি হিসেবে।

ইন্দ্রনীল বটব্যাল কিন্তু ভালই বেসেছিলেন মেয়েটিকে। আদর করে তার নাম দিয়েছিলেন ডায়ানা। সুখী দম্পতি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। কিন্তু মেয়েটি তার স্বভাবের কারণেই হোক, অতি উচ্চাশার ফলেই হোক, কিংবা ডিসুজার কাছে থেকে ডলারে ডুবে থাকার জন্যেই হোক, ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছিল তার জীবনযাপনে। এতটাই বেহিসেবি যে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লাগামে রাশ টানতে পারছিলেন না ইন্দ্রনীল। এ পার্টিতে ও পার্টিতে বে-

বল্‌গা নিশিযাপন করার ফুরসতে তার সঙ্গে আবার আলাপ হয়ে গেল ঝকঝকে চেহারার এক যুবক গণেন্দ্রনাথ বাগচির। মেয়েটির ফর্সা, গোলছাঁদের মুখখানা অমনি পাগল করে দিল যুবকটিকে। ভালবেসে মেয়েটির নাম দিল ডালিয়া।

বোহেমিয়ান স্বভাবের মেয়েটি আবার একদিন ঘর ভাঙল ইন্দ্রনীল বটব্যালের। বোধহয় যে একবার ঘর ভাঙে, তার বারবার ঘর ভাঙার ইচ্ছে হয়। এক বা দুই পুরুষে তখন তার আর সাধ মেটে না। ঘর বদল করতে থাকে ক্রমশ। ইন্দ্রনীলের গ্রেঞ্জ রোডের ঘর ছেড়ে সে গিয়ে উঠল গণেন্দ্রনাথ বাগচির পোর্টসমাউথের ফ্ল্যাটে।

বয়সের হিসেবে ডলির সঙ্গে গণেন্দ্রনাথের মিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো সে রকমই কাটছিল দুজনের। কিন্তু কোথা থেকে কী হল, এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল পোর্টস মাউথের বাড়ি থেকেও ডলি উধাও। গণেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর নিখোঁজ সঙ্গিনীর ব্যাপারে বেশি হইচই করতে পারলেন না, কারণ তাঁর নামেও তখন ওয়ারেন্ট। ইন্দ্রনীল বটব্যালের পরিণামও তাই। ফলে এক নারী তিন-তিন জনের ঘর ভেঙে উধাও হয়ে গেলেও কোনও পুরুষেরই কিছু করার থাকেনি। বরং সে সময় ইংলণ্ডের পুলিশ তাদের সন্ধান পাওয়ায় তিন জনই সেখান থেকে নিপাত্তা। কে কোথায় কতদিন ছিলেন তা জানা যায়নি, কিন্তু বহুকাল পর এক-একজন এক-এক সময়ে ভেসে উঠলেন কলকাতায়। কলকাতা শহরটা এমনই মানুষের জঙ্গলে ভরা, এত রকম লোক থাকে যে, পাঁচমিশেলি ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে জীবনযাপন করাটা সবচেয়ে সুবিধের।

তিন জনে কলকাতায় এসে কী ভাবে জীবনযাপন করছেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে একটা ধারণা হয়ে গেছে আমাদের। শুধু একটা গল্প জানা হয়নি তা হল ইংলণ্ডে ডলি নামের যে মেয়েটা উধাও হয়ে গেল, তার পরিণাম। এ ব্যাপাবে আমার স্বামী সায়ন চৌধুরির ইউরোপ ভ্রমণটা খুব কাজে লেগে গেল। এই জটিল রহস্যটার জট ছাড়াতে সায়নের দুটো চিঠিই মস্ত ক্লু। খুব সম্প্রতি পোর্টসমাউথের একটা জায়গায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু হাড়গোড় আর একটা করোটি। সেটি পরীক্ষান্তে জানা গেছে ওগুলো সেই ডলিরই। কোনও ভারী বস্তু দিয়ে তাকে মাথায় আঘাত করে খুন করে পুঁতে রাখা হয়েছিল ওখানে। কী ভাবে খুন হল, কে খুন করল তা নিয়ে জোরালো তদন্ত করেছে ওখানকার পুলিশ। আপনারা জানেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের দক্ষতা অসাধারণ। তারা প্রথমে ভেবেছিল ডেল্টাকে খুন করেছে তার সর্বশেষ স্বামী গণেন্দ্রনাথ বাগচি। কারণ করোটিটা পাওয়া গেছে পোর্টসমাউথে।

কিন্তু তদন্ত চলাকালীন ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে এক বিচিত্র কাহিনী। গণেন্দ্রনাথ বাগচি তখন ফেরার। ব্রিটিশ পুলিশ তাকেই হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করছে ও মামলা সাজাচ্ছে সে ভাবেই, তা জানতে পেরে তিনি একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। তাতে প্রমাণ দিয়েছেন ডেল্টা অর্থাৎ ডলি যে রাতে খুন হয়, তখন তিনি কোনও কাজে হল্যাণ্ডে। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরে স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু সন্ধান পাননি। পরে ব্রিটিশ পুলিশের তদন্তের ধারা জানতে পেরে নিশ্চিত হন নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে ডলিকে। আর খুন করেছেন অন্য কেউ নয়, ইন্দ্রনীল বটব্যাল।

—সে কী! 'আশ্রয়'-এর বাসিন্দারা প্রায় একযোগে চিৎকার করে উঠল, কী বলছেন কী আপনি?

—উঁহু, কথাটা আমি বলিনি। বলেছেন ওখানকার কোর্টের জজসাহেব। গণেন্দ্রনাথ বাগচি চিঠিতে জানিয়েছেন ডলি তাঁর কাছ থেকে গণেন্দ্রনাথের কাছে চলে আসায় ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন ইন্দ্রনীল। ডলিকে ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েক বার হানা দিয়েছিলেন তাদের পোর্টসমাউথের ফ্ল্যাটে। ডলি সে ডাকে সাড়া দেয়নি। তাতে ইন্দ্রনীল প্রায় পাগল হয়ে গণেন্দ্রনাথকে একাধিকবার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, ডলি যদি তাঁর কাছে না ফেরে, তা হলে ডলি আর গণেন্দ্রনাথ দুজনকেই গুলি করে মারবেন। সে চিঠির কপিও আদালতে পাঠিয়েছিলেন গণেন্দ্রনাথ। আদালত আরও নানা প্রমাণে সন্তুষ্ট হয়ে রায় দিয়েছে ডলিকে খুন করেছেন ইন্দ্রনীল বটব্যালই।

কোর্টের রায় তত দিনে জানাজানি হয়ে গেছে আলফা-বিটা-গামা তিন 'কৃতী' পুরুষের কাছে। বিটা অর্থাৎ ইন্দ্রনীল বটব্যাল তখন কলকাতায়। বাকি দুজনও এখানে ওখানে দীর্ঘ ফেরারি জীবন কাটিয়ে ঠেক খেয়েছেন এ দেশে। দুজনেরই প্রবল আক্রোশ ইন্দ্রনীলের ওপর। আলফ্রেড ডিসুজার খপ্পর থেকে ডলিকে নিয়ে আসায় তিনি প্রবল ক্রুদ্ধ ইন্দ্রনীলের ওপর। অন্য দিকে গণেন্দ্রনাথের মনেও প্রতিহিংসা। রাতে ঘুমের ঘোরে গণেন্দ্রনাথ ডলির নাম ধরে এখনও ডাকেন। যাই হোক, বিদেশের বিভিন্ন ঘাটে জল খেয়ে তিনি তত দিনে চোস্ত, তুখোড় পুরুষ। হাতে বহু কালো টাকা। শুরু করলেন নানা ধরনের অন্ধকার জগতের ব্যবসা। 'বার' খুললেন কয়েকটা। তাতে নানা ধরনের মেয়েদের এনে ব্যবসাটা আকর্ষক করে তুললেন। এক সময় এনে ফেললেন ত্রিস্তাকেও।

ত্রিস্তা এসেছিল লোভনীয় চাকরির টানে। এসে বুঝল এক প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। তখন তার আর কিছু করার ছিল না। তবু সমুদ্রনীলের কথা বলে মুক্তি চাইল রঙ্গনাথ গুপ্তার কাছে। কাজের কাজ তো কিছু হলই না, বরং রঙ্গনাথ গুপ্তার নজর পড়ল 'আশ্রয়'-এর ওপর। তখন ত্রিস্তাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখালেন সমুদ্রনীলকে। আমার অনুমান ত্রিস্তা নিজে থেকে লিখতে চায়নি। সে তখন রঙ্গনাথ গুপ্তার অন্ধকার জগতের স্রোতে অভ্যস্ত। সমুদ্রনীলের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। তবু চিঠিটা লিখতেই হল তাকে। সমুদ্রনীল কিন্তু সে চিঠিতে কোনও সাড়া দেয়নি।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি বাধা দিয়ে বললেন, কী করে জানলেন এ সব? সমুদ্রনীলের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?

—আপনি সমুদ্রনীলকে গ্রেফতার করেছেন। আমার গল্পে সন্দেহ হলে ওকে জিজ্ঞেস করে নেবেন সব। সমুদ্রনীল তখন রাইয়ের দিকে ঝুঁকেছে। বুঝে গেছে ত্রিস্তার আর মনে নেই তাকে। মনে থাকলে কানপুরে পৌঁছেই চিঠি দিতে পারত। আসলে ত্রিস্তা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যার যতটা সীমা তার চেয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে পরিণাম সব সময়ে ভাল হয় না।

সমুদ্রনীলের দিক থেকে সাড়া না পাওয়ায় রঙ্গনাথ গুপ্তা তাঁর মুম্বইয়ের খোলস ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। নতুন নাম বিলাস সান্যাল। নতুন ব্যবসা শুরু করলেন সফ্‌টওয়্যারের। মেধাটা ভালই ছিল। বেশ নাম করে ফেললেন নতুন ব্যবসায়ে। সেই সঙ্গে ডলিকে হারানোর শোকে বিয়ে করে ফেললেন একের পর এক। সে সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল আলফ্রেড ডিসুজার।

ইন্দ্রনীলের প্রতি ক্রুদ্ধ দুই পুরুষ যখন দেখলেন ইন্দ্রনীল এ দেশে দিব্যি ফাদার সেজে সুখের জীবনযাপন করছেন, বেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁর, দুজনে নিভৃতে বোঝাপড়া করলেন, ইন্দ্রনীলকে রেহাই দেবেন না। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কেসে একটা গ্রেফতারি পরওয়ানা তো ছিলই, তার ওপর ডলিকে খুন করে ইন্দ্রনীল এ দেশে পালিয়ে এসেছেন; তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা ভারী সহজ। দুজনে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন ফাদারের ওপর।

ফাদার কিন্তু একেবারেই চাননি তাঁর এত দিনের প্রতিষ্ঠানটা এ ভাবে কলঙ্কিত হোক। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো একটি কিশোরীকে ওদের হাতে তুলে দিলেই শোধ হবে ঋণ। সে ভাবেই নিবেদিতাকে স্কেপগোট করে চৈতালিকে উধাও করে দিলেন নিউ মার্কেট থেকে।

—সে কী! তবে যে বললেন তুলিকাই এত সব কাণ্ড করেছে!

—তুলিকা এ ক্ষেত্রে একেবারেই ইনস্ট্রুমেন্টাল। আসলে তুলিকাকে ব্যবহার করতে হচ্ছিল ফাদারকে। তুলিকা অনেক দিন ধরেই ফাদারের ঘনিষ্ঠ। তুলিকার যে আচরণগুলো বিসদৃশ ঠেকছিল অন্যদের চোখে, সেগুলো ফাদারের কারণেই। বাইরে রাত কাটাত সে, সেই রাত্রিবাস যে ফাদারের বাংলোতেই তা জানত না কেউ। ফাদার যেন কিছুই জানেন না এমন ভাবে সবার সামনে বকতেন তুলিকাকে।

এর মধ্যে ডিসুজা আর বিলাস সান্যালের চাপ বাড়তে লাগল ক্রমশ। বিলাস সান্যাল 'আশ্রয়'-এ এসে দেখা করতেন নিবেদিতার সঙ্গে। বলতেন, 'সাহায্য করো, নইলে...'। নিবেদিতা ফাঁপরে পড়ল, কারণ বিলাস সান্যালের চাপে নতিস্বীকার করলে 'আশ্রয়'-এর ক্ষতি। আবার না করলে তার নিজের ক্ষতি। আসলে নিবেদিতার শিশুসন্তানটি বিলাস সান্যালের। বিলাস তাকে হুমকি দিতে শুরু করলেন যে, খবর না দিলে শিশুসন্তানটিকে দাবি করে মামলা আনবেন আদালতে।

শিশুটিকে হারানোর ভয়ে নিবেদিতা তার প্রাক্তন স্বামীকে চটাতেও পারতেন না, আবার খবর দিতেও নারাজ।

কিন্তু ইন্দ্রনীল তখন আলফা আর গামার চাপে বিধ্বস্ত। কী করে তাদের ভয়ঙ্কর খিদের হাত থেকে মুক্ত হবেন ভেবে পাচ্ছেন না। পুলিশকে বলছেন তদন্ত করতে, কিন্তু পুলিশ-ক্যাম্প করতে দিলেন না ওদের চাপে। চেষ্টা করলেন শতভিষা রায়কে এনে হোস্টেল সামলাতে। শতভিষা রায়কে নির্দেশ দিলেন 'আশ্রয়' এর দৈনন্দিন খবরাখবর যেন পুলিশকে জানিয়ে রাখে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাকি দুজনের কেউ বা তাদের কোনও অনুচর ফাদারকে লক্ষ করে গুলি ছুড়লেন। ফাদার অবশ্য প্রাণে বেঁচে গেলেন সে যাত্রা।

—কিন্তু মেয়েদের পাচার করা হত কী ভাবে তা তো বললেন না?

—ডিসুজা আর বিলাস সান্যালের চাপে ফাদার তুলিকাকে বলতেন মেয়েদের কাছে পরোক্ষভাবে মুম্বইয়ের টোপ ফেলতে। তাদের বোঝাতে যে, রিয়া যেখানে আছে সেটা স্বর্গরাজ্য। সেখানে অপার বৈভব। জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ। অতসীই প্রথমে টোপ গেলে তুলিকার। রিয়ার সঙ্গে তাকে একই প্লেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর টোপ গেলে শেফালি আর বীথি। সমুদ্রনীল রাইকে নিয়ে না পালালে তার দশাও অন্য মেয়েদের মতো হত।

ফাদার দিল্লি বা হায়দ্রাবাদে যাচ্ছি বলে গিয়ে উঠেছেন এয়ারপোর্ট হোটেলে। তাঁর সঙ্গেই তুলিকা নিচু গলায় কথা বলত টেলিফোনে। তুলিকা মেয়েদের 'আশ্রয়' থেকে নিয়ে চাপিয়ে দিত গেটের বাইরে অপেক্ষারত গাড়িটিতে। গাড়িটা রাতেই চলে যেত এয়ারপোর্ট হোটেলে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললেন, আপনি এত কথা জানলেন কী করে?

—তুলিকার ফেলে যাওয়া একটা ভ্যানিটি ব্যাগই এত সব সূত্র ধরিয়ে দিল। তার মধ্যে ছিল এয়ারপোর্ট হোটেল আর 'কার রেন্টাল'-এর বিল। কিছু টুকরো কাগজ। হোটেলের বিলের সূত্র ধরে আমি গেলাম ওদের অফিসে। দেখলাম, ঠিক যে-রাতগুলোতে অতসী, শেফালি বা বীথি অপহৃত হয়েছে, সেই সব রাতে ফাদার বাস করেছেন ওই হোটেলে যাতে পর দিন ভোরে মেয়েদের তুলে দিতে পারেন প্লেনে। ধরা পড়ার ভয় নেই, কারণ সেই মেয়েরা আর কোনও দিনই এ দেশে ফিরতে পারবে না। ঘটনাগুলো আরও যাচাই করা গেল 'কার রেন্টাল'-এর অফিসে গিয়ে। ফাদাব গাড়ির অপব্যবহার পছন্দ করতেন না। সবাইকে বলতেন কে কোথায় গাড়ি নিয়ে গেছে তা স্লিপের উল্টোদিকে লিখে রাখতে। নিজেও লগবুক লিখতেন পাই টু পাই। 'কার রেন্টাল'-এর অফিসে গাড়ির স্লিপের ফটোকপি থাকে। তা থেকেই জানা গেল সেই রাতে গাড়ি কোথায় গেছে, কখন গেছে, কে সই করেছে স্লিপে। ফাদারের জালেই ধরতে পারলাম তাঁকে।

তা ছাড়া ভ্যানিটি ব্যাগে পাওয়া কিছু টুকরো কাগজ থেকেও উদ্ধার করলাম অনেক অজানা তথ্য। ফাদার আর তুলিকার মধ্যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু কথা চালাচালি। সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠল তাতে।

—কিন্তু তুলিকাকে তা হলে খুন করল কে?

—ফাদারই খুন করতে বাধ্য হয়েছেন। দিল্লি যাবার নাম করে বেরিয়ে সে রাতে দিল্লি যাননি। উঠেছিলেন এয়ারপোর্ট হোটেলে। শতভিষাকে নিয়েই দু'জনের মধ্যে গোলমালের সূত্রপাত। শতভিষাকে 'আশ্রয়'-এ চাকরি দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়নি তুলিকা। তার সন্দেহ শতভিষার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে যাচ্ছে ফাদারের। কিন্তু শতভিষাকে নিয়োগের ব্যাপারে ফাদার এতটাই দৃঢ় ছিলেন যে তুলিকার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। সম্ভবত তুলিকা হুমকি দিয়েছিল ফাদারের সব কথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু শুধু তাতেই ভীত হয়ে ফাদার এত বড় একটা অপরাধ করবেন তা মনে হয় না। হয়তো সত্যিই ডিভোর্সি শতভিষার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তুলিকা ছিল তাতে প্রধান বাধা।

—কিন্তু তিনি অত রাতে 'আশ্রয়'-এ এসে খুন করলেন কীভাবে?

—সেটাই তো আসল রহস্য। আঙ্কেলের ঘরের সামনে দ্বিতীয় সিঁড়িটা লক করা থাকত। তার একটা চাবি থাকত আঙ্কেলের কাছে, অন্যটি ফাদারের জিম্মায়। সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের পাশে একটা গোপন কুঠুরি আছে। কেউ জানে না তার ভেতর দিয়ে পাঁচিলের বাইরে বেরুনোর একটা গোপন পথ আছে। ফাদারই জানেন সেই পথটি। তাই তাঁর পক্ষে এ পথে ভেতরে ঢুকে তুলিকার ঘরের দরজায় টোকা দেওয়াটা অসম্ভব হয়নি। তুলিকা ভাল মনেই দরজা খুলেছিল। অবশ্য অবাক হয়েছিল ফাদারকে দেখে। সে তখনও জানত না কথা বলাবলির ফুরসতে বিছানায় পড়ে থাকা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দিয়ে অমন ভাবে মারবেন তার মাথায়।

—কিন্তু পর দিন ফাদারের ফ্যাক্স বার্তা পেয়েছিলাম দিল্লি থেকে। সেটাই বা কী ভাবে সম্ভব হল!

—হ্যাঁ। এয়ারপোর্ট হোটেলের রেজিস্টার থেকে দেখেছি, ফাদার সে-রাতে দিল্লি যাননি, হল্ট করেছেন এয়ারপোর্ট হোটেলে। মধ্যরাতে 'আশ্রয়'-এ এসে গোপন সিঁড়ি দিয়ে ঢুকেছেন

মেন্টর'স হাউজে। তুলিকাকে খুন করে ফিরে গেছেন হোটেলে। খুব ভোরে হোটেল ছেড়েছেন দিল্লির প্লেন ধরবেন বলে। তিনি যে দিল্লিতেই আছেন তা প্রমাণ করার জন্য এস টি ডি-তে কথা না বলে ফ্যাক্সে বার্তা পাঠিয়েছেন তুলিকাকে এটা-ওটা নির্দেশ দিয়ে।

দ্যুতিমান চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ চুপ করে বোঝার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। তারপর বললেন, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের নিশ্চয়ই খুঁজে পাননি!

—না, সেটাই আপাতত আমাদের পরাজয়। সম্ভবত দুবাই বা অন্য কোনও অন্ধকার জগতে নির্বাসন হয়েছে তাদের। ফাদারের সঙ্গে বাকি দুই প্রতারকও এখন আপনাদের হেপাজতে। তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই আপাতত। শুধু সান্ত্বনা এই যে, এই পাচার চক্র আরও একদল তরুণীকে আজ ভোরে অন্য টোপ ফেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাদের ফেরানো গেছে। পুলিশ অফিসারদের ধন্যবাদ। তাঁরা সময় মতো লাউঞ্জে পাইলটকে আটক না করলে বা এয়ারপোর্টের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন না করলে হবু বিমানসেবিকাদের সঙ্গে আমার কপালেও হয়তো দুঃখ ছিল। শুধু ত্রিস্তার কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে। এ রকম একটি নিষ্ঠুর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েকে কিনা ভালবেসেছিল সমুদ্রনীল!

বলতে বলতে গার্গীর কণ্ঠস্বরে তখন ক্লান্তি আর হতাশা। ভোর থেকে অনেক অনেক উৎকণ্ঠিত মিনিট অতিক্রম করে এখন যদিও যুদ্ধজয়ের স্বস্তি, তবু 'আশ্রয়'-এর এতগুলো মেয়ে আর কোনও দিনই ফিরবে না ভেবে গোটা প্রেয়াররুমে তখন শোকের ছায়া।

তার মধ্যেই কে যেন বলল, তা হলে 'আশ্রয়'-এর কী হবে! এত বড় প্রতিষ্ঠানটা কি বন্ধ হয়ে যাবে!

গার্গী স্পষ্ট গলায় বলল, 'আশ্রয়' যেমন চলছিল, তেমনই চলবে। আপনারা সবাই আছেন। কী ভাবে চলে এত বড় প্রতিষ্ঠান, কোথা থেকে কী সাহায্য আসে, তাও জানা আছে সবার। একদিন সবাই মিলে আলোচনায় বসুন না! নিশ্চয়ই কোনও সূত্র মিলে যাবে।

—